শ্রীরমণবচনামৃত

তৃতীয় ভাগ

অনুবাদিকা

শ্রীমতী পুর্ণিমা সরকার

শ্রীরমণাশ্রম

তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণভারত

প্রকাশক :
শ্রীটি. এন. বেঙ্কটরামণ
প্রেসিডেণ্ট, বোর্ড অফ ট্রাস্টীস্
শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই

গ্রন্থক :
মদিনা বুক বাইণ্ডিং
১৬৬, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

—: প্রাপ্তিস্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশান

গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

পরমাত্ম নিকেতন
গ্রাম—ফুলচক
পোঃ—নোতুক, মেদিনীপুর

পূর্ণিমা সরকার
ফ্ল্যাট কিউ-৩ বিদ্যাসাগর নিকেতন
সল্ট লেক, কলিকাতা-৬৪

অমৃতায়ন

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো

কঠ. উ-১।২।৮

অবর নরের কথায়

হয় না প্রত্যয়

বরণীয় সৎ-সম্পন্ন আ-ছে !

ন্যূনতম ভাষে

ঋজুতম পথে

গূঢ়তম সত্যের সন্ধান আ-ছে !

চল-রূপ লোলা

রস-বিভোলা

বিধুরা চিত্তের বিরাম আ-ছে !

পরিচিতি অভাবে

জেনেও জানে না

অপ্রতিঘ একল সংবিৎ আ-ছে !

শোন ! বিশ্বজন

অমৃতের সন্তান

যে শাশ্বত দিব্য ধাম আ-ছে !!

জয়ন্তী দিবস

২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩

শ্রীরমণায়ন সম্ভার

১। উপদেশ মঞ্জরী ও স্বরচিত কবিতা
২। শ্রীরমণ বাণী
৩। স্তুতিপঞ্চকম্ ও সদ্‌বিদ্যা
৪। রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ
৫। শ্রীরমণ বচনামৃত—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ
৬। শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী—প্রথম খণ্ড
ঐ —দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
৭। শ্রীরমণ ত্রয়ী („)
৮। শ্রীরমণ সিদ্ধান্ত রত্ন („)
৯। শ্রীরমণায়ন („)

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

শ্রীরমণবচনামৃত

তৃতীয় ভাগ

৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৮

৪৩৯। ভক্ত—রাম জিজ্ঞাসা করছেন, "বিশুদ্ধ ব্রহ্মে মায়া কিরূপে উদয় হয় ও ব্রহ্মকেও আবৃত করে?" বশিষ্ঠ বলছেন, "বৈরাগ্যবান বিশুদ্ধ মনে এ প্রশ্ন উঠবে না।" অদ্বৈত দর্শনে নিশ্চয়ই জীব, ঈশ্বর ও মায়ার কোন স্থান নেই। আত্মাতে ডুবে গেলে সকল বাসনা অদৃশ্য হয়ে এ প্রশ্নের অবকাশ রাখে না।

মহর্ষি—মুমুক্ষুর অধিকার অনুসারে উত্তর হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কেউ জন্মায় না, কেউ মরে না—কিন্তু আবার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে তাঁর ও অর্জুনের বহু জন্ম হয়েছে, তাঁর এসব জানা আছে কিন্তু অর্জুনের নেই। এ দু'টি কথার মধ্যে কোনটা ঠিক? দু'টিই সত্য কিন্তু দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এখন একটা প্রশ্ন হয়—আত্মা থেকে জীব কি করে হল? আমায় উত্তর দিতে হবে—নিজের প্রকৃত সত্তাকে জানো, তখন আর এসব প্রশ্ন থাকবে না।

মানুষ নিজেকে পৃথক ভাববে কেন? সে জন্মের আগে কিরূপ ছিল বা মৃত্যুর পর কিরূপে থাকবে? এইসব আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করা কেন? গভীর নিদ্রায় তোমার কী আকার ছিল? নিজেকে একজন ব্যক্তি ভাবো কেন?

ভ—গভীর নিদ্রায় আমার সত্তা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে।

ম—কারণ অনুসারে কাজ। বৃক্ষ অনুসারে বীজ। সমস্ত গাছটা বীজেই থাকে, পরে বৃক্ষরূপে প্রকাশ হয়। এই দৃশ্যমান গাছটার একটা আধার আছে, তাকেই মায়া বলে। প্রকৃত সত্যের পক্ষ থেকে কোন বীজ নেই, কোন গাছও নেই। কেবলমাত্র একটা সত্তা আছে।

ভ—বাসনাক্ষয়—মনোনাশ—আত্মসাক্ষাৎকার। মনে হয় এগুলো অন্যোন্যসাপেক্ষ।

ম—বিভিন্ন শব্দগুলোর অর্থ এক। একজনের উন্নতির বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে এদের পার্থক্য হয়। বাসনাক্ষয়, আত্মোপলব্ধি এসবের একই অর্থ; আবার বলা হয় সাধনা ও বৈরাগ্য। সাধনা কেন? কারণ মনের বৃত্তি একবার লয় হয় আর একবার উদয় হয়; আবার লয় হয় আর উদয় হয় ইত্যাদি ক্রমে চলে।

ভ—অনাদি সংস্কারের জন্য একজনের ভুল হয়। জ্ঞান বিনা সংস্কার ক্ষয় হয় না। কিন্তু জ্ঞান অসম্ভব মনে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলেও সমগ্র কর্ম ক্ষয় হয় বলে মনে হয় না; কারণ কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! যেদিকেই দেখি সবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব মনে হয়! একমাত্র জ্ঞানীর সান্নিধ্যই বোধহয় এর প্রতিকার।

ম—কি করা যায়? একমাত্র সত্যই আছে। একে কি করে উপলব্ধি হবে? এরূপে উপলব্ধিটা একটা ভ্রম। সাধনা করার প্রয়োজন মনে হয়। কে সাধনা করবে? কর্তার খোঁজ করলে কর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সব কিছু অদৃশ্য হয়।

তাছাড়া জ্ঞান যদি নিত্যবর্তমান না হয় তবে সেই নবাগত বস্তুতে কি লাভ? যা স্থায়ী তা নিশ্চয়ই শাশ্বত। সেটা নূতন ক'রে পাওয়া ও চিরস্থায়ী হওয়া কি এক সঙ্গে হতে পারে?

যা নিত্যবর্তমান রয়েছে তাকে উপলব্ধি কর। ঋষিরা আগেও তাই করেছেন আর এখনও কেবল তাই করেন। সেকারণে তাঁরা বলেন যে এটা যেন মনে হয় নূতন ক'রে পাওয়া গেল। একবার

অজ্ঞানে আবৃত আর পরে তার প্রকাশ, সত্যকে মনে হয় যেন নূতন ক'রে উপলব্ধি হল। কিন্তু এটা নূতন নয়।

ভ—কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এবং তাদের উপবিভাগ মনকে বিভ্রান্ত করে। মহাজনদের কথা শুনে চলাই মনে হয় একমাত্র ঠিক পথ। আমি কি ধরে থাকবো? আমায় কৃপা ক'রে বলুন। আমি শ্রুতি ও স্মৃতি বিচার করতে পারি না, তারা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিশাল। অতএব আমায় অনুগ্রহ ক'রে উপদেশ দিন।

কোন উত্তর হল না।

৪৪০। ভ—যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষা ছাড়া আমাকে আত্মানন্দ লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ করুন। কেবল গুরুকৃপারূপে এটা বর্ষিত হোক।

ম—তোমার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা কর। কে কি লাভ করতে চায়? তারপর উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা কর।

ভ—কখন কখন আনন্দ লাভ হয় কিন্তু আমি সেটা বর্ণনা করতে অক্ষম। কোন কোন সময়ে 'অনুভূতি' হয় বলে মনে হয়, সেটা কি সত্য? তা যদি হয় তবে একে কি করে স্থায়ী করা যায়? উপায়টা নিশ্চয়ই সহজ। আমায় যুক্তিতর্ক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বা রহস্যময় ভাষা ছাড়া বুঝিয়ে দিন।

উত্তর নেই।

আর একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—প্রার্থনা, গুরু-অনুগ্রহ ও মনের একাগ্রতা ইত্যাদির মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম উপায় আমায় কৃপা ক'রে বলুন।

ম—একটি অন্যটির পরিণাম। প্রত্যেকটি তার পরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। তারা সব মিলেই অখণ্ড পূর্ণতা হয়। ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা পৃথক নয়। তারা একই। অতএব উপায়গুলোর মধ্যে তারতম্য করা যায় না।

৪৪১। এলাহাবাদের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা শ্রীপান্নালাল আই. সি. এস., তাঁর সুরুচিসম্পন্না স্ত্রী ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীব্রজনারায়ণ এক সপ্তাহের জন্য দর্শনার্থে এখানে এসেছেন। তাঁরা বিদায় নেওয়ার আগের রাত্রে তাঁদের সংশয় নিরসন করতে ইচ্ছা করলেন। সংশয় ছিল—

একজন মহাত্মা আমাদের গুরু। তিনি আমাদের "হরিনাম কর" উপদেশ দেন ও বলেন যে এটাই সব; মন একাগ্র করার জন্য আর কোন চেষ্টা করতে হবে না। হরিনাম করে গেলে একাগ্রতা আপনা হতে হবে। আমরা তাই করছি। গুরু দেহত্যাগ করেছেন। আমরা মাঝ সমুদ্রে হালভাঙ্গা নৌকার মত নিজেদের অনুভব করছি। আমরা একজন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আপনার কথা শুনে আপনার বই পড়ি আর সেজন্য এখানে এসেছি। দু'বছর অপেক্ষা করার পর আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখানে এসে শ্রীভগবানের কথা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে যে মহর্ষি আত্মবিচার উপদেশ করেন। এটা জ্ঞানমার্গ অপরপক্ষে আমাদের গুরু আমাদের ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন আমরা কি করবো? আমরা কি আগের সাধনা ত্যাগ ক'রে নূতন পথ ধরবো? একবার যদি ছাড়তে আরম্ভ করি তবে ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মার কাছে গেলে কি বিভিন্ন সাধন নিতে থাকবো? আর এরূপ অনবরত পথ বদলালে উন্নতিই বা কি হবে? কৃপা ক'রে আমাদের সংশয় দূর ক'রে আশীর্বাদ করুন।

মহর্ষি ভদ্রলোকদের কাননগড় আনন্দাশ্রম থেকে প্রকাশিত 'ভিসন' নামে মাসিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যার একটি প্রবন্ধ দেখতে বললেন।

সন্ত নামদেবের মতানুসারে দিব্যনামের মাহাত্ম্য

নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত ক'রে ব্যাপ্ত, সে নাম পাতালের কত নিম্নস্তরে নামে বা স্বর্গের কত উচ্চস্তরে ওঠে কে বলতে পারে?

অজ্ঞানান্ধ জীব সারতত্ত্ব না বুঝে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। নাম অবিনশ্বর। রূপ পরিবর্তনশীল কিন্তু নামেই সব সমাহিত হয়ে রয়েছে।

নামই রূপ আর রূপই নাম। নাম ও রূপে কোন ভেদ নেই। ঈশ্বর ব্যক্তরূপে নাম ও রূপ গ্রহণ করেছেন। সেজন্য বেদ নাম প্রতিষ্ঠা করেছে। নাম অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নেই, অবহিত হও। যারা বিরুদ্ধ কথা বলে তারা মূর্খ; নাম কেশব স্বয়ং। যারা প্রভুর একান্ত ভক্ত তারাই কেবল এটা বুঝতে পারে।

নামের এই সর্বব্যাপীস্বরূপ তখনই বোঝা যায় যখন একজন নিজের 'আমি'কে বুঝতে পারে। যখন নিজের নামই জানা নেই তখন সর্বব্যাপী নাম জানা অসম্ভব। যখন একজন নিজেকে জানে তখন সে সর্বস্থানে নামকে দেখে।

জ্ঞানচর্চায়, ধ্যানে বা তপস্যায় নাম লাভ হয় না। প্রথমে গুরুপদে আত্মসমর্পণ ক'রে তোমার মধ্যে 'আমি' রূপে যে রয়েছে তাকে জানো। সেই 'আমি'র উৎস খুঁজে তোমার ব্যক্তিত্ব সেই একত্বে—যা স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বৈতবোধশূন্য তাতে মিশিয়ে দাও। এই সেই নাম যা ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

নাম স্বয়ং পরমাত্মা, সেখানে দ্বৈতবোধের ক্রিয়ারূপ কোন কর্ম নেই।

৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮:

৪৪২। শ্রীভগবান তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা ব্যাখ্যা ক'রে বললেন—

সূর্য জগতকে প্রকাশিত করে অপরপক্ষে অরুণাচলের সূর্য এতই ভাস্বর যে ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হয়ে কেবল একটা অখণ্ড জ্যোতিই থাকে। কিন্তু সেটা এই বর্তমান অবস্থায় অনুভূত হয় না আর কেবল হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হলেই উপলব্ধ হয়। সাধারণ পদ্ম দৃশ্যমান সূর্যের আলোয় প্রস্ফুটিত হয় অন্যপক্ষে সূক্ষ্ম হৃদয়পদ্ম সূর্যের যে সূর্য তার আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। অরুণাচল আমার হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত করুন যাতে তাঁর অখণ্ড জ্যোতিই একমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে থাকে!

আর পরে শ্রীভগবান বলে চললেন—

আর্শিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়; তবু প্রতিবিম্ব সত্য নয় কারণ আর্শি ছাড়া তা থাকে না। অনুরূপভাবে জগতকেও মনের ওপর প্রতিবিম্ব বলা হয় কারণ মনের অভাবে এটা থাকে না। প্রশ্ন হয়—জগতটা যদি প্রতিবিম্ব হয় তবে জগৎ বলে বাস্তবিক কিছু একটা আছে যা মনে প্রতিবিম্বিত হয়। এর অর্থ বস্তুতান্ত্রিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা। প্রকৃতপক্ষে এটা সেরূপ নয়।

অতএব স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। স্বাপ্ন জগতের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবে এটা কি করে সৃষ্টি হয়? মনের কোন এক-প্রকার সংস্কার স্বীকার করতে হয়। তাদের বাসনা বলে। এ বাসনাগুলো কিরূপ? উত্তর হয়—তারা সূক্ষ্ম। যেমন একটি বীজে একটা বড় গাছের সম্ভাবনা থাকে সেরূপ জগতও মনেই থাকে।

তারপর জিজ্ঞাসা করা হয়—একটি বীজ গাছেরই ফল যেটা পুনরোৎপাদনের জন্য নিশ্চয় কোন না কোন কালে ছিল। অতএব জগতও কোন না কোন সময়ে ছিল। উত্তর হল, না! এখন যে সংস্কারগুলো প্রকাশ হচ্ছে সেগুলো তৈরী হতে নিশ্চয়ই অনেক জন্ম

লেগেছে। তবে আমি এখন যেমন আছি আগেও সেরূপ ছিলাম। সোজা উত্তর পেতে হলে দেখতে হয় জগৎ আছে কি না। জগৎ আছে স্বীকার করে নিলে আমাকে একজন দ্রষ্টাও স্বীকার করতে হয় যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়। এখন আমি নিজেকে খুঁজে দেখি, যা থেকে জগৎ ও তার দ্রষ্টার সম্বন্ধ জানা যাবে। যখন নিজের আত্মাকে খুঁজি ও তাতেই থাকি তখন কোন জগৎ দেখা যায় না। তবে প্রকৃত সত্য কি? কেবল দ্রষ্টা, নিশ্চয় জগতটা নয়।

সত্য এরূপ হলেও মানুষ জগতের বাস্তবতা নিয়ে তর্ক করতে ছাড়ে না। তাকে জগতের হয়ে কে ওকালতি করতে বলেছে?

যোগবাশিষ্ঠ স্পষ্টভাবে ভ্রান্তি ত্যাগ ক'রে কেবল সত্তা হয়ে থাকাকে মুক্তি বলেছে।

৪৪৩। একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—দর্পণের উপমাতে কেবল দৃষ্টিশক্তির কথাই বলা হয়। জগৎ আরও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়েও অনুভূত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও কি মিথ্যা প্রমাণ হয়?

ম—সিনেমার পর্দায় ছবির একজনকে জগৎ দেখছে বলে মনে হয়। ছবির সেই দ্রষ্টা ও তার দৃষ্ট জগতের বাস্তবতা কি? একটা ছায়া মূর্তি একটা অলীক জগৎ দেখছে।

ভ—কিন্তু আমি তো ছবিটা দেখছি।

ম—নিশ্চয় দেখছ। তুমি ও জগৎ সিনেমার নায়ক ও সিনেমার জগতের মতই সত্য।

৪৪৪। একজন এডভোকেট দর্শনার্থী—মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয় তখন জগতের অস্তিত্ব অনুভব না করে থাকা যায় না। বিশুদ্ধ চেতনার পক্ষে কর্মযোগের সার্থকতা কি?

ম—মন ইন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ দেখে। এটা মনের ব্যাপার।

মন ও ইন্দ্রিয়কে দ্রষ্টা তার আত্মার মধ্যেই দেখে, তার থেকে পৃথকভাবে নয়। কর্তা যদি কর্মে লিপ্ত না হয়ে থাকতে পারে তবে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হয়ে আত্মাকে উপলব্ধি করে।

৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

৪৪৫। 'অক্ষর মনমালৈ'-এর একটি পদ ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীভগবান বললেন যে মৌনই সর্বোত্তম উপদেশ। এর অর্থ 'মৌন' গুরু, শিষ্য ও সাধক। শ্রীভগবানের দর্শনার্থী তিনজন সন্ন্যাসী একটা আলোচনা শুরু করলেন।

ভ—যদি একজন চুপ ক'রে থাকে তবে কর্ম হয় কি করে? কর্মযোগের স্থান কোথায়?

ম—আগে কর্মটা কি, এটা কার কর্ম ও কর্মের কর্তা কে বোঝা যাক। এদের বিশ্লেষণ ক'রে তাদের যথার্থতা খুঁজলে, একজন বাধ্য হয়ে শান্তিতে আত্মায় থাকে, তা সত্ত্বেও কর্ম হয়ে যায়।

ভ—আমি যদি কাজ না করি কর্ম হয় কি করে?

ম—কে জিজ্ঞাসা করে? এটা আত্মা না অন্য কেউ? আত্মার কি কর্মের সঙ্গে সংস্রব আছে?

ভ—না আত্মা নয়। আত্মা ছাড়া অন্যটা।

ম—অতএব এটা স্পষ্ট যে আত্মা কর্মে সংশ্লিষ্ট নয় আর প্রশ্নও ওঠে না।

ভ—আমি স্বীকার করছি।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—জ্ঞানীর কি অবস্থা? তিনি কি কাজ করেন না?

ম—প্রশ্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জ্ঞানী প্রশ্নকারী নয়। তুমি অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? তোমার কর্তব্য অন্যের কথা জিজ্ঞাসা করা নয়, নিজেকে দেখা।

ভ—শাস্ত্রে তাঁকেই আদর্শ বলে।

ম—নিশ্চয়। তিনি আদর্শ। তোমার আত্মজ্ঞান লাভ করা উচিত। তাঁর অবস্থা বর্ণনা করলেও তোমার সামর্থ্যানুসারেই তুমি তা বুঝবে। তুমি স্বীকার করছ যে তোমার সামর্থ্য সীমিত। শাস্ত্র বলে জ্ঞানীর অবস্থায় কোন সীমাবদ্ধতা (উপাধি) নেই। সুতরাং তাঁর অবস্থা জানবার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে সেই অবস্থা অনুভব করা। যদি তখনও প্রশ্ন ওঠে, উত্তরও পাওয়া যাবে।

আর একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—'উপদেশ সারের' প্রথম পদে চিৎ ও জড়ের পার্থক্য করা হয়েছে।

ম—উপদেশ শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ। জড়ের কোন বাস্তবতা নেই। কেবলমাত্র এক পূর্ণ চিৎ-ই সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮

৪৪৬। শ্রীগ্রাণ্ট ডাফ হলঘরে ছিলেন। শ্রীভগবান কয়েকটি নূতন প্রকাশিত বই-এর কথা বলছিলেন, তার মধ্যে 'মহাযোগ'ও একটা। তিনি বললেন জি. ডি. 'সদ্দর্শনের' ভাষ্য পড়ার পর মহাযোগের মতামত শুনে আশ্চর্য হবে। দু'জনেই শ্রীভগবানের দর্শন ব্যাখ্যা করেছে দাবী করে কিন্তু তাদের পার্থক্য এত বেশী যে মহাযোগ যেন অন্যটিকে খণ্ডন করেছে।

একজন উদ্ধৃত করে বললে যে 'সদ্দর্শন ভাষ্য' দাবী করে যে অহংকার নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যক্তিত্ব ঠিকই থাকে। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—

"কি করা যাবে? উপনিষদ বলে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' (যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হয়ে যায়)। একসঙ্গে একাধিক ব্রহ্মবিদ্। তারা কি সবাই সমান? তারা কি পৃথক নয়?" অনেকে এরূপ

জিজ্ঞাসা করে। তারা শরীরটা দেখে। আত্মজ্ঞানটা দেখে না। ব্রহ্মবিদের জ্ঞানে কোন পার্থক্য নেই। এটাই সত্য। কিন্তু যদি শরীরের দিক থেকে প্রশ্ন করা যায়, উত্তরটা তাহলে, 'হাঁ, তারা পৃথক' বলতে হবে। এটাই বিরোধের মূল।

শ্রীগ্রাণ্ট ডাফ—বৌদ্ধেরা জগৎ অস্বীকার করে। হিন্দু দর্শন এটা স্বীকার করে কিন্তু অসৎ বলে। ঠিক বলছি ?

ম—দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন মতবাদ।

ভ—তারা বলে শক্তি জগৎ সৃষ্টি করে। মায়ার আবরণ দূর হলেই কি অসত্তের জ্ঞান প্রকাশ হয় ?

ম—শক্তির সৃষ্টিক্রিয়া সবাই স্বীকার করে। সৃষ্টিকর্ত্রীর স্বরূপ কি ? এটা তার সৃষ্টির অনুরূপই হবে। স্রষ্ট্রী (সৃষ্টিকারিণী) ও তার সৃষ্টির স্বরূপ এক।

ভ—ভ্রমের কি মাত্রা আছে ?

ম—ভ্রমটাই অলীক। ভ্রমকে বুঝতে হলে একজনকে তার অতীত হতে হয়। এরূপ দ্রষ্টা কি আর ভ্রমে পতিত হয় ? সে কি তখন আর মাত্রার কথা বলতে পারে ?

সিনেমার পটের ওপর অনেক দৃশ্য চলে যাচ্ছে। আগুনে সব বাড়ীঘর পুড়ে ছারখার হল। জলে সব জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু যে পটে ছবি ফেলা হচ্ছে সেটা পুড়ল না, ভিজলও না। কেন ?

কারণ ছবিগুলো মিথ্যা আর পর্দাটা সত্য।

আবার, দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু দর্পণ প্রতিবিম্বের তারতম্যে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না।

সেইরূপ জগতও একটা সত্যের ওপর ব্যাপারমাত্র, সত্য কোনভাবেই প্রভাবিত হয় না। সত্য কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয়।

ভ্রমের সম্বন্ধে আলোচনা কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য হয়। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী জ্ঞানময় কর আর বিশ্ব ব্রহ্মময় দেখো। এখন

জগতে থাকার জন্য জগতকে এরূপ দেখছ। এর অতীত হও তাহলে এটা অদৃশ্য হবে—একমাত্র সত্যই প্রকাশ পাবে।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৮

৪৪৭। শ্রীভগবান বললেন যে 'নমঃ শিবায়' নামে যে মহাত্মা আগে অরুণাচলে বাস করতেন তিনি নিশ্চয় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ তিনি একটা গানে বলেছেন—"ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের কঠিন পরীক্ষা করেন। একজন রজক কাপড় ছেঁড়ার জন্য নয় কেবল পরিষ্কার করার জন্যই পাটে আছড়ায়।"

৪৪৮। নামদেবের নামমাহাত্ম্যের আক্ষরিক অনুবাদ

(১) নাম পরিপূর্ণভাবে আকাশ পাতাল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে আছে। কে বলতে পারে এটা পাতালের কত নিম্নে আর স্বর্গের কত উর্ধ্বে ছড়িয়ে আছে? সারতত্ত্ব না বুঝে অজ্ঞানমতি চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। নামদেব বলে নাম অবিনশ্বর। রূপ অগণন কিন্তু নামেই সব সমাহিত রয়েছে।

(২) নামই রূপ আর রূপই নাম। নাম ও রূপে কোন ভেদ নেই। ঈশ্বর ব্যক্তরূপে নাম ও রূপ হয়েছেন। সেজন্য বেদ 'নাম' প্রতিষ্ঠা করেছে। নাম অপেক্ষা আর মন্ত্র নেই, অবহিত হও। যারা অন্য কথা বলে তারা জড়মতি। নামদেব বলে নাম কেশব স্বয়ং। প্রভুর একান্ত ভক্তই একথা জানে।

(৩) নামের সর্বব্যাপী স্বরূপ কেবল তখনই জানা যায় যখন একজন তার 'আমি'কে জানে। যখন নিজের নামই জানা নেই তখন সর্বব্যাপী নাম পাওয়া অসম্ভব। যখন সে নিজেকে

জানে তখন সে নামকে সর্বত্র দেখে। নামকে নামী থেকে পৃথক জানাই ভ্রম। নামদেব বলে, 'মহাত্মাদের জিজ্ঞাসা কর'।

(৪) জ্ঞানচর্চা, ধ্যান ও তপস্যার দ্বারা নামকে জানা যায় না। প্রথমে গুরুর শ্রীচরণে সমর্পণ কর আর নিজের 'আমি'কে নাম বলে বুঝতে শেখো। সেই 'আমি'র উৎস খুঁজে পেলে তোমার ব্যক্তিসত্তাকে সেই স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বৈতবর্জিত একত্বে ডুবিয়ে দাও। যা দ্বৈত ও দ্বৈতাতীত পরিব্যাপ্ত করে আছে সেই নামই ত্রিজগতে এসেছে। যেখানে দ্বৈতবোধের ক্রিয়া নেই, সেই নামই পরমব্রহ্ম স্বয়ং।

শ্রীভগবানের এটি পড়া হলে একজন গায়ক হলঘরে এসে ত্যাগরাজের তেলেগু কীর্তন গাইতে লাগল। তার একটাতে ছিল "নাদের উৎস মূলাধার-শব্দ খোঁজো, যেমন ডুবুরী মুক্তা খোঁজে।" আর একটা গান "যে মন সংযম করেছে তার আর তপস্যার কি প্রয়োজন? দেহাত্মবোধ ত্যাগ করে 'আমি নেই, তুমিই সব' অনুভব কর।"

এই গানগুলো হলঘরে বসে থাকা জি. ডি.-কে অনুবাদ করে শোনানো হল।

শ্রীজি. ডি. জিজ্ঞাসা করলেন—শ্বাস সংযমের কি প্রয়োজন আছে?

ম—শ্বাস সংযম মনকে গভীরে ডুবিয়ে দেওয়ার একটা উপায়। একজন মনের সংযমের দ্বারাও বেশ সহজে ডুবে যেতে পারে। মন সংযম হলে শ্বাস আপনা হতেই সংযত হয়। একজনের শ্বাস সংযমের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, মন সংযমই যথেষ্ট। যে সরাসরি মনঃসংযম করতে পারে না তাকে শ্বাস সংযম করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাহম্—আমি ইহা নই—রেচক
কোঽহম্—আমি কে? (আমির অনুসন্ধান)—পূরক
সোঽহম্—সে আমিই (আত্মামাত্র)—কুম্ভক।

সুতরাং এগুলোই প্রাণায়ামের ক্রিয়া।

আবার এই তিনটি সূত্র এরূপ—

ন—অহম্ (আমি—নই)

কঃ—অহম্ (আমি—কে)

সঃ—অহম্ (আমি—সে)

এদের উপপদগুলো বাদ দাও, সামান্য সংজ্ঞাটা ধরে থাকো। অর্থাৎ অহম্—'আমি', এটাই সব কিছুর সারবস্তু।

পরে শ্রীভগবান গানের কথা বলে বললেন—ত্যাগরাজ বেশ বলেছেন। মন সংযম করতে হবে। প্রশ্ন হয় "মন কি?" তিনি নিজেই পরের পদে উত্তর দিচ্ছেন যে এটা দেহাত্মবোধ। পরের প্রশ্ন এটা কি করে দমন করা যায়। তিনি আবার বলছেন, "সম্পূর্ণ সমর্পণের দ্বারা। অনুভব কর যে আমি নেই আর সবই তিনি।" গানটি চমৎকার আর স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি অন্য উপায়ের কথাও বলেছেন যথা শ্বাস সংযম।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৮

৪৪৯। শ্রীজি. ডি.-র চলে যাওয়ার পর তাঁর আশ্রমে আসার প্রসঙ্গ উঠল। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন, "কোন একটা শক্তি ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের লোকেদের এই কেন্দ্রে টেনে আনে।" একজন ভক্ত ঠিকই বললে, "সে শক্তি শ্রীভগবান ছাড়া আর কেউ নয়।" শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "প্রথমে কোন্ শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে এল? সেই শক্তি অন্যদেরও আনে।"

সৌভাগ্যক্রমে শ্রীভগবানের এই গল্পগুলো বলার ইচ্ছা হল—

(১) এক রাজা ও তাঁর এক ভক্তিমতী রানী ছিলেন। রানী রামভক্ত ছিলেন আর তিনি কামনা করতেন যে রাজাও ভক্ত হোন। একদিন রাত্রে রানী দেখলেন যে রাজা ঘুমের মধ্যে কিছু

বলে উঠলেন। তিনি রাজার মুখের কাছে কান পেতে শুনলেন যে অনবরত 'রাম' নাম জপ হচ্ছে। তিনি খুব খুশি হয়ে পরের দিন মহোৎসবের আদেশ দিলেন। উৎসব হয়ে গেলে রাজা রানীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রানী সব ঘটনা বলে বললেন যে তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই মহোৎসব করা হয়েছে। রাজা কিন্তু তাঁর ভক্তির কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় খুবই দুঃখিত হলেন। রাজা নিজেকে ভক্ত হওয়ার অনুপযুক্ত মনে ক'রে আত্মঘাতী হন। এর অর্থ কেউ তার নিষ্ঠার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করবে না। আমরা মনে করতে পারি যে রাজা রানীকে তাঁর নিষ্ঠার কথা প্রচার করতে বারণ করলেন ও সুখে কাল যাপন করলেন।

(২) থোনডারাদিপোদি (ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু) আলোয়ার—একজন যে ভক্তের চরণধূলিতে আনন্দ লাভ করে, এই নামে একজন ভক্ত একটা জায়গায় তুলসী গাছ লাগিয়ে তার পাতা দিয়ে মালা তৈরী ক'রে মন্দিরে দেবতার জন্য প্রতিদিন দিয়ে আসত। সে অবিবাহিত ছিল আর তার আচার-ব্যবহারের জন্য সবার কাছে শ্রদ্ধা পেত। একদিন দু'টি বোন যারা বেশ্যাবৃত্তি করত তারা সেই বাগানের কাছে এসে একটা গাছের তলায় বসলে। তাদের মধ্যে একজন বললে, "কি জঘন্য জীবনযাপন করি, প্রতিদিন দেহ ও মন কলুষিত হয়। এই লোকটির জীবনই কাম্য।" অন্যজন বললে, "তার মন কি তুমি জানো? হয়ত যত ভাল মনে করছ সে তা নাও হতে পারে। শরীরের চেষ্টা জোর ক'রে দমন করা হয়েছে, মন হয়ত অসংযমে মেতে আছে। শরীর যত সহজে দমন হয়, একজনের মনের বাসনা তত সহজে দমন হয় না।"

আগের মেয়েটি বললে, "কাজ থেকেই মন জানা যায়। তার জীবনযাত্রা দেখে মনে হয় তার মন পবিত্র।"

অন্য মেয়েটি বললে, "নাও হতে পারে। তার মন এখনও পরীক্ষা করা হয় নি।"

প্রথমজন তাকে লোকটির মন পরীক্ষা করার জন্য বললে আর সেও পরীক্ষা করতে স্বীকার করলে। দ্বিতীয় মেয়েটি সামান্য বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করে তাকে সেখানে একলা রেখে যেতে বললে ; প্রথম মেয়েটিও তাকে সেইভাবে রেখে বাড়ী চলে গেল। মেয়েটি সেই গাছের তলায় অনুতপ্ত ও নম্রভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সাধু তাকে দেখে কাছে এল আর তার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। সে তার পূর্ব জীবনের জন্য অনুতাপ ক'রে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে সাধু ও তার বাগানের সেবা করার অনুমতি চাইলে। সাধু তাকে বাড়ী ফিরে গিয়ে ভালভাবে থাকতে বললে। সে তাতে আপত্তি করলে। সুতরাং সাধু তাকে তুলসী গাছে জল দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করলে। সেও আনন্দিত মনে কাজ নিলে ও বাগানের কাজ করতে লাগল।

এক ঝড় বৃষ্টির রাত্রে মেয়েটিকে সাধুর কুটীরের চালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। তার কাপড় দিয়ে জল পড়ছে আর সে শীতে কাঁপছে। তার প্রভু তাকে যখন তার দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন সে বললে যে তার বাড়ীতে বৃষ্টির জল আটকায় না তাই সে চালার তলায় আশ্রয় নিয়েছে, বৃষ্টি থামলেই চলে যাবে। সাধু তাকে কুটীরের ভিতরে আসতে ও কাপড় ছাড়তে বললে। তার ছেড়ে পরার কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং সাধু তাকে নিজের কাপড় পরতে দিলে। মেয়েটি পরলে আর তারপর সে সাধুর পদসেবা করার অনুমতি চাইলে। সাধুও রাজী হল। অবশেষে তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

পরের দিন মেয়েটি বাড়ী এসে,' ভাল খেয়ে, সুন্দর কাপড় পরলে। তবুও সে বাগানে কাজ করতে লাগল।

কখন কখন সে বাড়ীতে অনেক দেরী করত। তখন সাধু তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। শেষ অবধি সাধু মেয়েটির সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। তা সত্ত্বেও সে তার বাগানের কাজে অবহেলা করত না বা মন্দিরে মালা দিতে ভুলত না। তার অন্য প্রকার জীবনযাত্রার জন্য খুব দুর্নাম হল। দেবতা তখন তাকে সুপথে আনার জন্য ভক্ত সাধুর বেশে দাসীর (মেয়েটির) কাছে গিয়ে তাকে চুপিচুপি একটি দামী উপহার—দেবতার পায়ের নূপুর দিলেন।

মেয়েটি খুশি হয়ে সেটা বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলে। তারপর দেবতা অদৃশ্য হলেন। এসবই কিন্তু বাড়ীর এক পরিচারিকা লুকিয়ে দেখেছিল।

মন্দিরে গহনা পাওয়া গেল না। পুরোহিত রাজকর্মচারীকে খবর দিলে। তারাও এটি যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করলে। বাড়ীর পরিচারিকা খবর দিয়ে পুরস্কার দাবী করলে। পুলিস এসে গহনা উদ্ধার করলে ও দাসীকে ধরলে ; সে বললে যে সাধু তাকে দিয়েছে। সাধুকে মারধর করা হল। এমন সময় দৈববাণী হল, "আমি করেছি। ওকে ছেড়ে দাও।"

রাজা ও অন্য সবাই অবাক হয়ে গেল। সবাই সাধুর পায়ে প্রণাম ক'রে তাকে মুক্তি দিলে। তখন সেও সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করতে লাগল।

(৩) কতুবেলী সিধরের কঠোর তপস্বী বলে সুনাম ছিল। সে গাছ থেকে পড়া শুকনো পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত। দেশের রাজা তার কথা শুনে তাকে দর্শন করলেন আর যে একে বাস্তবিক পরীক্ষা করতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করবেন ঘোষণা করলেন। একজন অবস্থাপন্না দাসী সেটা করতে রাজী হল। সে তপস্বীর কাছাকাছি বাস করতে আর সেবা যত্নের ভান করতে

লাগল। সে চুপিচুপি তপস্বীর কুড়াবার পাতার মধ্যে ভাজা পাঁপড় রেখে দিত। যখন সে সেটা খেলো তখন আরও মুখরোচক খাদ্য-সামগ্রী শুকনো পাতার মধ্যে রেখে দিতে লাগল। অবশেষে তার আনা রান্না করা খাবারও তপস্বী খেতে লাগল। তাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হল আর একটি ছেলেও হল: দাসী সেই ঘটনা রাজাকে জানালে।

রাজা জানতে চাইলেন যে সে তাদের সম্বন্ধ জন-সমাজে প্রমাণ করতে পারবে কিনা। সে রাজী হল ও একটা অভিসন্ধির কথা বললে। সে অনুসারে রাজা দাসীর একটা সাধারণ নৃত্য-অনুষ্ঠানেব আয়োজন ক'রে সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন। লোকেরা এল আর মেয়েটিও ছোট ছেলেটিকে কিছু ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তপস্বীর কাছে রেখে এল। নাচ পুরোদমে চলছে; ছোট ছেলেটিও বাড়ীতে মার জন্য কাঁদছে। বাবা ছেলেটিকে কোলে করে নাচের আসরে এল। মেয়েটি সোল্লাসে নেচে চলেছে। তপস্বী ছেলেকে নিয়ে তার কাছে যেতে পারলে না। মেয়েটি এদের ছু'জনকে দেখলে। তপস্বী যেখানে বসেছিল, নাচতে নাচতে সেখানে এসে কৌশলে তার পায়ের নূপুর খুলে ফেললে। তারপর ধীরে পা বাড়িয়ে দিলে তপস্বী নূপুরটি পায়ে পরিয়ে দিলে। সবাই হেসে উঠে হৈ চৈ করতে লাগল। কিন্তু তপস্বী অবিচলিত রইল। তথাপি তার মহত্ব প্রমাণ করতে একটা তামিল গান গাইলে যার অর্থ—

"জয়শ্রীর জন্য ক্রোধ হতে মুক্ত হয়ে রই!
(যদি) মন বাইরে যায় তারে আমি ছেড়ে দেই।
(যদি) আত্মার চেতনায় রাত্রি দিন ঘুমে কাটাই,
পাষাণ ছু'খান হয়ে আকাশে মিলাক॥"

তৎক্ষণাৎ পাথরের দেবমূর্তি বিকট শব্দ করে ছু'ভাগ হয়ে গেল। লোকেরা হতবাক হয়ে গেল।

শ্রীভগবান বলে চললেন—

এরূপে সে নিজেকে অখণ্ড জ্ঞানী বলে প্রমাণ করেছিল। একজন জ্ঞানীর বাইরের চেহারা দেখে ভুললে চলবে না। বেদান্ত চূড়ামণির পঞ্চম অধ্যায় ১৮১ শ্লোকে এরূপ আছে—আকাশকে কখন বায়ুতাড়িত মেঘাচ্ছন্ন আবার কখনও স্বচ্ছরূপে দেখা যায়, সেরূপ যদিও একজন জীবনমুক্তকে দেহে থাকা অবস্থায় প্রারব্ধানুসারে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রয়েছে মনে হয় তথাপি সে সর্বদাই আকাশের মত নির্মল। পতিব্রতা স্ত্রীলোক যদিও অন্যের নিকট লব্ধ সামগ্রী (প্রারব্ধ বশে উপলব্ধ বস্তু) দ্বারা স্বামীর সেবা করে কিন্তু সে একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানে না, সেরূপ জীবনমুক্ত সর্বদাই কেবলমাত্র আত্মাতেই আনন্দ পায়। যদি সে জড়ের মত নীরবে থাকে তবে সেটা বেদবর্ণিত দ্বৈতবোধজাত বৈখরীবাকের অন্তর্নিহিত তটস্থ অবস্থার জন্যই হয়, তার মৌন বেদের প্রকৃত তাৎপর্য অখণ্ড অদ্বৈতবোধ উপলব্ধির পরিণাম। যদিও সে শিষ্যদের উপদেশ দেয় তথাপি সে নিজেকে গুরু বলে মনে করে না কারণ সে ভালভাবেই জানে যে এই গুরুশিষ্যভাব একটা মায়া, সুতরাং সে যেন আকাশবাণীর মত বলে যায়; অন্যপক্ষে সে যদি উন্মাদের মত অসংলগ্ন বাক্য বলে, সেটা তার মিলনানন্দকালে প্রেমিকের অবর্ণনীয় অনুভূতির প্রকাশ। যদি বক্তার মত অনর্গল বহুভাষণ দেয় তবে সেগুলো তার অনুভূতির স্মৃতিচারণা কারণ সে সর্বকামনাশূন্য অটল অদ্বৈত এক অদ্বিতীয়। যদি তাকে অন্যদের মত শোকে মুহ্যমান মনে হয় তথাপি সে আত্মজ্ঞানের পূর্বে ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করেছে ও তাদের ব্রহ্মের যন্ত্র ও প্রকাশের মাধ্যম বোধেই তাদের প্রতি যথাযথ প্রীতি ও মমতার প্রমাণ দেখায়। যখন তাকে জগতের বিস্ময় সম্বন্ধে গভীর কৌতূহলী মনে হয় তখন সে কেবল-মাত্র আরোপজাত অজ্ঞানকে বিদ্রূপ করে। যদি তাকে যৌনানন্দ উপভোগ করছে মনে হয় তবে বুঝতে হবে যে, যে আত্মা নিজেকে ব্যক্তিসত্তা ও অনন্ত সত্তায় বিভাজিত করেছে আর আপন মৌলিক

স্বরূপ ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের পুনর্মিলনের আনন্দে আনন্দিত হয়, সে সেই আত্মারই নিত্যানন্দ ভোগ করে। তাকে ক্রুদ্ধ মনে হলেও সে অপরাধীর হিতৈষী। তার সকল কর্মই জনকল্যাণের জন্য মানবীয় স্তরে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলে মনে করতে হবে। তার জীবিত অবস্থায় মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কারণ নেই। সে বিশ্বের কল্যাণের জন্যই জীবিত থাকে।

শ্রীভগবান শ্রোতাদের এখন জ্ঞানীদের বাহ্য আচার-ব্যবহার দেখে অবজ্ঞা করা সম্বন্ধে সাবধান ক'রে পরীক্ষিতের উদাহরণ দিলেন। পরীক্ষিত মৃত অবস্থায় জন্মেছিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদতে লাগল আর ছেলেটিকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলে। সমবেত ঋষিরা ভাবতে লাগল যে কৃষ্ণ কি করে ছেলেটিকে অশ্বত্থামার অপাণ্ডবাস্ত্র হতে রক্ষা করবেন! কৃষ্ণ বললেন, "যদি একজন নিত্যব্রহ্মচারী ছেলেটিকে স্পর্শ করে তবে ছেলেটি বেঁচে উঠবে।" এমনকি শুকও তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেল না। কোন স্বনামধন্য ঋষিকে স্পর্শ করার সাহস না পেতে দেখে তিনি নিজে "আমি যদি নিত্যব্রহ্মচারী হই তবে ছেলেটি বেঁচে উঠুক", বলে তাকে স্পর্শ করলেন। ছেলেটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল, পরে সে পরীক্ষিত হয়ে বড় হল।

ভাবো দেখি, ১৬,০০০ গোপী পরিবেষ্টিত হয়ে কৃষ্ণ কি করে ব্রহ্মচারী! জীবনমুক্তির রহস্যও এরূপ! যে আত্মা থেকে কিছুই পৃথক দেখে না সেই জীবনমুক্ত। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা ক'রে সিদ্ধি দেখাতে যায় তবে সে ব্যর্থ হবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫০। হিন্দুধর্মান্তরিতা পোল্যাণ্ডের মহিলা কুমারী উমা দেবী শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার সময়ে শিবের দর্শন পাওয়াব কথা আমি শ্রীভগবানকে আগে বলেছি। কোর্টাল্লামেও অনুরূপ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই দর্শনগুলো

ক্ষণিক। কিন্তু সেগুলো আনন্দদায়ক। এগুলো কি করে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন হয় আমি তাই জানতে চাই। শিব ছাড়া আমার চতুর্দিকে যা দেখি তাতে কোন প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। তাঁর কথা মনে হলে খুব আনন্দ হয়। তাঁর দর্শন কি করে স্থায়ী হয় আমায় কৃপা করে বলুন।

ম—তুমি শিবের দর্শনের কথা বলছ। দর্শন কোন একটা বস্তুরই হয়। তার অর্থ একজন দ্রষ্টা আছে। দ্রষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই দর্শনের মূল্য। (তার অর্থ দর্শকের মানসিক পরিপক্বতা অনুযায়ী দর্শনের বিষয়বস্তু হয়)। আবির্ভাব হলেই তিরোভাব আছে। যা উদয় হয় তা অদৃশ্য হয়। এরূপ দর্শন কখনও চিরস্থায়ী হয় না কিন্তু শিব শাশ্বত।

শিবের প্রত্যক্ষ হওয়ার (দর্শনের) অর্থ দেখার জন্য চোখ আছে, চোখের পিছনে বুদ্ধি আছে, দর্শন ও বুদ্ধির পিছনে দ্রষ্টা আছে আর অবশেষে দ্রষ্টার আধারভূত চেতনা আছে। এই প্রত্যক্ষ (দর্শন) একজন যেরূপ সত্য মনে করে তা নয় কারণ এটা অন্তরঙ্গ ও সহজাত নয়; এটা অপরোক্ষ (সরাসরি) নয়। এটা চেতনার বিভিন্ন স্তরের পরিণাম। এরমধ্যে কেবল চেতনারই বিকার হয় না। সেটা নিত্য। এই শিব। এই আত্মা।

দর্শন বললেই দ্রষ্টা আছে। দ্রষ্টা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন চেতনারূপ আত্মার অস্তিত্ব নেই; আর দ্রষ্টাও চেতনা থেকে পৃথক থাকে না। এই চেতনাই শাশ্বত সত্তা আর একমাত্র সত্তা। দ্রষ্টা নিজেকে দেখতে পায় না। সে নিজেকে চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ (দৃশ্যরূপে) দেখে না বলে কি সে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে? না! সুতরাং প্রত্যক্ষের অর্থ দেখা নয় কিন্তু 'হওয়া'।

'হওয়া'র অর্থই উপলব্ধি, সুতরাং 'আমি আছি যা আমি আছি' (আই অ্যাম্ দ্যাট্ আই অ্যাম্)। 'আমি আছি'ই শিব।

কিছুই তাঁর অতিরিক্ত নয়। সবকিছুর সত্তা শিবেই রয়েছে আর শিবের জন্যই হয়েছে।

অতএব অনুসন্ধান কর 'আমি কে?' নিজের অন্তরে ডুবে যাও আর আত্মাতে থাকো। এটাই অস্তিত্বরূপ শিব। বার বার তাঁর দর্শনের প্রত্যাশা করো না। এই সব বস্তু দেখা আর শিব দেখার মধ্যে কি পার্থক্য? তিনিই বিষয়ী ও বিষয়। তুমি শিব ছাড়া পৃথক নও। শিব সর্বদাই নিত্যবর্তমানরূপে অনুভূত হচ্ছেন। তুমি যদি মনে কর যে তাঁকে অনুভব করো নি, সেটা ভুল। এটাই শিব অনুভবের বাধা। সেই চিন্তাটাকেও ত্যাগ কর আর সেটাই জ্ঞান।

ভ—হাঁ। কিন্তু এটা ত্বরান্বিত করব কি করে?

ম—এটাই জ্ঞানের বাধা। শিব ব্যতীত কি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে? এমনকি এইক্ষণেও তিনিই তুমি। সময়ের কোন প্রশ্ন নেই। যদি কোন উপলব্ধি-শূন্য মুহূর্ত থাকে তবেই উপলব্ধির প্রশ্ন হয়। বস্তুতঃ তুমি কোন সময়েই তিনি ব্যতীত নও। তাঁকে উপলব্ধি করছ, সর্বদাই করছ আর কখনই উপলব্ধি-রহিত নও।

তাঁর কাছে সমর্পণ কর, আর তিনি আবির্ভূত হোন বা না হোন তাঁর ইচ্ছানুসারে চল, তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী হও। যদি তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে তাঁকে কিছু করতে বল সেটা সমর্পণ নয়, আদেশ! তুমি তাঁকে আদেশও করবে আবার সমর্পণ করেছি বলবে তা হতে পারে না। কোনটা ভাল আর কখন কিভাবে কি করতে হয় তা তিনি জানেন। সম্পূর্ণভাবে সব কিছু তাঁর ওপর ছেড়ে দাও। সব ভার তাঁর—তোমার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। তোমার সব দুশ্চিন্তা তাঁর। সমর্পণ এরূপ। এই ভক্তি।

কিংবা অনুসন্ধান কর কার এ প্রশ্নগুলো উঠছে। হৃদয়ের গভীরে ডুব দাও আর আত্মা হয়ে থাকো। সাধকের পক্ষে এ দু'টি পথের যে কোন একটা খোলা রয়েছে।

শ্রীভগবান আরও যোগ করলেন—এমন কোন জীব নেই

যে চেতন নয় অতএব শিব নয়। সে যে কেবল শিব তা নয়, তার যা কিছু জানা বা অজানা সবই সে। তথাপি কেবল অজ্ঞানের জন্যই সে জগতকে নানারূপে দেখে। কিন্তু সে যদি তার আত্মাকে দেখে তবে আর জগৎ থেকে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, বস্তুতঃ তার ব্যক্তিসত্তা ও অন্যদের অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায় যদিও আকারটা থাকে। শিব জগতরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু দ্রষ্টা এদের পটভূমি দেখে না। একজন লোকের কথা মনে কর যে কেবল কাপড়ই দেখে কিন্তু যা দিয়ে তৈরী সেই তূলাকে দেখে না; কিংবা যে সিনেমার পর্দার ওপর চলে যাওয়া ছবিগুলো দেখে কিন্তু তার পৃষ্ঠভূমি পর্দা দেখে না কিংবা একজন যে সে যা পড়ে সেই অক্ষরগুলো দেখে কিন্তু যার ওপর সেটা লেখা আছে সেই কাগজ দেখে না। এরূপে বস্তুগুলো চেতনা ও আকারাদি। কিন্তু সাধারণ লোক জগতের বস্তু দেখে পরন্তু তার মধ্যে শিবকে দেখে না। শিব নিজেই এই সব রূপ হয়েছেন আবার চেতনা হয়ে নিজেই তাদের দেখছেন। অর্থাৎ শিবই বিষয় ও বিষয়ের পটভূমি আবার সে-ই নিষ্ক্রিয় শিব ও ক্রিয়াপর শিব বা শিব ও শক্তি বা ঈশ্বর ও সৃষ্টি। যা কিছু আছে বলা হয় তা কেবল চেতনা তা সেটা নিষ্ক্রিয় বা ক্রিয়াশীল যাই হোক। এমন কে আছে যে চেতনা নয়? সুতরাং কে-ই বা জ্ঞানী নয়? তবে আর জ্ঞানের সম্বন্ধে সংশয় কি করে ওঠে বা আকাঙ্ক্ষা কি করে হয়? যদি 'আমি' আমার কাছে প্রত্যক্ষ না হই তবেই না আমি বলতে পারি শিব প্রত্যক্ষ নয়।

এইসব প্রশ্ন কেবল নিজেকে শরীরে সীমিত করার জন্যই ওঠে, তখনই অন্তর ও বাহির, বিষয়ী ও বিষয় ধারণা জাগে। বস্তুলীন দর্শনের কোন বাস্তবিক মূল্য নেই। সেগুলো যদি চিরস্থায়ী হয় তাহলেও একজন তৃপ্ত হয় না। উমা সর্বদাই শিবের কাছে থাকতেন। তাঁরা দু'জনে অর্ধনারীশ্বর হয়েছেন। তথাপি উমা শিবের প্রকৃত স্বরূপ জানতে চাইলেন। তিনি তপস্যা করলেন। তাঁর ধ্যানে তিনি

জ্যোতিদর্শন করলেন। তিনি ভাবলেন, "এ শিব হতে পারে না কারণ এটা তো আমার দর্শনের মধ্যে রয়েছে। আমি এই জ্যোতি অপেক্ষা মহৎ।" তিনি আবার তপস্যা করলেন। চিন্তা অদৃশ্য হয়ে গেল। শান্তিতে সর্বত্র ভরে গেল। তখন তিনি বুঝলেন 'অস্তিত্ব'ই শিবের প্রকৃত স্বরূপ।

মুরুগনার অপ্পরের একটি শ্লোক আবৃত্তি করলে—
"আমার আঁধার করিতে দূর, দিতে মোরে আলো,
তোমারই কৃপায় মোরে প্রদীপ করিয়া জ্বালো।"

শ্রীভগবান মাণিক্কবাচকরের কথা বললেন—

"আমরা ভজন ইত্যাদি করি। কিন্তু যারা তোমায় দেখেছে তাদের কথা শুনিনি বা তাদের দেখিনি।" একজনের ঈশ্বরকে দেখা ও তার ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক হয়ে একটা সত্তা হয়ে যায়। সেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় নেই। সবই এক পরম শিবম্ কেবলম্!

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫১। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের রিডার শ্রীএস. এস. সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী আজ রাত্রে এসেছেন। তাঁর একটা সংশয় ছিল সেটা শর্মার 'আত্মজ্ঞানের' ভাষ্য পড়ে মিটে গেছে। সংশয় ছিল—

জগতটা কি করে একটা কল্পনা বা চিন্তা হয়? চিন্তা মনের ক্রিয়া। মন মস্তিষ্কে রয়েছে। যে মানুষ নিজেই জগতের একটা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশ তার করোটির মধ্যে মস্তিষ্কটা রয়েছে। তবে জগতটা সেই মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে কি করে থাকে?

শ্রীভগবান এই বলে উত্তর দিলেন—যতক্ষণ মনকে পূর্ববর্ণিত বস্তু বলে মনে করা হয় ততক্ষণ সংশয় থাকে। কিন্তু মন কি? আমাদের ভেবে দেখা যাক। ঘুম থেকে উঠলে জগৎ দেখা যায়।

এটা 'আমি'-চিন্তা হওয়ার পর আসে। মাথা উঁচু হয়ে ওঠে। সুতরাং মনও সক্রিয় হয়ে ওঠে। জগৎ কি? এই আকাশে বিস্তৃত কতগুলো বস্তু। কে দেখে? মন। যে মন আকাশ অনুভব করে সে কি নিজেও আকাশ নয়? বাহ্য আকাশ ভূতাকাশ, মনটা মনাকাশ সেটা আবার চিদাকাশে রয়েছে। এরূপে মন আকাশ তত্ত্ব। এটি জ্ঞানতত্ত্ব হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রে একে আকাশ বলে ধরা হয়। একে আকাশ বলে ধরলে প্রশ্নের মধ্যে আপাত বিরোধের সমন্বয় করার আর কোন অসুবিধা নেই। শুদ্ধ (সত্ত্ব) মন আকাশ। রজো ও তমোগুণ স্থূল বস্তু রূপে ক্রিয়া করে ইত্যাদি। এরূপে সমস্ত জগতটা কেবল মানস সৃষ্টি।

আবার একজন যে স্বপ্ন দেখছে তার কথা চিন্তা কর। যাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য সে একটা ঘরে বেশ করে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যায়। যাতে অন্য কিছু দেখতে না হয় সেজন্য সে চোখ বন্ধ করে। তবু সে যখন স্বপ্ন দেখে সে একটা জায়গা, সেখানে অনেক লোক ও তার মধ্যে নিজেকেও দেখে। সেই দৃশ্য কি ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল? এটা কেবল তার মস্তিষ্ক তাকে দেখালো। এটা কি যে ঘুমাচ্ছে তার মস্তিষ্কে কিংবা যে স্বপ্ন দেখছে তার মস্তিষ্কে? যে ঘুমাচ্ছে এটা তারই মস্তিষ্কে রয়েছে। সেই বিরাট স্থানটা তার ক্ষুদ্র কোষে ধরল কি করে? এ থেকেই বহু কথিত বাক্যের যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেবল মনের চিন্তা বা চিন্তার সমষ্টি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে—আমি আমার দাঁতের যন্ত্রণা অনুভব করছি এটাও কি একটা কল্পনা?

ম—হাঁ।

ভ—কোন যন্ত্রণা নেই চিন্তা করে আমি এর উপসম করতে পারি না কেন?

ম—অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকলে দাঁতের ব্যথা বোধ হয় না। ঘুমেও ব্যথা বোধ হয় না।

ভ—কিন্তু ব্যথাটা ঠিকই থাকে।

ম—জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যয়টাও এরূপ দৃঢ় যে একে সহজে ত্যাগ করা যায় না। এর জন্যই যে দেখে সেই ব্যক্তির অপেক্ষা জগতটা কিছু বেশী সত্য হয়ে যায় না।

ভ—এখন চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা যদি কল্পনা হয় তবে শ্রীভগবান কি অন্যরকম কল্পনা ক'রে একে বন্ধ করতে পারেন কিংবা করবেন ?

ম—প্রশ্নকর্তার ভগবানও চীন জাপান যুদ্ধের মত একটা চিন্তা। (হাস্য)

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫২। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা শ্রীধর আই. সি. এস. ও তাঁর স্ত্রী এখানে বেড়াতে এসেছেন, তাঁরা দু'জনই কমবয়সী, বুদ্ধিমান ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন। কিন্তু তাঁরা এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহিলাটি ধ্যান কি করে দৃঢ় হয় জানতে চাইলেন।

ম—ধ্যান কি ? এটা চিন্তা অপসরণ। উপস্থিত কষ্টগুলো চিন্তার জন্য হয় আর সেগুলোও একটা চিন্তা। চিন্তা ত্যাগ কর। সেটাই আনন্দ আর তাই ধ্যান।

ভ—চিন্তা কি করে ত্যাগ করা যায় ?

ম—চিন্তাগুলো একজন চিন্তকের। সেই চিন্তকের আত্মা হয়ে থাকো আর তাতেই সব চিন্তার পরিসমাপ্তি।

শ্রীধর শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্ম পূর্ণ হয়ে আমাদের সৃষ্টিই বা কেন করলেন আর ব্রহ্মলাভের জন্য কষ্টেই বা কেন ফেললেন ?

ম—যে এই প্রশ্ন করছে সেই ব্যক্তি কোথায় রয়েছে ? সেও এই জগৎ ও সৃষ্টির অন্তর্গত। সে যখন নিজেই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত তখন

সে প্রশ্ন কি করে তোলে? তাকে এসবের অতীতে যেতে হবে আর দেখতে হবে যে তখন প্রশ্ন ওঠে কিনা।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫৩। তিনজন মহিলা, নিউজিল্যাণ্ডের শ্রীমতী হার্স্ট এবং লণ্ডনের শ্রীমতী ক্রেগ ও শ্রীমতী এলিসন অল্প সময়ের জন্য এসেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বিশ্বশান্তির জন্য সব থেকে ভাল উপায় কি?

ম—বিশ্ব কি? শান্তি কি আর কেই-বা তার কর্মী? তোমার বিশ্ব তোমার সুষুপ্তিতে ছিল না, কেবল জাগ্রত অবস্থায় তোমার মনের অভিক্ষেপ রূপে রয়েছে। সুতরাং এটা একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। শান্তির অর্থ বিক্ষোভের অভাব। মনে চিন্তা উদয়ের জন্য একজন ব্যক্তির চঞ্চলতা হয়, একজন ব্যক্তিও বিশুদ্ধ চেতনা থেকে ওঠা অহংকারমাত্র।

শান্তি আনার অর্থ চিন্তা শূন্য হওয়া আর বিশুদ্ধ চেতনায় থাকা। যদি একজন নিজে শান্তিতে থাকে তবে সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত থাকে।

কোন কাজ অন্যায় মনে হলেও সেটা যদি কোন একটা বৃহত্তর অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য হয় তবে তা করা উচিত না অনুচিত?

ম—কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়? এর সম্বন্ধে কোন একটা মানদণ্ড নেই যা দিয়ে ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার করা যাবে। মতামত একজনের স্বভাব ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। আর সেগুলোও কেবল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের জন্য চিন্তা করো না। কিন্তু চিন্তাগুলো ত্যাগ কর। তুমি যদি সব সময়ে ন্যায়পথে থাকো তবে জগতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভ—ধ্যানের সময়ে কি বিষয়ে চিন্তা করা উচিত?

ম—ধ্যান কি? এটা চিন্তা দূর করা। আমরা চিন্তার দ্বারা বিক্ষিপ্ত, সেগুলো একটার পর একটা এসে যায়। একটা চিন্তা ধরে থাকো যাতে অন্যগুলো দূরে যায়। অনবরত অভ্যাসে মনের শক্তি লাভ হওয়ায় ধ্যানে লেগে থাকা যায়।

ধ্যান সাধকের মানসিক উন্নতির তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। যদি একজন উপযুক্ত হয় তবে সে চিন্তককে ধরে থাকতে পারে আর চিন্তাকারীও স্বতঃই তার উৎসে অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতনায় ডুবে যায়।

যদি সে চিন্তককে ধরতে না পারে তবে ঈশ্বর চিন্তা করবে; আর সময়ে যথেষ্ট বিশুদ্ধতা লাভ ক'রে চিন্তাকারীকে ধরতে পারবে এবং পরমসত্তায় ডুবে যাবে।

একজন মহিলা এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলেন।

শ্রীভগবান দেখালেন যে অন্যের দোষ দেখা একজনের নিজেরই দোষ। ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যই প্রথম পাপ। একজনের নিজের পাপই বাইরে প্রতিফলিত হয়, সে অজ্ঞানে তা অন্যের ওপর চাপায়। যে অবস্থায় এই পার্থক্যটা ওঠে না সেই অবস্থায় পৌছানোই সব থেকে ভাল পথ। তুমি কি সুষুপ্তিতে কোন ভাল-মন্দ দেখেছিলে? সুষুপ্তিতে তুমি কি ছিলে না? জাগ্রত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকো, আত্মস্থিত হয়ে থাকো আর যা কিছু হচ্ছে তা থেকে নির্লিপ্ত থাকো।

তাছাড়া তুমি যতই কেন তাদের উপদেশ দাও, তোমার শ্রোতারা নিজেদের শোধরাবে না। তুমি নিজে ঠিক থাকো আর শান্ত হয়ে থাকো। তোমার মৌন তোমার কথা ও কাজের থেকে বেশী কার্যকরী হবে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রগতি। তখন জগতটা স্বর্গরাজ্য হয়, সেটা তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে।

ভ—যদি নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে হয় তবে জগতটা রয়েছে কেন?

ম—জগতটা কোথায় রয়েছে আর একজন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোথায় যায় ? সে কি উড়োজাহাজে করে আকাশে উড়ে যায় ? এটা কি প্রত্যাহার করা হল ?

প্রকৃত সত্য—জগতটা একটা ধারণা। তুমি কি বল—তুমি জগতে কিংবা জগৎ তোমাতে ?

ভ—আমি জগতে রয়েছি। আমি তার অংশ।

ম—এইটাই ভুল। যদি তোমার থেকে জগতের পৃথক অস্তিত্ব থাকে, সে কি এসে বলে যে, সে আছে ? না, তুমি দেখ যে এটা রয়েছে। তুমি যখন জেগে থাকো তখন এটা দেখো, সুষুপ্তিতে দেখো না। যদি এটা তোমার থেকে পৃথক হত তবে এটা তোমায় তা বলত আর সুষুপ্তিতেও তুমি এর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে।

ভ—আমি আমার জাগৃতিতে এর সম্বন্ধে সচেতন হই।

ম—তুমি কি আগে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হও তারপর জগৎ সম্বন্ধে হও ? কিংবা আগে জগৎ সম্বন্ধে তারপর নিজের সম্বন্ধে হও কিংবা একই সঙ্গে দু'টিকে জানো ?

ভ—আমায় বলতে হবে একসঙ্গে।

ম—তুমি কি নিজের সম্বন্ধে জানার আগে ছিলে কিংবা ছিলে না ? জগত-বোধ হওয়ার সময়ে কিংবা তার পূর্বে কি তুমি তোমার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব স্বীকার কর ?

ভ—হ্যাঁ, করি।

ম—যদি তুমি নিজে সব সময়েই থাকো আর জগতটা যদি তোমার থেকে পৃথক হয় তবে সুষুপ্তিতে তুমি একে জানো না কেন ?

ভ—আমি আমার ও জগৎ সম্বন্ধে একই সঙ্গে সচেতন হই।

ম—সুতরাং তুমি তোমার সম্বন্ধে সচেতন হও। কে কার সম্বন্ধে সচেতন হয় ? দু'টি কি আত্মা আছে ?

ভ—না।

ম—তবেই দেখছ যে চেতনার অবস্থা-ক্রম আছে বলে

ভাবাটা ভুল। আত্মা সর্বদাই চেতনা। যখন সে নিজেকে দ্রষ্টা মনে করে তখন সে বস্তু দেখে। এই বিষয়ী ও বিষয় সৃষ্টিই জগৎ সৃষ্টি। বিষয়ী ও বিষয় বিশুদ্ধ চেতনার সৃষ্টি। তুমি একটা সিনেমার পর্দার ওপর ছবিগুলো চলে যেতে দেখো। যখন তুমি ছবি দেখতে ব্যস্ত তখন তুমি পর্দার বিষয় সচেতন নও। কিন্তু পর্দাটা পিছনে না থাকলে ছবিগুলো দেখা যায় না। জগতটা ছবির মতন আর চেতনাটা পর্দা। চেতনা বিশুদ্ধ। এটাই আত্মা যা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। বিষয়ী ও বিষয় ত্যাগ কর, বিশুদ্ধ চেতনাই কেবলমাত্র থাকবে।

ভ—যদি এটা না-ই থাকবে তবে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম কেন ঈশ্বর হলেন আর জগৎ সৃষ্টি করলেন ?

ম—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কি তোমাকে এসে এরূপ বলেছেন ? তুমিই বলছ ব্রহ্ম ঈশ্বর ইত্যাদি হয়েছেন। আর সুষুপ্তিতেও এটা বলো না। কেবল তোমার জাগ্রত অবস্থায় তুমি ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে বলো। জাগ্রত অবস্থাটা বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বৈত অবস্থা—চিন্তা ওঠার জন্য। সুতরাং এগুলো তোমার চিন্তার সৃষ্টি।

ভ—কিন্তু আমার সুষুপ্তির সময়ে আমি না জানলেও জগৎ থাকে।

ম—এটা থাকার প্রমাণ কি ?

ভ—অন্যেরা একে জানে।

ম—তোমার সুপ্ত অবস্থায় কি তারা তোমায় বলে কিংবা সেসময়ে যারা জগৎ দেখে তাদের সম্বন্ধে কি তুমি সচেতন থাকো ?

ভ—না। কিন্তু ঈশ্বর সব সময়ে জানেন।

ম—ঈশ্বরের কথা থাক। নিজের কথা বল। তুমি তাঁকে জানো না। তুমি তাঁর সম্বন্ধে যা মনে কর তিনি কেবল তাই। তিনি কি তোমার থেকে পৃথক ? তিনি সেই বিশুদ্ধ চেতনা যাতে সকল চিন্তার উদয় হয়। তুমিও সেই চেতনা।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫৪। শ্রীমতী ধর—শ্রীভগবান এমনকি কাজ করার সময়েও অনুসন্ধান অভ্যাস করার পরামর্শ দেন। অনুসন্ধানের চরম অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হবে আর তার ফলে শ্বাস নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। শ্বাস নিরুদ্ধ হলে কাজ চলবে কি করে কিংবা অন্যভাবে কাজ-করা-কালে শ্বাস নিরোধ কি করে হবে?

ম—সাধ্য ও সাধনার মধ্যে একটা বিপর্যাস আছে। অনুসন্ধানকারী কে? সে সাধক, সিদ্ধ নয়। অনুসন্ধান বলতে এই বোঝায় যে, অনুসন্ধিৎসু নিজেকে অনুসন্ধান থেকে পৃথক বলে অনুভব করে।

যতক্ষণ এই দ্বৈতবোধ থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার লোপ না হয় আর আত্মাকে শাশ্বত সত্তা (অনুসন্ধান ও অনুসন্ধানকারী উভয়) বলে অনুভূত না হয় ততক্ষণ অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে।

বস্তুতঃ আত্মা শাশ্বত এবং অবিচ্ছিন্ন চেতনা। অনুসন্ধানের লক্ষ্য আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে চেতনা তা অনুভব করা। যতক্ষণ পার্থক্য অনুভূত হয় ততক্ষণ অনুসন্ধান অভ্যাস করার প্রয়োজন আছে।

একবার জ্ঞানের উদয় হলে আর অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। সে প্রশ্নও উঠবে না। চেতনা কি কখন জিজ্ঞাসা করে কে চেতন? তখন চেতনা বিশুদ্ধম্ কেবলম্।

অনুসন্ধানকারী তার ব্যক্তিগত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন। অনুসন্ধান করার সময়ে তার ব্যক্তিচেতনার কোন লাঘব হয় না; কিংবা বাইরের কাজও এই চেতনার বাধা হয় না। যদি আপাত বহিরঙ্গ কর্ম ব্যক্তিচেতনার বাধা না হয় তবে যে কাজ আত্মা থেকে পৃথক নয়, সে কি নিরবচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় ও কাজ থেকে পৃথক ব্যক্তিসত্তা নয় এরূপ আত্মবোধের বাধা হতে পারে?

৪৫৫। শ্রীমতী ধর—আমি এই সৃষ্টির একটা অংশ সুতরাং তার অধীন। আমি স্বাধীন না হলে এ রহস্যের সমাধান করতে পারি না। তথাপি শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে কি তিনি আমার হয়ে প্রশ্নটার উত্তর দেবেন না?

ম—হাঁ। ভগবানই বলছেন, 'স্বাধীন হও আর নিজেই রহস্যের সমাধান কর। এটা তোমাকেই করতে হবে।' আবার তুমি এখন কোথায় যে এই প্রশ্ন করছ? তুমি জগতে না জগৎ তোমাতে? তুমি স্বীকার করবে যে সুষুপ্তিতে জগৎ দেখা যায় না অথচ তুমি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারো না। তুমি জেগে উঠলে জগৎ দেখা যায়। সুতরাং এটা কোথায়? স্পষ্টতঃ এটা তোমার চিন্তায়। চিন্তা তোমার অভিক্ষেপ। প্রথমে 'আমি' সৃষ্টি হয় তারপর জগৎ সৃষ্টি হয়। জগতটা 'আমি'র সৃষ্টি, যেটা আবার আত্মা থেকে ওঠে। এরূপে জগতের রহস্যের তখনই সমাধান হবে যখন তুমি 'আমি'র উদয়ের রহস্য সমাধান করবে। সেজন্য বলি, তোমার আত্মাকে খোঁজো।

আবার, জগৎ এসে কি বলে, "কেন 'আমি' আছি? 'আমার' কি করে সৃষ্টি হল?" তুমিই এই সব প্রশ্ন কর। প্রশ্নকর্তাই তার ও জগতের সম্বন্ধে সম্পর্কটা ঠিক করুক। তাকে স্বীকার করতে হবে যে জগতটা তার কল্পনা। কে কল্পনা করে? সে এবার 'আমি'কে আর তারপর আত্মাকে খুঁজুক।

অধিকন্তু এযাবৎ সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় হয় নি। এই মতবাদের অসাদৃশ্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে এভাবে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক। এগুলো কেবল বুদ্ধিগত ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সবই সত্য। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় কোন সৃষ্টি নেই। লোকে যখন জগৎ দেখে তখন আত্মাকে দেখতে পায় না। আত্মাকে দেখলে জগৎ

দেখা যায় না। অতএব আত্মাকে দেখো আর উপলব্ধি কর যে কোন সৃষ্টি হয় নি।

শরীর অসুস্থ হওয়ায় এত কাছে থেকেও ভদ্রমহিলা হলঘরে না যেতে পারার জন্য দুঃখিত। একথা শ্রীভগবানকে জানানো হল। তিনি বললেন, "বেশ, এভাবে চিন্তা করাই তাকে সান্নিধ্যে রাখে। হলে বসে অন্য চিন্তা করার থেকে এটা ভাল।"

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

সাধুসঙ্গ

সতর্কতার বাণী ঃ—

৪৫৬। স্বামী রামদাস তাঁর 'ভিসন' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে লিখেছেন, "সর্বপ্রকারে সাধুসঙ্গ কর ; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অনির্দিষ্ট কাল থেকো না। 'বেশী মাখামাখি করলে মান থাকে না' প্রবাদটি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

"নিঃসন্দেহে উপযুক্ত সৎসঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। অতএব সত্যান্বেষীর পক্ষে সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাধুসঙ্গ বলতে এই বোঝা উচিত নয় যে স্থায়ীভাবে সাধুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা।

"সে অল্প সময়ের জন্য তাঁদের সঙ্গ করবে, উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করবে, অন্তর্নিহিত সত্যের বোধ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হবে। সে যে প্রেরণা ও অনুভূতি লাভ করেছে সেটি স্তিমিত বা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বেই তার সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল।

বিদ্রূপকারী হয়ে যেতে পারে ঃ—

"লেখকের এরূপ অনেক ঘটনা জানা আছে আর তিনি বহুবার শুনেছেন বা পড়েছেন যে এরূপ দীর্ঘ সাধুসঙ্গের ফলে কেবল যে সাধকদের উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চলে যায় তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে

তারা নাস্তিক ও উপহাসক হয়ে যায়। একজন সাধকের বিশ্বাস, শুদ্ধতা ও ব্যাকুলতা চলে যাওয়া তার পক্ষে প্রভূত ক্ষতি।

"একটি চারাগাছ একটা বড় গাছের তলায় বড় হলে তার পুষ্টি ও শক্তি লাভ হয় না। তার বৃদ্ধি খর্বতা প্রাপ্ত হয় আর সে বিকৃত ও রোগগ্রস্ত হয়ে যায়। অন্যপক্ষে সেই গাছটিকে যদি খোলা জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রাখা যায় তবে সে উপর ও নীচ থেকে শক্তি আহরণ ক'রে বিশাল মহীরুহ হতে বাধ্য।

অপূর্ণ বিকাশ ঃ—

"একজন সাধক, যে কেবলমাত্র সাধুর বাহ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত ও তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে দিন যাপন করে, তার উন্নতিহীন জীবন ঐ চারাগাছের উপমার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে তার আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপম সম্ভাবনার অবাধ প্রসারের প্রেরণা নিরুদ্ধ হয়। সে তার প্রগতির মৌলিক গুণাবলী যথা নির্ভীকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও তিতিক্ষা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে অক্ষম হয়। যে এক অদ্বিতীয় মহান পথ-প্রদর্শক তার দেহ-মন-বাক্যকে পরিচালনা করেন, তিনি তার অন্তঃস্থিত সর্বশক্তিমান আত্মা। সেই আত্মার নিকট সমর্পণ করা ও তারই প্রতিমূর্তি হওয়া তার লক্ষ্য। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের অভিজ্ঞতা ও শক্তির দ্বারা সংগ্রাম ও উন্নতি করা এবং অবশেষে তার নিজের উদ্যমে নিজেকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করাই মুক্তি ও শান্তি লাভ।

"পূর্বে যা বলা হয়েছে, তা থেকে ঈশ্বর-দ্রষ্টা পুরুষের সঙ্গের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। এরূপ সংসর্গ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুতঃ সাধুকৃপা সাধনার অমূল্য উপায় আর এটি ব্যতিরেকে একজন সাধকের অবস্থা একটি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মুক্তির

আশায় পিঞ্জরের লৌহ শলাকায় পক্ষ তাড়নের মত ব্যর্থ। সাধুরাই ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা। হিন্দু ধারণানুযায়ী জ্ঞানী ঈশ্বরের অবতার। সুতরাং তাঁকে শ্রদ্ধা কর, তাঁর সঙ্গের বিরল আনুকূল্য লাভ কর, তাঁকে সরল ও পবিত্র হৃদয়ে সেবা কর, অভিনিবেশ সহকারে তাঁর উপদেশ শ্রবণ কর ও তদনুযায়ী কর্ম করার চেষ্টা ক'রে তোমার অভীষ্ট লক্ষ্য সত্যের পূর্ণ জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু তাঁর সাহচর্যের মোহে প্রথম সাক্ষাতে লাভ করা আধ্যাত্মিক কৃপা হতে বঞ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।"

এই অংশটি শ্রীভগবানকে পড়ে শোনানো হল। তিনি শুনে নীরব রইলেন। তাঁকে সাধুসঙ্গ বিপদজনক কিনা বলার জন্য অনুরোধ করা হল। তখন তিনি একটি তামিল পদ উদ্ধৃত করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে বিদেহমুক্তি পর্যন্ত গুরুসঙ্গ করা বিধেয়। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে সৎপুরুষ কোথায়? তিনি অন্তরে। তারপর তিনি আবার একটি পদ বললেন যার অর্থ—

"হে প্রভু! জন্ম জন্মান্তরে তুমি হৃদয়ে রয়েছ।
যে ভাষা বুঝি, সে ভাষায় উপদেশ দিতে,
গুরুরূপে দেখা দিয়ে পথ দেখায়েছ॥"

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫৭। শ্রীমতী রোসিতা ফোর্বেস্ ভারতে এসেছেন শোনা যাচ্ছে। শ্রীভগবান বললেন যে অভিযাত্রীরা অদ্ভুত কিছু খুঁজে পেয়ে, নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কার ক'রে ও তারজন্য বিপদজনক ঝুঁকি নিয়ে আনন্দ পায়। এটা রোমাঞ্চকর। কিন্তু সুখ কোথায়? কেবল অন্তরে। সুখ বাইরের জগতে খোঁজা ঠিক নয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫৮। শ্রীভগবান বললেন যে অদ্বৈতবাদ উপদেশ দেওয়া হয় কিন্তু কাজে অদ্বৈত নয়। গুরু ও উপদেশ লাভ না হলে একজন অদ্বৈতবাদ শিখবে কোথা থেকে? সেখানে কি দ্বৈতবোধ নেই? এটার অর্থ এই।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৫৯। আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্কের স্বগতোক্তি উদ্ধৃত ক'রে শ্রীভগবান বললেন—নির্জনতার আনন্দ একান্তবাসে নেই। এটা জনবহুল স্থানেও পাওয়া যায়। আনন্দ নির্জনতায় বা কোলাহলে নেই। এটা আত্মায়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৬০। সূর্যোদয়ের সময়ে চাঁদ দেখে শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন—চাঁদ আর আকাশের মেঘ দেখো। ওদের ঔজ্জ্বল্যের কোন পার্থক্য নেই। চাঁদও যেন এক টুকরা মেঘ। জ্ঞানীর মনও সূর্যোদয়-কালে চাঁদের মত। এটা আছে কিন্তু এর নিজস্ব উজ্জ্বলতা নেই।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৬১। শ্রীভগবান আজকের আসা চিঠিগুলো দেখছিলেন। তার মধ্যে একটি পড়লেন—

একটি ব্রাহ্মণ বালক কোন এক বাড়ীতে কাজ করত। সে একদিন যথা সময়ে ঘুমাতে গেল। সে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে

উঠল। জেগে উঠে সে বললে যে তার মনে হল যে তার প্রাণ নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য সে চিৎকার করে। একটু পরেই সে নিজেকে মৃত-বলে দেখে আর তার আত্মাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিষ্ণু অন্যান্য দেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন আর বৈষ্ণব তিলকধারী বৈষ্ণবজন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। বিষ্ণু বললেন "এই লোকটির আগামী কাল বেলা ২টার সময়ে আসার কথা। আজ এখন কেন আনা হল?" ছেলেটি জেগে ওঠে ও তার অভিজ্ঞতা বলে। পরের দিন ২টার সময়ে সে মারা যায়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৬২। শ্রীমতী ধর কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ও শ্রীভগবানের সাহায্য লাভের জন্য ব্যগ্র। তিনি বহু ইতস্ততঃ করে শ্রীভগবানের কাছে গিয়ে নম্রভাবে নিজের অসুবিধার কথা বললেন—আমার মনের একাগ্রতার প্রচেষ্টা হঠাৎ হৃৎকম্প ও একপ্রকার দ্রুত ও হ্রস্ব শ্বাসকষ্টের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর অজস্র চিন্তাস্রোত উদয় হওয়ায় মনঃ-সংযম অসম্ভব হয়। শরীর সুস্থ থাকলে তবু কিছুটা সফলকাম হই আর গভীর ধ্যানে শ্বাস নিরুদ্ধ হয়। আমি অনেকদিন থেকে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যের সুযোগে ধ্যানের পরাকাষ্ঠা লাভের আশা করে আছি এবং বহু কষ্টে এখানে এসেছি। এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ি, ধ্যান করতে পারি না তাই হতাশ হয়ে গেছি। ঐরূপ শ্বাসকষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মনকে একাগ্র করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও তৃপ্ত হই নি। এখান থেকে চলে যাওয়ার দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এখান থেকে যেতে হবে ভেবে আরও নিরাশ হয়ে পড়েছি। এখানে দেখি লোকেরা হলঘরে ধ্যানে বসে শান্তি লাভ করে, আমার ভাগ্যে এরূপ শান্তি নেই। এটাও হতাশার একটা কারণ।

ম—'আমি মনকে একাগ্র করতে পারছি না' এই চিন্তাও একটা বাধা। এরূপ চিন্তা মনে উঠবে কেন?

ভ—চব্বিশ ঘণ্টা মনে চিন্তা না করে কেউ কি থাকতে পারে? আমি কি ধ্যান না করে থাকব?

ম—'ঘণ্টা' আবার কি? এটাও একটা কল্পনা। তোমার প্রত্যেকটা প্রশ্ন কোন না কোন চিন্তা দ্বারা প্ররোচিত।

তোমার স্বরূপ শান্তি ও আনন্দ। চিন্তাগুলো উপলব্ধির বাধা। একজনের ধ্যান বা একাগ্রতার চেষ্টা কেবল এই বাধাগুলো দূর করা, আত্মা লাভ করা নয়। কেউ কি আত্মা ছাড়া আছে? না! আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলা হয়েছে শান্তি। যদি সেই শান্তি খুঁজে না পাওয়া যায়, এই না পাওয়াটাও একটা চিন্তা যেটা আত্মার বিরোধী। একজন এই পরক্ কল্পনাগুলো ত্যাগ করার জন্য ধ্যান অভ্যাস করে। সুতরাং চিন্তা উঠলেই তৎক্ষণাৎ একে দমন করতে হবে। যখনই কোন চিন্তা ওঠে তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিও না। তুমি আত্মার কথা ভুলে গেলেই শরীর সম্বন্ধে সচেতন হও। কিন্তু তুমি কি আত্মাকে ভুলতে পারো? আত্মা হয়ে কি করে আত্মাকে ভুলবে? আত্মাকে ভুলতে হলে দু'টি আত্মা থাকা চাই। এটা অসম্ভব। সুতরাং তোমার আত্মার কোন নৈরাশ্য নেই; এর কোন অপূর্ণতাও নেই; এটা সর্বদাই আনন্দময়। বিপরীত ভাবনাটা কেবল একটা চিন্তা যার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। চিন্তাশূন্য হও। কেনই বা একজন ধ্যানের চেষ্টা করবে? নিজে আত্মা হওয়ায় সবাই সর্বদা জ্ঞানী, কেবল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে থাকো।

তুমি ভাবছ যে তোমার স্বাস্থ্য তোমায় ধ্যান করতে দেয় না। এই হতাশার মূল খুঁজতে হবে। এর মূল শরীরকে ভুল করে আত্মা ভাবা। রোগটা আত্মার নয়। এটা শরীরের। কিন্তু শরীর এসে বলে না যে এর রোগ হয়েছে। তুমিই এটা বল। কেন? কারণ তুমি ভুল করে নিজেকে শরীর বলে মনে কর।

শরীরটা একটা চিন্তা। তুমি প্রকৃত যা তাই হয়ে থাকো। হতাশ হওয়ার কারণ নেই।

ভদ্রমহিলাকে কেউ ডেকে নিয়ে গেল, তিনি চলে গেলেন। কিন্তু প্রশ্নটা আলোচিত হতে থাকল—

ভ—শ্রীভগবানের উত্তর আমাদের আর প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না, তার অর্থ এই নয় যে আমাদের মন শান্ত হয়েছে কিন্তু আমরা এ বিষয়ে আর যুক্তি দেখাতে অক্ষম। আমাদের অসন্তোষের শেষ হয়নি। শারীরিক কষ্ট দূর হওয়ার জন্য মানসিক কষ্ট দূর হওয়া চাই। চিন্তা চলে গেলে দু'টি-ই যায়। বিনা চেষ্টায় চিন্তাও যায় না। উপস্থিত মনের দুর্বলতার জন্য চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। মনের শক্তি লাভের জন্য কৃপার প্রয়োজন। সমর্পণ হলেই কৃপা লাভ হয়। সুতরাং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকল প্রশ্নের একই লক্ষ্য, শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা।

ম—তিনি হাসলেন আর বললেন "হাঁ"।

ভ—সমর্পণকে ভক্তি বলা হয়। কিন্তু সবাই জানে শ্রীভগবান অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দেন। এরূপে শ্রোতার কিংকর্তব্যাবমূঢ়তা হয়।

ম—পূর্ণজ্ঞানের সঙ্গে সমর্পণ হলে তবেই কার্যকরী হয়। এরূপ জ্ঞান বিচারের পরেই হয়। এর সমাপ্তি সমর্পণে।

ভ—ব্যক্তিসত্তার অতীত হলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এটা জ্ঞান। এখানে সমর্পণের আবশ্যকতা কোথায়?

ম—ঠিক তাই। জ্ঞানে ও সমর্পণে কোন পার্থক্য নেই। (হাস্য)

ভ—তবে আর জিজ্ঞাসু কি করে সন্তুষ্ট হয়। একটাই মাত্র উপায়, সৎসঙ্গ বা ঈশ্বর-ভক্তি।

ম—হাসলেন আর বললেন "হাঁ"।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪৬৩। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর পূর্বতন সেবকদ্বয় পালানীস্বামী ও আইযাস্বামীর প্রশংসা করলেন।

তিনি বললেন যে তারা বাগানে দু'টি মাচা করে দিয়েছিল, একটাতে তিনি থাকতেন আর অন্যটাতে পালানীস্বামী ; সেগুলো বেশ আরামপ্রদ ছিল। সেই মাচা দু'টি খড় ও বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী ছিল। এই সোফার থেকে আরামদায়ক ছিল। পালানীস্বামী প্রতিদিন রাত্রে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথে কিড়নাথুর থেকে খাবার ভিক্ষা করে আনত। শ্রীভগবানের আপত্তি করা সত্ত্বেও পালানীস্বামী সেটা করা ছাড়েনি। তার কোন লোভ বা আসক্তি ছিল না। সে পক্ প্রণালী উপনিবেশের জরিপের কাজ করে কিছু টাকা রোজগার করেছিল আর সহরের কারও কাছে তার পুঁজি জমা রেখেছিল ; সময়ে অসময়ে সেই থেকে খরচ করত। তার জন্মস্থানের গ্রামে সে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সেটা অস্বীকার ক'রে শেষ দিন অবধি শ্রীভগবানের কাছে ছিল।

আইযাস্বামী দক্ষিণ আফ্রিকাতে একজন ইউরোপীয়ের কাছে কাজ করেছিল, বেশ পরিচ্ছন্ন, কর্মঠ ও সমর্থ ছিল। সে একসঙ্গে দশটা আশ্রম চালাতে পারত। সেও লোভ ও আসক্তি মুক্ত ছিল। সে পালানীস্বামীর অনুগত ছিল। এমনকি তাকে ভালও বাসত। পালানীস্বামীর থেকে কাজের লোক ছিল।

আন্নামালাই মহর্ষিকে প্রথমে বিরূপাক্ষ গুহায় দেখে, পরে কোভিলুর গিয়ে কিছু তামিলশাস্ত্র পাঠ করে। সে স্কন্দাশ্রমে ফিরে আসে। ১৯২২ সালে জানুয়ারী মাসে উনত্রিশ বছর বয়সে মারা যায়। ইতিমধ্যে সে আবেগপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ছত্রিশটি তামিল পদ রচনা করে।

শ্রীভগবান সেগুলো পাঠ করিয়ে শোনালেন ও সংক্ষেপে তাদের অর্থও বললেন।

৫ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৬৪। অরুণাচল মাহাত্ম্য থেকে একটা অংশ পড়া হল। এটা পঙ্গুমীর (খঞ্জ সাধু) সম্বন্ধে যার শ্রীঅরুণাচলের কৃপায় পা ভাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর শ্রীভগবান তাঁর গুরুমূর্তমে থাকা কালে একজন লোকের সম্বন্ধে বললেন। সেই লোকটির নাম কুপ্পু আইয়ার। তার দু'টি পা পঙ্গু ছিল, হাঁটতে পারত না। সে একবার পিছন ঘসে ঘসে বেট্রাবলমে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে একজন বৃদ্ধ এসে বললে, "উঠে চলো তো। পিছন ঘসছ কেন?" কুপ্পু আইয়ার চমকিত ও আনন্দে অধীর হয়ে গেল। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে দিলে। একটু গিয়ে পিছন ফিরে তার উপকারী অপরিচিত লোকটির খোঁজ করলে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। যারাই তার চলা দেখে অবাক হয়ে যেত সে তাদের এই গল্প বলত। সহরের যে কোন বৃদ্ধ কুপ্পু আইয়ারের পা ভাল হয়ে যাওয়ার গল্প জানে।

আবার মেয়েদের বিদ্যালয়ের একটি মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার গহনা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ সেখানে একজন বৃদ্ধ এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে বাড়ী পৌছে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তিরুভন্নমালাই-এ প্রায়ই এরূপ রহস্যময় ঘটনা ঘটে।

৬ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৬৫। শ্রীভগবান একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতিকে 'উপদেশ সারের' কয়েকটি বিষয়ে এরূপ ব্যাখ্যা করলেন—

(১) ধ্যান একটা স্রোতের ধারার মত অবিচ্ছিন্ন হবে। যদি অখণ্ড হয় তাকে সমাধি বা কুণ্ডলিনী বলা হয়।

(২) মন সুপ্ত হয়ে আত্মায় লীন হতে পারে; সেটা আবার জেগে উঠতে বাধ্য; এটা জেগে উঠলে একজন আবার পূর্বের মত হয়ে যায়। কারণ এ অবস্থায় মনের সংস্কার সুপ্ত অবস্থায় থাকে আর অনুকূল পরিবেশ পেলেই জেগে ওঠে।

(৩) আবার মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটা পূর্ব কথিত মনের থেকে পৃথক কারণ এখানে আসক্তি নষ্ট হয়ে গেছে আর কখনই ওঠে না। যদিও সমাধি থেকে উঠে একজন জগৎ দেখে তথাপি আবশ্যকতানুসারেই তার গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ এক সত্যের একটা ব্যবহারিক রূপ বলে মনে করে। একমাত্র সমাধিতেই প্রকৃত সত্তা অনুভূত হয়, তখন যা থাকে এখনও তাই আছে। নতুবা সেটা সত্য বা নিত্যবর্তমান সত্তা হয় না। যা সমাধিতে ছিল সেটা এখনও এখানে আছে। একে ধরো আর এটাই তোমার সত্তার স্বরূপ অবস্থা। সমাধি অভ্যাসে এটা হয়। অন্যথা যে নির্বিকল্প সমাধিতে মানুষ একটা কাঠের মত হয়ে থাকে তাতে কি লাভ হয়? তাকে কখন না কখন জেগে উঠে জগতের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সহজ সমাধিতে সে জগৎ ব্যাপারে বিচলিত হয় না।

চলচ্চিত্রের পর্দায় কত ছবি চলে যায়—আগুনে সব পুড়ে গেল; জলে সব ভেসে গেল; কিন্তু পর্দার কিছু হল না। ছবিগুলো কেবল একটা সঞ্চরমান ব্যাপার কিন্তু পর্দা ঠিক থাকে। অনুরূপ ভাবে জ্ঞানীর সামনে জগৎ ব্যাপার ঘটে যায়, তিনি অবিচলিত থাকেন।

তুমি বলবে লোকে জগৎ ব্যাপারে সুখ ও দুঃখ দেখে। এটা আরোপের জন্য হয়। এটা হওয়া উচিত নয়। এর জন্যই সাধনা করা হয়।

সাধনার দু'টি প্রণালী—ভক্তি কিংবা জ্ঞান। এমনকি এরাও লক্ষ্য নয়। সমাধি লাভ হওয়া চাই; এটা সর্বক্ষণ অভ্যাস করতে

হবে যতক্ষণ না সহজ হয়। তারপর আর কিছু করার প্রয়োজন নেই।

৪৬৬। ন্যাশন্যাল্ ব্যাঙ্কের কর্মী শ্রীবৈদ্যলিঙ্গম্—ধ্যানে জগৎ অদৃশ্য হয়ে যায় আর আনন্দ লাভ হয়। এটা ক্ষণস্থায়ী। একে কি করে স্থায়ী করা যায়?

ম—সংস্কার ত্যাগ করে।

ভ—আত্মা কি কেবল সাক্ষীমাত্র নয়?

ম—'সাক্ষী' বললেই সেখানে কোন দৃশ্য বস্তু আছে। এটা দ্বৈত বোধ। সত্য উভয়ের অতীত। 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বে. উ-৬/১১) মন্ত্রে সাক্ষীর অর্থ সন্নিধি (উপস্থিতি) নিতে হবে, যার অভাবে কিছুই নেই। দেখ দৈনন্দিন কাজের জন্য সূর্যের কিরূপ প্রয়োজনীয়তা। সে জগতের কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে না তবু তার অভাবে কোন কাজই হয় না। সে কাজের সাক্ষী। আত্মার সম্বন্ধেও তাই।

৭ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৬৭। যোগী রামিয়া—শক্তির জন্যই সব কাজ হয়। শক্তির সামর্থ্য কতদূর? একজনের নিজস্ব চেষ্টা ছাড়া কি শক্তি কিছু করতে পারে?

ম—'পুরুষ' বলতে কি বোঝো তার ওপর উত্তরটা নির্ভর করে। সেটা অহংকার কিংবা আত্মা?

ভ—স্বরূপই পুরুষ।

ম—সে কিন্তু কোন প্রযত্ন করতে পারে না।

ভ—জীবই প্রযত্ন করে।

ম—যতক্ষণ অহংভাব আছে ততক্ষণ প্রযত্নের দরকার।

যখন অহংভাব থাকে না তখন কর্ম স্বয়ংক্রিয় হয়। অহংকার আত্মার উপস্থিতিতেই কাজ করে। সে আত্মা ছাড়া থাকে না।

জগৎ যা হয়েছে তা আত্মা তার শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে নিজে নিষ্ক্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, "আমি কর্তা নই তথাপি কর্ম হয়ে যায়।" মহাভারত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সব আশ্চর্য ঘটনা তাঁর দ্বারাই ঘটেছে। তবু তিনি বলেছেন যে তিনি কর্তা নন। এটা সূর্য ও জগতের কর্মের মত!

ভ—তিনি অভিমান (আসক্তি) মুক্ত অন্যপক্ষে জীব অভিমানযুক্ত।

ম—হ্যাঁ। আসক্ত হওয়ায় সে কর্ম করে ও তার ফল ভোগ করে। যদি ফলটা তার মনোমত হয় সে সুখী হয় নতুবা সে দুঃখ পায়। সুখ ও দুঃখ তার আসক্তির জন্য হয়। যদি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা হয় তবে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভ—ব্যক্তিগত প্রযত্ন ছাড়া কর্ম কি স্বয়ংচলভাবে হতে পারে? পরে খাওয়ার জন্য কি আমাদের এখন রান্না করতে হবে না?

ম—আত্মা অহংকারের মাধ্যমে কাজ করে। সব কাজই প্রযত্নের দ্বারা হয়। একজন নিদ্রিত শিশুকে তার মা খাওয়ান। ছেলেটি ভাল করে না জেগে খেয়ে যায় তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ার কথা অস্বীকার করে। যা হোক, মা জানেন, কি হয়েছে। ঠিক তেমনি জ্ঞানী বিনা প্রযত্নে কাজ করেন। লোকে দেখে তিনি করছেন কিন্তু তিনি নিজে অনুভব করেন না। 'তাঁর ভয়ে বায়ু বহে' ইত্যাদি। সেটাই বিধি। তিনি বিধান করেন আর জগৎ সেইমত চলে, তবু তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। অতএব তাঁকে সর্বময় কর্তা বলা হয়। প্রত্যেক অহংকারী (উপাধিযুক্ত সত্তা) নিয়মের অধীন। এমনকি ব্রহ্মাও তার উর্ধ্বে যেতে পারেন না।

(এই ভক্তটি পরে তার প্রশ্ন করার কারণ বলেছিলেন।

তিনি শ্রীভগবানকে বলতে শুনেছেন যে জগৎ চলে আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যক্তির প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু তিনি দেখেন যে শ্রীভগবান আশ্রমিকদের ভোর চারটার সময়ে দিনের রান্নার আনাজ কোটার জন্য জাগিয়ে দেন। তিনি নিজের সংশয়ের জন্য প্রশ্ন করেছিলেন, আলোচনার জন্য নয়।)

১০ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৬৮। শ্রীভগবান যখন বাইরে যাচ্ছিলেন তখন একটি কুটীর থেকে বেদপাঠ শোনা গেল—

'অন্তরাদিত্য মনসা জ্বলন্তম্—ব্রহ্মণা বিন্দৎ'।

শ্রীভগবান সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে মন্তব্য করলেন—

তৈত্তিরীয় উপনিষদেও তাঁকে 'হিরণ্ময়' ইত্যাদি বলা হয়েছে। এসবের অর্থ কি? যদিও সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতির্মণ্ডলীকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয় তবু তারা নিজের জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র পরব্রহ্মের জ্যোতিতেই হয় (ন তত্র সূর্যো…বিভাতি)। যতক্ষণ তাদের ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলা হয় ততক্ষণ তাদের 'স্বপ্রকাশতা' ব্রহ্মেরই জ্যোতি। যে সব মন্ত্রে সূর্য ইত্যাদি শব্দ আছে সেগুলো কেবল ব্রহ্মেরই উল্লেখ।

৪৬৯। যোগী রামিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—একজন শিষ্য আত্মজ্ঞানের জন্য গুরুর কাছে গেল। গুরু তাকে বললেন যে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিষয়, অচল ইত্যাদি। তখন কি তিনি একজন ব্যক্তি হয়ে কথা বলেন না? এরূপ না বললে সাধকের অজ্ঞানই বা দূর হয় কি করে? গুরুর একজন ব্যক্তিরূপে বলা কথা কি সত্য হতে পারে?

ম—কাকে উদ্দেশ্য করে গুরু বলবেন? কাকে উপদেশ দেন? তিনি কি কাউকে আত্মা ছাড়া পৃথক দেখেন?

ভ—কিন্তু শিষ্য গুরুকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে।

ম—সত্য, কিন্তু গুরু কি তাকে পৃথক দেখেন? সবাইকে জ্ঞানী বলে না জানাই শিষ্যের অজ্ঞান। আত্মা ছাড়া কি কেউ আছে? গুরু কেবল এটা যে অজ্ঞান সেটা দেখিয়ে দেন আর সেজন্য তিনি একজন ব্যক্তিরূপে পৃথক হয়ে যান না।

উপলব্ধি কি? এটা কি শঙ্খ-চক্র-গদা ইত্যাদি ধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখা? যদি ঈশ্বর এইরূপে দেখাও দেন তা হলেই বা শিষ্যের অজ্ঞান কি করে দূর হয়? সত্য নিশ্চয় শাশ্বত জ্ঞান। অপরোক্ষ অনুভূতি নিত্যসিদ্ধ চেতনা। স্বয়ং ঈশ্বরকেই অপরোক্ষ অনুভূতি বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে তিনি আগে বলা রূপে ভক্তের সামনে আসেন। জ্ঞান যদি শাশ্বত না হয় তবে কোন কাজের হয় না। চতুর্ভুজ রূপের আবির্ভাব কি শাশ্বত জ্ঞান হতে পারে। এটা একটা ব্যাপার (ব্যবহারিক সত্য) ও কল্পনা (মায়া) মাত্র। একজন দ্রষ্টা নিশ্চয়ই আছে। দ্রষ্টাই কেবল সত্য ও শাশ্বত।

ঈশ্বর যদি 'কোটি সূর্য সমুজ্জ্বল' রূপে আবির্ভূত হন—সেটা কি প্রত্যক্ষ?

এটা দেখার জন্য চোখ ও মন ইত্যাদির দরকার। এটা পরোক্ষ জ্ঞান, অন্যপক্ষে দ্রষ্টাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দ্রষ্টাই প্রত্যক্ষ। অন্য সব দর্শন কেবল পরোক্ষ জ্ঞান। বর্তমানে শরীরকে 'আমি'রূপে অধ্যারোপ এতই দৃঢ়মূল যে চোখের সামনের দর্শনকেই প্রত্যক্ষ মনে হয় কিন্তু দ্রষ্টাকে তা মনে হয় না। কেউ আত্মজ্ঞান চায় না কারণ এমন কেউ নেই যে আত্মজ্ঞানী নয়। কেউ কি বলতে পারে যে সে পূর্বেই উপলব্ধি করেনি বা সে আত্মা থেকে পৃথক? না। স্পষ্টতঃ সবাই আত্মজ্ঞানী। তার দুঃখের কারণ অলৌকিক শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা। সে জানে যে এটা সে করতে পারে না। সেজন্য তারা চায় যে ঈশ্বর

সামনে আসুন আর তাঁর সকল শক্তি ভক্তকে দিয়ে তিনি নিজে দূরে থাকুন। সংক্ষেপে ঈশ্বর তাঁর শক্তি মানুষকে হস্তান্তরিত করুন।

ভ—শ্রীভগবানের মত মহাত্মাদের এরূপ স্পষ্ট কথা বলা সাজে। কারণ আপনারা সত্য চ্যুত হন না আর সবার পক্ষে এটা সহজ মনে করেন। তা সত্বেও সাধারণ লোকের একটা যথার্থ অসুবিধা আছে।

ম—তবে কি কেউ বলে যে সে আত্মা নয়?

ভ—আমি বলতে চাই যে মহর্ষির মত স্পষ্ট বলার সাহস কারও নেই।

ম—যা আছে তা বলার জন্য সাহসের কি আছে?

৪৭০। আজ রাত্রে একজন ইউরোপীয় কাউণ্টেস্ নিজের দেশে চলে যাচ্ছেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে আশীর্বাদ করার জন্য শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

ম—তুমি 'সত্তা' থেকে কোথাও যাও না, যা তুমি মনে করছ। সত্তা সর্বব্যাপী। শরীরটারই স্থানান্তর হয় তবু সে কখন একমাত্র বিদ্যমান সত্তার অতিরিক্ত নয়। সুতরাং কেউ কখন পরমসত্তার দৃষ্টির বাইরে নয়। যেহেতু তুমি একটা শরীরকে শ্রীভগবান ও অন্যটাকে নিজে বলে নির্ধারণ করেছ সেজন্য দু'টিকে পৃথক ভেবে এখান থেকে যাওয়ার কথা বলছ। যেখানেই থাকো 'আমাকে' ছাড়তে পারো না।

এটা ব্যাখ্যার জন্য—ছবিগুলো সিনেমার পর্দার ওপর চলে, কিন্তু পর্দা কি চলে? না। সত্তা ঠিক পর্দার মত—তুমি, আমি ও অন্যেরা ছবি। ব্যক্তি চলে যেতে পারে কিন্তু আত্মা যায় না।

৪৭১। ভ—অবতারদের জ্ঞানীদের অপেক্ষা মহান বলা হয়। তাঁরা জন্মাবধি মায়া মুক্ত, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ও নূতন ধর্ম প্রবর্তক ইত্যাদি বলা হয়।

ম—(১) "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।"

(২) "সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।"

একজন অবতার জ্ঞানীর থেকে কি করে পৃথক হয়; কিংবা অবতারের বিশ্ব থেকে পৃথক হওয়াই বা সম্ভব হয় কি করে?

ভ—চক্ষুকে সকল রূপের আয়তন বলা হয়, শ্রোত্রকে সকল শব্দের ইত্যাদি। এক চৈতন্য সকলের মধ্যে ক্রিয়াশীল; ইন্দ্রিয় ছাড়া অলৌকিক ক্রিয়া হয় না। অলৌকিক ক্রিয়া আদৌ হয়ই বা কি করে? যদি তারা মানুষের বুদ্ধির অগম্য বস্তু হয় তবে স্বপ্নের সৃষ্টিও তাই। অতএব অলৌকিকটা কোথায়?

জ্ঞানী ও অবতারের পার্থক্য করা অযৌক্তিক। 'ব্রহ্মের জ্ঞাতা ব্রহ্মই হন' এ কথার বিরোধ হয়।

ম—ঠিক তাই।

১৫ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৭২। তীর্থযাত্রী স্পেশালে ক'রে পাঞ্জাবীদের বড় একটি দল এখানে এসে পৌঁছালো। তারা সকাল ৮টা ৪৫মিনিটে আশ্রমে এল, আর বেশ কিছুক্ষণ হলঘরে বসল। প্রায় ৯টা ২০মিনিটে তাদের মধ্যে একজন বললে, "আপনার নাম পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আপনার দর্শনের জন্য অনেক দূর থেকে এসেছি। আমাদের উপদেশের জন্য কৃপা করে কিছু বলুন।" কোন মৌখিক উত্তর হল না। শ্রীভগবান সস্মিত মুখে ও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে, "কোনটা সব থেকে ভাল— যোগ, ভক্তি কিংবা জ্ঞানমার্গ?" তবুও শ্রীভগবান আগের মত

হাসলেন ও চেয়ে রইলেন। শ্রীভগবান কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। দর্শনার্থীরাও ছড়িয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও কয়েকজন হলঘরে বসে রইল। একজন পুরাতন ভক্ত দর্শনার্থীদের বললে যে শ্রীভগবান মৌনে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সেটা কথার অপেক্ষা আরও স্পষ্ট। শ্রীভগবান ফিরে এলে দর্শনার্থী আরও দু'চার কথা বললে। তার আলাপচারিতে সে জিজ্ঞাসা করলে—

ভ—যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে তারা ঠিক আছে। অন্যেরা বলে—ঈশ্বর কি আছেন?

ম—তুমি কি আছ?

ভ—ঠিক তাই। সেটাই প্রশ্ন। আমার চোখের সামনে একদল সেপাইকে চলে যেতে দেখছি অতএব আমি আছি। জগতটা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তাকে কি করে দেখবো?

ম—যে এইসব দেখে সেই নিজেকে দেখো আর তাতেই সমস্যার সমাধান হবে।

ভ—সেটা কি—চুপ করে বসে থাকা বা শাস্ত্রপাঠ কিংবা মনকে একাগ্র করা? ভক্তিতে মন একাগ্র হয়। লোকে ভক্তের পায়ে পড়ে। নতুবা সে হতাশ হয় আর তার ভক্তি কমে যায়।

ম—আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে না। এটাই ভক্তি।

ভ—আমি কি করে শীঘ্র এটা পাবো? মনে করুন আজ দু'ঘণ্টা ধ্যান করি। পরের দিন যদি এটা বাড়াতে যাই আমার ঘুম এসে যায় কারণ আমি কাজকর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

ম—তুমি ঘুমিয়ে ক্লান্ত হও না। সেই লোকই এখন এখানে রয়েছে। তুমি এখন ক্লান্ত হবে কেন? কারণ তোমার মন চঞ্চল আর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, সেজন্য সে ক্লান্ত হয় কিন্তু তুমি ক্লান্ত হও না।

ভ—আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার ব্যবসা চালানো ও মনের শান্তিলাভ কি করে হবে?

ম—এটাও একটা চিন্তা। এই চিন্তাটাও ছেড়ে দাও আর তোমার প্রকৃত সত্তায় থাকো।

ভ—বলা হয়—ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য করে যাও। এরূপ মানসিকতা কি করে লাভ করব?

ম—তোমায় কোন আকাঙ্ক্ষা বা নূতন অবস্থা লাভ করতে হবে না। তোমার উপস্থিত চিন্তাগুলো ত্যাগ কর, ব্যস্।

ভ—আমি এর জন্য প্রয়োজনীয় ভক্তি কি করে লাভ করবো?

ম—তোমার (অর্থাৎ আত্মার) স্ববিরোধী চিন্তাগুলো ত্যাগই ভক্তি।

ভ—ইচ্ছাশক্তি, সম্মোহন (মেস্‌মেরিজম্) ইত্যাদি কি? প্যারীতে ডাঃ কুয়ে নামে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভাল করতে পারতেন। তিনি বলতেন—নিজেকে নীরোগ করার জন্য শক্তি তৈরী কর। শক্তি তোমার অন্তরে আছে।

ম—এটা সেই একই ইচ্ছাশক্তি যার দ্বারা সকল রোগের আকর এই শরীরটা হয়েছে।

ভ—সুতরাং বলা হয় যে চিন্তাই বস্তু হয়ে প্রকাশিত হয়।

ম—এই চিন্তা মুক্তির জন্য হওয়া চাই।

ভ—ঈশ্বর আমাদের অন্য চিন্তা দূর করতে সক্ষম করবেন।

ম—এটাও একটা চিন্তা। যে জন্মেছে সেই প্রশ্ন করুক। তুমি তা নও কারণ তুমি চিন্তা হতে মুক্ত।

আর একজন রাওলপিণ্ডির দর্শনার্থী প্রশ্ন করলে—

আত্মা নিরাকার। আমি তার ওপর মন সংযোগ কি করে করবো?

ম—যাকে তুমি নিরাকার বা বোধের অতীত বলছ সে আত্মার কথা থাক। মনটা বোধগম্য। মনকে ধর তাহলেই হবে।

ভ—মনও অতি সূক্ষ্ম আর এই মন ও আত্মা এক। মনের স্বরূপ কি করে জানবো? আপনি বলেছেন যে কোন উপলক্ষ্য নিরর্থক। তবে আমাদের (সাধনার) আধার কি হবে?

ম—তোমার মন কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

ভ—কিসের ওপর?

ম—মনকেই জিজ্ঞাসা কর।

ভ—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। তবে কি মনের ওপর একাগ্রতা অভ্যাস করবো?

ম—হুম্!

ভ—কিন্তু মনের স্বরূপ কি? এও নিরাকার। সমস্যা বড় জটিল।

ম—মোহগ্রস্ত হচ্ছ কেন?

ভ—শাস্ত্র আমাদের একাগ্রতা করতে বলে, আমি তা করতে পারছি না।

ম—কোন্ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের অস্তিত্ব জানি?

ভ—এটা অনুভূতির বিষয়। কিন্তু আমি মন একাগ্র করতে চাই।

ম—চিন্তাশূন্য হয়ে থাকো। কিছুই ধরতে হবে না। তারা তোমায় ধরে না। তুমি তোমাতেই থাকো।

ভ—আমি কি ধরব বা ধ্যান করব বুঝতে পারছি না। আমার মনের ধ্যান করব কি?

ম—কার মন?

ভ—আমার নিজের মন।

ম—তুমি কে? প্রশ্নটা এখানেই মিলিয়ে যাবে।

(সবাই খেতে চলে গেল। দর্শনার্থী আড়াইটার সময়ে ফিরে এসে সেই একই প্রশ্ন করলে।)

সে বললে—মহর্ষি চিন্তা ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। সব

চিন্তা ত্যাগ হয়ে গেলে মনকে কিসের ওপর একাগ্র করবো? আমি যে কি ধরব আর কিসের ওপর মন সংযোগ করব বুঝতে পারছি না।

ম—মনঃসংযোগটা কার?

ভ—মনের।

ম—তবে মনঃসংযোগ কর।

ভ—কিসের ওপর?

ম—নিজেই উত্তর দাও। মন কি? কেন সংযোগ করবে?

ভ—আমি মন কি জানি না। মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করছি।

ম—মহর্ষি মনের তত্ত্ব জানতে চান না। জিজ্ঞাসুই মনকে সেটা কি জিজ্ঞাসা করুক।

ভ—মহর্ষি মনকে চিন্তাশূন্য করতে পরামর্শ দেন।

ম—এটাও একটা চিন্তা।

ভ—যখন সব চিন্তা চলে যায় তখন কি অবশিষ্ট থাকে?

ম—মন কি চিন্তা ছাড়া আর কিছু?

ভ—না। মন চিন্তার সমষ্টি। আমার বলার উদ্দেশ্য—যখন সব চিন্তা চলেই গেল তখন আর মনঃসংযোগ কি করে করবো?

ম—এটাও কি একটা চিন্তা নয়?

ভ—হাঁ, কিন্তু আমাকে একাগ্র করতে বলা হয়।

ম—তুমি মন একাগ্র করবে কেন? তোমার চিন্তাকে যথেচ্ছ চলতে দেবে না কেন?

ভ—শাস্ত্র বলে চিন্তাকে যথেচ্ছ চলতে দিলে বিপথে অর্থাৎ অসৎ ও পরিবর্তনশীল বিষয়ে নিয়ে যায়।

ম—সুতরাং তুমি অসৎ ও পরিবর্তনশীল বিষয়ে যেতে চাও না। তোমার চিন্তা অসৎ ও পরিবর্তনশীল। তুমি সত্যকে ধরে থাকতে চাও। ঠিক সেই কথাই আমি বলছি। চিন্তা অসৎ, সেগুলো ত্যাগ কর।

ভ—এখন বুঝেছি। তবু একটা সংশয় আছে। "এক

মুহূর্ত তুমি নিষ্ক্রিয় থাকতে পার না।” আমি কি করে চিন্তা ত্যাগ করবো ?

ম—সেই গীতাই বলে, “যদিও সব কাজ হয়, আমি কর্তা নই।” এটা ঠিক জগতের ক্রিয়া-কলাপ ও সূর্যের মত। আত্মা সর্বদা নিষ্ক্রিয়, অপরপক্ষে চিন্তা ওঠে আর লয় হয়। আত্মা পূর্ণ ; অপরিবর্তনশীল ; মন সীমিত ও পরিবর্তনশীল! তোমায় কেবল সীমাবদ্ধতা (উপাধি) ত্যাগ করতে হবে। তোমার পূর্ণতা এরূপে স্বতঃই প্রকাশ হবে।

ভ—এর জন্য কৃপা চাই।

ম—কৃপা সর্বদাই আছে। কেবল যা প্রয়োজন তা হল তার কাছে তোমার আত্ম-সমর্পণ।

ভ—আমি সমর্পণ করছি আর প্রার্থনা করি যে আমি যদি বিপথে যাই সে যেন জোর ক’রে আমায় টেনে নেয়।

ম—এটা কি সমর্পণ ? সমর্পণ সম্পূর্ণ হতে হলে নিঃশর্ত হওয়া চাই।

ভ—হাঁ, আমি সমর্পণ করছি। আপনি বলছেন যে আত্মা-সমুদ্রে ডুবুরীর মত আমায় ডুবতে হবে।

ম—কারণ তুমি ভাবছ যে এখন তুমি চৈতন্য-সমুদ্রের বাইরে আছ।

ভ—আমি প্রাণায়াম অভ্যাস করি। এতে শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়। আমি কি করবো ?

ম—মন স্থির হলে উষ্ণতা বোধ চলে যাবে।

ভ—এটা সত্য, কিন্তু ভারী শক্ত।

ম—এটাও আবার একটা চিন্তা, সেটাও একটা বাধা।

৪৭৩। একজন কেউ মন্তব্য করলে—বলা হয় যে যারা অরুণাচলের তিরিশ মাইলের মধ্যে জন্মায় বা মারা যায় তারা না

চাইলেও মুক্তি পায়। আরও বলা হয় যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। পুরাণ আরও বলে যে বেদান্ত-বিজ্ঞান লাভ করা কঠিন সুতরাং মুক্তিলাভও কঠিন। কিন্তু পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে জন্ম ও মৃত্যু হলে এত সহজে মুক্তি লাভ হয়। তা কি করে হয়?

ম—শিব বলেন, 'আমার আজ্ঞায়।' যারা এখানে বাস করে তাদের দীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই তথাপি তারা মুক্তি লাভ করে। শিবের এরূপ আদেশ।

ভ—পুরাণ আরও বলে যে যারা এখানে জন্মায় তারা ভূত, প্রেত, প্রমথ ইত্যাদি শিবের গণ।

ম—অন্য ক্ষেত্র অর্থাৎ চিদাম্বরম্, তিরুভারুর সম্বন্ধেও এরূপ বলা হয়।

ভ—কেবল জন্ম বা মৃত্যু হলে কি করে মুক্তি হয়? এটা বোঝা শক্ত।

ম— দর্শনাদ্ অভ্রসদসি জননাৎ কমলালয়ে।
কাশ্যাং তু মরণন্মুক্তিঃ স্মরণাদ্ অরুণাচলে॥

চিদাম্বরমের দর্শন, তিরুভারুরে জন্ম, কাশীতে মৃত্যু এবং কেবলমাত্র অরুণাচলের স্মরণই মুক্তিদায়িনী।

'জননাৎ কমলালয়ে'র অর্থ কমলালয়ে জন্ম। এটা কি? এটা হৃদয়!

এইরূপ অভ্রসদসি—চৈতন্যের অধিষ্ঠান। আবার কাশী জ্ঞানের জ্যোতি। অরুণাচল স্মরণেতে শ্লোকটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এটিকেও একই অর্থে বুঝতে হবে!

ভ—সুতরাং ভক্তির প্রয়োজন।

ম—সবই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। একজন দেখে যে যারা তিরুভারুরে জন্মেছে, যারা চিদাম্বরম দর্শন করেছে, যারা কাশীতে মারা যায় আর যারা অরুণাচলের স্মরণ করে তারা সবাই মুক্ত।

ভ—আমি অরুণাচলকে স্মরণ করি তবুও মুক্ত হইনি।

ম—কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। এরূপ পরিবর্তনে অর্জুনের কি হল দেখো। সে বিশ্বরূপ দর্শন করলে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "দেবতা ও ঋষিরা আমার বিশ্বরূপ দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমি তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিনি। তথাপি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি যার দ্বারা তুমি বিশ্বরূপ দেখতে পাবে।" বেশ, এই বলে তিনি কি তাকে তাঁর স্বরূপ দেখালেন? না। তিনি অর্জুনকে বললেন যে সে যা দেখতে চায় তাই দেখুক। সেটা যদি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হত তবে সেটা নিত্য হত আর তাঁর যথার্থ স্বরূপও হত। তা না হয়ে অর্জুনকে সে যা দেখতে চায় তা দেখানো হল। অতএব বিশ্বরূপ কোথায়? সেটা অর্জুনের অন্তরে।

আরও দেখো, অর্জুন দেখলে যে দেবতা ও ঋষিরা সেই রূপের মধ্যে রয়েছেন আর তাঁকে স্তুতি করছেন। যদি কৃষ্ণের কথা মত দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে না দেখতে পায় তবে অর্জুন যাদের দেখলে, তাঁরা কারা?

ভ—তাঁরা নিশ্চয় তার কল্পনা।

ম—অর্জুনের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তাঁরা সেখানে রয়েছেন।

ভ—অতএব ঈশ্বরের কৃপায় দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে।

ম—হাঁ, ভক্তদের তা হয়।

ভ—একজন একটা বাঘের স্বপ্ন দেখলে, ভয় পেলে আর জেগে উঠল। স্বাপ্নিক বাঘ স্বাপ্নিক অহংকারের কাছে প্রকাশ হল আর সে ভয় পেল। যখন সে জেগে উঠল তখন তার সেই অহংকারই বা কি করে অদৃশ্য হয় আর সে তার জাগ্রত অহংকার নিয়েই বা কি ক'রে জেগে ওঠে?

ম—এতেই প্রমাণ হয় যে অহংকার একটা। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সেই এক অহংকারের ওপর সঞ্চরমান অবস্থা।

ভ—মনকে ধরা খুব কঠিন। সবারই এক অসুবিধা।

ম—তুমি মন দিয়ে কখন মনকে ধরতে পারো না। সেটার অস্তিত্বহীনতা জানতে হলে তার অতীত হও।

ভ—তবে সোজাসুজি অহংকারটা খোঁজা উচিত। তাই তো?

ম—ঠিক তাই।

এক অন্তঃকরণেরই মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি বিভিন্ন নাম। মন কেবল চিন্তার সমষ্টি। চিন্তাও অহংকার ছাড়া থাকে না। অতএব সব চিন্তা অহংকারের (অহমের) দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই 'আমি'টা কোথা থেকে ওঠে খোঁজো আর অন্য চিন্তা অদৃশ্য হবে।

ভ—যা অবশিষ্ট থাকবে সেটা 'আমি' নয়, কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য।

ম—ঠিক তাই। তুমি আনন্দের অন্বেষণ দিয়ে আরম্ভ কর। বিশ্লেষণ করে দেখো যে চিন্তাই দুঃখের কারণ। এদেরই মন বলে। মনকে দমন করতে গিয়ে 'আমি'কে খোঁজো আর তাতেই সৎ-চিৎ-আনন্দে স্থিত হও।

আর একজন ভক্ত বললে—তবে মন কি?

ম—মন সসীম চেতনা যে উপাধির আবরণ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তুমি অসীম ও পূর্ণ। পরে তুমি উপাধি নিয়ে মন হয়েছ।

ভ—তবে এটা আবরণ। কি করে এর উৎপত্তি হল?

ম—আবরণটা কার? এটা অবিদ্যা, অহংকার বা মন থেকে পৃথক নয়।

ভ—আবরণের অর্থ আচ্ছাদন। কে আচ্ছাদিত? এটা কোথা থেকে ওঠে?

ম—উপাধিটাই আবরণ। উপাধির অতীত হলে কোন প্রশ্নই উঠবে না।

১৬ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৭৪। হৃদয় সম্বন্ধে উল্লেখ হল। শ্রীভগবান বললেন—যোগশাস্ত্র ৭২,০০০ নাড়ী, ১০১ নাড়ী ইত্যাদি বলে। অন্যেরা এদের সমন্বয় করে যে ১০১টি প্রধান নাড়ী, তারাই ৭২,০০০ নাড়ীতে বিভাজিত হয়। এই নাড়ীগুলোকে কেউ মস্তিষ্ক, কেউ হৃদয় আবার কেউ মূলাধার থেকে উঠেছে বলে। তারা পরানাড়ীর কথা বলে যেটা মূলাধার থেকে উঠে সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে হৃদয়ে নামে। আবার অন্যেরা বলে সুষুম্না পরাতে শেষ হয়।

কেউ সহস্রারে জ্ঞানলাভ করতে পরামর্শ দেয়; কেউ ভ্রূমধ্যে; কেউ হৃদয়ে; অন্যেরা মূলাধারে। যদি পরাতে প্রবেশই জ্ঞান হয় তবে একজন হৃদয় থেকেও যেতে পারে। কিন্তু যোগীরা নাড়ী শোধনে ব্যাপৃত হয়; তারপর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় যেটা মূলাধার থেকে সহস্রারে যায় বলা হয়। পরে যোগীকে মস্তিষ্ক থেকে শেষ পর্যায়ে হৃদয়ে আসতে বলা হয়।

বেদ বলে, "হৃদয় একটি নিম্নমুখী পদ্মকোরক বা কদলী পুষ্পের মত।"

"একটি অণুর মত উজ্জ্বল বিন্দু, একটি নীবার ধানের অগ্রভাগের মত।"

"সেই বিন্দুটি অগ্নিশিখার মত, আর তার মধ্যে পরব্রহ্ম রয়েছেন।" সেই হৃদয় কোনটা? এটা কি প্রাণীবিজ্ঞানবিদ্‌দের হৃদযন্ত্র? তা যদি হয়, তারাই ভাল জানে।

উপনিষদে হৃদয়ের ব্যুৎপত্তি হৃৎ + অয়ম্, অর্থাৎ এই (হয়) কেন্দ্র। তার অর্থ যেখানে মনের উদয় ও লয় হয়। সেটাই জ্ঞানের আধার। যখন আমি বলি যে এটাই আত্মা লোকে ভাবে যে এটা শরীরের অভ্যন্তরে। যখন জিজ্ঞাসা করি যে সুষুপ্তির সময়ে আত্মা কোথায় থাকে তারা মনে করে যে আত্মা শরীর ও পরিবেশ বোধশূন্য

হয়ে অন্ধকার ঘরে বন্ধ থাকা মানুষের মত শরীরেই থাকে। এরূপ লোকেদের আত্মোপলব্ধির স্থান শরীরের কোথাও বলতে হয়। সেই কেন্দ্রের নাম হৃদয় ; কিন্তু একে হৃদ্‌যন্ত্র বলে ভুল করা হয়।

যখন মানুষ স্বপ্ন দেখে তখন সে নিজেকে (অহংকার, দ্রষ্টাকে) আর পরিবেশকে সৃষ্টি করে। পরে সবই নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। একজনই দ্রষ্টা-সহিত বহু হয়। অনুরূপভাবেই একজন জাগ্রত অবস্থায় বহু হয়। বস্তুলীন (অবজেক্‌টিভ) জগৎ প্রকৃতপক্ষে আত্মলীন (সাবজেক্‌টিভ)। একজন জ্যোতির্বিদ একটা নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করলে যার আলো পৃথিবীতে আসতে বহু আলোক-বৎসর লাগে। বাস্তবিক নক্ষত্রটা কোথায়? সেটা কি দ্রষ্টাতেই নয়? কিন্তু লোকে আশ্চর্য হয়ে ভাবে এরূপ সূর্যের থেকে বড় জ্যোতিষ্ক এতদূরে থাকা সত্ত্বেও মানুষের মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে থাকতে পারে কিনা। দূরত্ব, বিরাটত্ব আর তাদের অসামঞ্জস্য সবই মনে। সেখানে তারা কি করে থাকে? যেহেতু তুমি সেগুলো জানো অতএব এদের প্রকাশ করে এমন একটা বোধ তোমাকে স্বীকার করতে হবে। এসব চিন্তা সুষুপ্তিতে থাকে না, জাগ্রত হলে ওঠে। সুতরাং বোধটাও ক্ষণস্থায়ী যার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি আছে। 'আমি' চেতনা নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন। সেটা কখন আগে বলা বোধ হতে পারে না। এটা পৃথক হলেও এর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অতএব এটা প্রতিফলিত আলোক (আভাস)। মস্তিষ্কের বোধ এরূপে একটা প্রতিফলিত বোধ (আভাস সংবিৎ) কিংবা প্রতিফলিত সত্তা (আভাস সৎ)। প্রকৃত জ্ঞান (সংবিৎ) বা সত্তা (সৎ) হৃদয় নামক কেন্দ্রে থাকে। যখন লোকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে সেটা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় আর মাথা শিথিল না হয়ে সোজা হয়ে ওঠে। সেখান থেকে চেতনা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আর সেই আরোপিত 'আমি'ই জাগ্রত সত্তারূপে কাজ করে।

মস্তিষ্কের শুদ্ধ বোধই শুদ্ধ মন, সেটাই পরে মিশ্রিত হয়ে যা সাধারণতঃ দেখা যায় সেই মলিন মন হয়।

যা হোক এসবই আত্মার অন্তর্গত। শরীর আর তার আনুষঙ্গিক সবই আত্মায় থাকে। সাধারণতঃ যা মনে করা হয় আত্মা সেরূপ শরীরে সীমিত নয়।

১৬ই মার্চ, ১৯৩৮

৪৭৫। শ্রীমহর্ষি খবরের কাগজ থেকে একটি খবর পড়লেন— একজন বনরক্ষী সেপাই বন্দুক নিয়ে বনের মধ্যে যাচ্ছিল, সে একটা ঝোপের মধ্যে দু'টি উজ্জ্বল বস্তু দেখলো। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখে যে সে একটা প্রকাণ্ড বাঘের কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সে বন্দুক ফেলে বনের রাজার কাছে নতজানু হয়ে বসল। বাঘটা দাঁড়িয়ে উঠে তার কোন ক্ষতি না করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

২১শে মার্চ, ১৯৩৮

৪৭৬। একজন খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারক ডঃ স্টান্‌লি জোনস্ মহর্ষিকে দর্শন করতে এসেছে। সে বই লেখে আর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। তার উত্তর ভারতে দু'টি আশ্রম আছে। আর একজন ভদ্রলোক ও দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সে এসেছে। সম্প্রতি সে 'অন দি ইণ্ডিয়ান রোড' নামে একটা বই লিখছে সুতরাং বই-এর বস্তু সংগ্রহের জন্য ভারতীয় মহাত্মাদের দর্শন অভিলাষী। ভারতীয় মহাত্মারা কোন পথে অগ্রসর হয়েছেন ও অধ্যাত্ম বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন জানতে চায়। সেজন্য সে প্রশ্ন করলে—(এটা তার সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

ভ—আপনার সাধনা কি? লক্ষ্য কি? আপনি কতদূরে অগ্রসর হয়েছেন?

ম—লক্ষ্য সবার এক। কিন্তু তুমি একটা লক্ষ্যই বা খুঁজবে কেন, বল তো? তুমি বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নও, কেন?

ভ—তবে কি কোন লক্ষ্য নেই?

ম—তা নয়। কি তোমায় লক্ষ্য খুঁজতে প্ররোচিত করে? এই প্রতি-প্রশ্নের উত্তর তোমায় দিতে হবে।

ভ—আমার এ বিষয়ে একটা নিজস্ব মতামত আছে। মহর্ষি কি বলেন আমি জানতে চাই।

ম—মহর্ষির কোন সংশয় নেই যা ভঞ্জন করতে হবে।

ভ—বেশ, আমি মনে করি যে নিম্নস্তরের মনের উচ্চস্তরের মনকে জানাই লক্ষ্য, যার দ্বারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। নিম্নস্তরের মন অসম্পূর্ণ আর উচ্চস্তরের মনকে জানলেই সে পূর্ণতা লাভ করবে।

ম—অতএব তুমি, একটা নিম্নমন যেটা অপূর্ণ আর যেটা উচ্চমনকে খুঁজে পূর্ণতা লাভ করতে চায় স্বীকার কর। সেই নিম্নমন কি উচ্চমনটা থেকে পৃথক? সেটা কি অন্যনিরপেক্ষ?

ভ—যীশুখ্রীস্ট পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য এনেছিলেন। আমি তাঁকে স্বর্গরাজ্যের প্রতিমূর্তি মনে করি। আমি চাই সবাই তা লাভ করুক। তিনি বলেছিলেন, "সবার ক্ষুধায় আমি ক্ষুধার্ত" ইত্যাদি। পরস্পরের সুখদুঃখে অংশগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্য। যদি সেই 'স্বর্গরাজ্য' বিশ্বজনীন করা যায়, সবাই সবার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করবে।

ম—তুমি নিম্ন ও উচ্চমন এবং সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বলছ। সুষুপ্তিতে এসব পার্থক্যের কি হয়?

ভ—কিন্তু আমি পূর্ণ জাগ্রত থাকতে চাই।

ম—এটাই কি তোমার পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা? তা নয়। এটা তোমার দীর্ঘ ঘুমের একটা স্বপ্ন মাত্র। সবাই নিদ্রিত আর জগৎ ও বস্তু এবং কর্মের স্বপ্ন দেখছে।

ভ—এসব বেদান্ত, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। উপস্থিত পার্থক্যটা কল্পনা নয়। তারা বাস্তব। যা হোক সেই প্রকৃত জাগৃতিটা কি? মহর্ষি সেটা কিভাবে বুঝেছেন তা কি আমাদের বলতে পারেন?

ম—প্রকৃত জাগরণ এই জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতীত।

ভ—আমি প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত আছি আর জানি যে ঘুমিয়ে নেই।

ম—প্রকৃত জাগরণ ভেদাবস্থার অতীত।

ভ—জগতের অবস্থা তবে কি?

ম—জগৎ কি তোমায় বলে, "আমি আছি"?

ভ—না, কিন্তু জগতের লোক আমায় বলে যে তাদের আধ্যাত্মিক. সামাজিক ও নৈতিক পুনরভ্যুত্থানের প্রয়োজন আছে।

ম—তুমি জগৎ দেখো আর তাতে লোক দেখো। এগুলো তোমার চিন্তা। জগৎ কি তোমার থেকে পৃথক থাকতে পারে?

ভ—আমি প্রেমের মাধ্যমে এর (জগতের) সঙ্গে মিলিত হই।

ম—এরূপ মিলিত হওয়ার আগে কি তুমি পৃথক ছিলে?

ভ—যদিও আমি তাদের সঙ্গে এক তথাপি পৃথক থাকি। এখানে আমি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করতে ও তাঁর উত্তর শুনতে এসেছি। তিনি আমায় প্রশ্ন করছেন কেন?

ম—মহর্ষি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তরের মর্ম—প্রকৃত জাগরণে কোন ভেদ নেই।

ভ—এরূপ জ্ঞান কি সার্বিক করা যায়?

ম—সেখানে পার্থক্য কোথায়? সেখানে কোন ব্যক্তিসত্তা নেই।

ভ—আপনি লক্ষ্যে পৌঁছেছেন?

ম—আত্মা থেকে লক্ষ্য কিছু পৃথক হতে পারে না—কিংবা এটা নূতন করে কিছু পাওয়ার নয়। যদি তা হত তবে সেটা নিত্য ও স্থায়ী হত না। যা নবাগত তা চলে যেতে বাধ্য। লক্ষ্যটা শাশ্বত আর অন্তরে হওয়া উচিত। নিজের মধ্যে সেটা খোঁজো।

ভ—আমি আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই।

ম—মহর্ষির জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নেই। এ প্রশ্নে প্রশ্নকর্তার কোন প্রয়োজন সাধিত হবে না। আমি জ্ঞানলাভ করেছি কিনা তাতে জিজ্ঞাসুর কি এসে যায়।

ভ—ঠিক তা নয়। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার একটা মানবিক মূল্য আছে আর সবাই তার অংশ পেতে পারে।

ম—সমস্যাটা প্রশ্নকারীকেই সমাধান করতে হবে। প্রশ্নটা নিজেকে করাই ভাল।

ভ—আমি প্রশ্নের উত্তর জানি।

ম—আমরাও শুনি।

ভ—কুড়ি বছর পূর্বে আমাকে 'স্বর্গরাজ্য' দেখানো হয়েছিল। এটা কেবল ঈশ্বরের কৃপাতেই হয়েছিল। আমি এর জন্য কোন চেষ্টা করিনি। আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। আমি একে সার্বিক, নৈতিক ও সামাজিক করতে চাই। সেই সঙ্গে আমি মহর্ষির আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় জানতে চাই।

শ্রীমতী জিনরাজাদাস বাধা দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—আমরা সবাই জানি যে মহর্ষি পৃথিবীতে 'স্বর্গরাজ্য' এনেছেন। আপনি তাঁকে তাঁর উপলব্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উত্তর লাভের চেষ্টা করছেন কেন? আপনাকেই সাধনা ক'রে লক্ষ্য লাভ করতে হবে।

প্রশ্নকারী তাঁর কথা শুনলেন, সামান্য তর্ক করলেন আবার মহর্ষিকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। দু'একটা হাল্কা প্রশ্নের পর মেজর চাডউইক দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাইবেল বলে স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।"

ভ—কি করে লাভ করবো?

মেজর চাডউইক—মহর্ষিকে তোমার হয়ে লাভ করে দিতে বলছ কেন?

ভ—আমি তা বলছি না।

মেজর চাডউইক—"স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।" তোমারই লাভ করা উচিত।

ভ—এটা কেবল যারা শোনে তাদেরই 'অন্তরে'।

মেজর চাডউইক—বাইবেল বলে 'অন্তরে' আর তার সঙ্গে কোন বিশেষণ যোগ করে না।

প্রশ্নকারী এমনিতেই বহুক্ষণ প্রশ্ন করা হয়েছে অনুভব করলে সুতরাং মহর্ষিকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলে।

৪৭৭। শ্রীমতী জিনরাজাদাস—স্বপ্নে অনুভূত সত্য কি করে আমরা মনে রাখতে পারি?

ম—তোমার বর্তমান জাগ্রত অবস্থা, তোমার স্বপ্ন ও তাদের মনে রাখার ইচ্ছা সবই কতকগুলো চিন্তা। মন জাগলেই তারা ওঠে। মনের অবর্তমানে তুমি কি ছিলে না?

ভ—হাঁ, ছিলাম।

ম—তোমার অস্তিত্বের বোধই তোমার জ্ঞান।

ভ—আমি বুদ্ধিগতভাবে বুঝি। সত্য কখন ঝলকের মত অনুভূত হয়। স্থায়ী হয় না।

ম—তোমার শাশ্বত জ্ঞানের অবস্থা এরূপ চিন্তার দ্বারা চাপা পড়ে যায়।

ভ—সহরের কোলাহল-মুখর জীবন আত্মজ্ঞানের অনুকূল নয়। বনের আশ্রমে প্রয়োজনীয় নির্জনতা ও শান্তি পাওয়া যায়।

ম—একজন সহরেও মুক্ত হতে পারে আবার জঙ্গলেও বদ্ধ হতে পারে। সবই মনে।

ভ—মনও আবার মায়া, বোধহয়।

ম—মায়া কি ? সত্য থেকে মনের পার্থক্যের জ্ঞানই মায়া। মন সত্যের অন্তর্গত, তার থেকে পৃথক নয়। এই জ্ঞানেই মায়ার নিবৃত্তি হয়।

কথা প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন হল মন মস্তিষ্ক কিনা। শ্রীভগবান বললেন—মন মস্তিষ্কের ওপর কাজ করে এরূপ একটা শক্তি। এখন তুমি এখানে আর জাগ্রত অবস্থায় রয়েছ। জগৎ ও পরিবেশের চিন্তা শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কে রয়েছে। যখন তুমি স্বপ্ন দেখো তখন আর একটা সত্তা সৃষ্টি কর, এখন যেমন করছ তেমনি সে আবার স্বাপ্নিক সৃষ্টি ও পরিবেশ দেখে। স্বপ্ন দৃশ্যগুলো স্বাপ্ন শরীরের স্বাপ্ন মস্তিষ্কে থাকে। সেটা তোমার বর্তমান শরীর থেকে পৃথক। তুমি এখন স্বপ্ন স্মরণ করছ। তথাপি মস্তিষ্কগুলো পৃথক। তবু সে দৃশ্য মনেই উদয় হয়। অতএব মন ও মস্তিষ্ক এক নয়। জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কেবল মনের।

ভ—জানাটা বুদ্ধিগত।

ম—বুদ্ধি। কার বুদ্ধি ? সমস্যা সেই প্রশ্নেরই আশ্রিত।

তুমি স্বীকার করছ যে বুদ্ধির অবর্তমানেও তুমি থাকো, যেমন সুষুপ্তিতে। যদি তোমার অস্তিত্বের বোধ না থাকে তবে তোমার যে অস্তিত্ব আছে সেটা কি করে জানো ? তোমার অস্তিত্বই জ্ঞান। তুমি একটা মুহূর্তও কল্পনা করতে পারো না যখন তুমি থাকো না। সুতরাং এমন একটা সময় নেই যখন জ্ঞান নেই।

২২শে মার্চ, ১৯৩৮

৪৭৮। মাদুরার জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—

ঈশ্বরের শক্তি কি করে জানা যায় ?

ম—তুমি বল 'আমি আছি'। সেটাই তাই। তিনি ছাড়া আর কে 'আমি আছি' বলতে পারে ?

একজনের সত্তাই তাঁর শক্তি। সমস্যা তখনই হয় যখন লোকে বলে 'আমি এই, আমি ওই, আমি এরূপ, আমি সেরূপ'। এটা করো না—নিজেতে থাকো। ব্যস্।

ভ—আনন্দ কিরূপে অনুভূত হয়?

ম—'আমি এখন আনন্দে নেই' এই চিন্তা না থাকলেই হয়।

ভ—তার অর্থ মন বৃত্তিশূন্য হলে।

ম—অন্য সব বৃত্তি ছেড়ে একটা বৃত্তিতে থাকা।

ভ—কিন্তু আনন্দের অনুভূতি হওয়া চাই।

ম—তোমার সত্তাকে বিস্মৃত না হওয়াই আনন্দ। তুমি প্রকৃত যা তা ছাড়া তুমি কি আর অন্য কিছু হতে পারো? এটা প্রেমেরও আধার হওয়া। প্রেমই আনন্দ। এখানে আধার প্রেম থেকে পৃথক নয়।

ভ—আমি কি করে সর্বব্যাপী হব?

ম—'আমি এখন সর্বব্যাপী নই' এই চিন্তাটা ছেড়ে দাও।

ভ—পৃথক বস্তুতে কি করে পরিব্যাপ্ত হব?

ম—তারা কি 'আমি'র নিরপেক্ষ থাকে? তারা কি তোমায় বলে "আমরা আছি?" তুমি তাদের দেখো। তুমি আছ আর অন্য বস্তুদেরও দেখা যায়। "আমাকে ছাড়া এরা থাকে না" এটা জানাই পরিব্যাপ্ত হওয়া। 'আমি শরীর; আমাতে একটা কিছু আছে' এই ধারণার জন্যই অন্যান্য বস্তু যেন বাইরে রয়েছে দেখা যায়। তারা সবই তোমার অন্তর্গত, জানো। এক টুকরা কাপড় কি সূতা ছাড়া? বস্তুরা কি আত্মা ছাড়া থাকতে পারে?

৪৭৯। ভ—সকল ধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? শ্রীভগবানের প্রণালী কি?

ম—সব ধর্ম ও প্রণালী একই।

ভ—মুক্তির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

ম—মুক্ত হওয়ার দরকার কি? এখন যা আছ তাই থাকো না কেন?

ভ—আমি দুঃখ থেকে উদ্ধার পেতে চাই। এর থেকে উদ্ধার পাওয়াকেই মুক্তি বলে।

ম—এটাই সব ধর্ম শিক্ষা দেয়।

ভ—কিন্তু প্রণালীটা কি?

ম—তোমার পথে ফিরে যাওয়া।

ভ—কোথা থেকে এলাম?

ম—সেটাই যা কেবল তোমাকে জানতে হবে। এ প্রশ্নগুলো কি তোমার সুষুপ্তিতে উঠেছিল? তখন কি তুমি ছিলে না? এখনও কি তুমি তাই নও?

ভ—হাঁ, আমি সুষুপ্তিতে ছিলাম আর মনও ছিল; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো মিশে যাওয়ায় আমি কথা বলতে পারি নি।

ম—তুমি কি জীব? তুমি কি মন? মন কি সুষুপ্তির মধ্যে সে রয়েছে বলেছিল?

ভ—না। কিন্তু মহাজনেরা বলেন যে জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক।

ম—ঈশ্বরের কথা থাক। নিজের কথা বল।

ভ—আমার সম্বন্ধে কি? আমি কে?

ম—সেটাই তো বিবেচ্য বিষয়। একে জানো তা হলে সব জানা হয়ে যাবে; যদি না হয় তখন জিজ্ঞাসা করো।

ভ—জেগে উঠে জগৎ দেখি আর সুষুপ্তিতে কোন পরিবর্তন হয়নি দেখি।

ম—কিন্তু এটা সুষুপ্তিতে জানা যায় না। তখন বা এখন এক তুমিই আছ। কার এখন পরিবর্তন হয়েছে? তোমার স্বরূপ কি পরিবর্তনশীল কিংবা যথাবৎ থাকে?

ভ—এর প্রমাণ কি ?

ম—একজনের সত্তার কি প্রমাণের প্রয়োজন হয় ? কেবল নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকো, সব কিছুই জানা হয়ে যাবে।

ভ—তবে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদীরা বাদানুবাদ করে কেন ?

ম—যদি সবাই আপন আপন কাজ করে তবে কোন বিবাদ হয় না।

৪৮০। একজন ইউরোপীয় মহিলা শ্রীমতী গাস্‌কিউ এক টুকরা কাগজ দিলেন, তাতে লেখা ছিল—

আমাদের মধ্যে আপনার বিদ্যমানতার জন্য আমরা প্রকৃতি ও সেই অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ। আপনার জ্ঞান বিশুদ্ধ সত্য, প্রাণের মৌলিক সত্তা ও শাশ্বত তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি পুনর্বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—

"শান্ত হও আর 'তাকে' জানো।"

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?

উত্তর—এই প্রশ্নের উত্তর ঐ কাগজেই লেখা আছে। "শান্ত হও আর 'আমি আছি'কে ঈশ্বর বলে জানো।"

'শান্ত হওয়ার' অর্থ 'চিন্তাশূন্য থাকা'।

ভ—এটা ঠিক উত্তর হল না। এই গ্রহের একটা ভবিষ্যৎ আছে—সেটা কি।

ম—স্থান ও কাল চিন্তার ক্রিয়া। যদি চিন্তা না ওঠে তবে ভবিষ্যৎ বা পৃথিবী নেই।

ভ—আমরা তাদের সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও স্থান ও কাল থাকবে।

ম—তারা কি এসে তোমায় বলে যে তারা আছে ? তুমি কি সুষুপ্তিতে এদের অনুভব কর ?

ভ—আমি সুষুপ্তিতে সচেতন থাকি না।

ম—আর তা সত্ত্বেও সুষুপ্তিতে তুমি থাকো।

ভ—আমি এই শরীরে ছিলাম না। আমি অন্য কোথাও গিয়েছিলাম আর ঠিক জাগ্রত হওয়ার পূর্বে এখানে প্রবেশ করেছি।

ম—তোমার সুষুপ্তিতে কোথাও যাওয়া ও এখন ভিতরে ঢুকে পড়া কেবল কতগুলো ধারণা। সুষুপ্তিতে কোথায় ছিলে? তুমি যা তাই ছিলে; কিন্তু সুষুপ্তিতে তুমি চিন্তাশূন্য ছিলে এই যা পার্থক্য।

ভ—জগতে যুদ্ধ চলছে। আমরা না ভাবলে কি যুদ্ধ থেমে যাবে?

ম—তুমি কি যুদ্ধ থামাতে পারো? যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন।

ভ—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর বর্তমান অবস্থার জন্য তিনি দায়ী নন। বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী।

ম—তুমি কি যুদ্ধ থামাতে পারো বা জগতকে সংস্কার করতে পারো?

ভ—না।

ম—তবে যা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তার জন্য দুশ্চিন্তা করছ কেন? নিজের ব্যবস্থা করো তাহলে জগতও তার ব্যবস্থা করবে।

ভ—আমরা শান্তিবাদী। আমরা শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাই।

ম—শান্তি সব সময়ে আছে। শান্তির বাধাগুলো দূর কর। এই শান্তিই আত্মা।

চিন্তাগুলোই বাধা। এগুলো না থাকলে তুমি অনন্ত জ্ঞানময় সত্তা অর্থাৎ আত্মা। সেখানে পূর্ণতা আর শান্তি।

ভ—পৃথিবীর নিশ্চয় একটা ভবিষ্যৎ আছে।

ম—বর্তমানে এটা কি, তা কি তুমি জানো? জগৎ ও আর সব কিছু এখন বা ভবিষ্যতেও এক।

ভ—জগতটা আকাশ ও পরমাণুর ওপর জ্ঞানের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ম—সব কিছুই ঈশ্বর ও তাঁর শক্তিতে পর্যবসিত হয়, বর্তমানেও তুমি তার থেকে পৃথক নও। তাঁরা ও তুমি একই জ্ঞান।

একটু পরে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি কখন আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন?"

ম—আমেরিকা যেখানে ভারতও সেখানে (অর্থাৎ মনের ভূমিতে)।

আর একজন (স্পেনদেশীয়) মহিলা—লোকে বলে হিমালয়ে একটা মন্দির আছে, সেখানে প্রবেশ করলে একটা অদ্ভুত স্পন্দন অনুভূত হয় আর তাতে সব রোগ আরোগ্য হয়। একি সম্ভব?

ম—তারা নেপাল আর হিমালয়ের অন্য স্থানে আরও একটি মন্দিরের কথা বলে যেখানে প্রবেশ করলে লোকে অজ্ঞান হয়ে যায়।

৪৮১। মুরুগনার প্রজ্ঞান কি জিজ্ঞাসা করলে।

ম—প্রজ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান) যা থেকে বিজ্ঞান (আপেক্ষিক জ্ঞান) উৎপন্ন হয়।

ভ—বিজ্ঞানের অবস্থায় একজন সংবিৎ (বিশ্বাতীত বোধ) সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু সেই শুদ্ধ সংবিৎ (সার্বিক জ্ঞান) কি অন্তঃকরণ ছাড়াই নিজের সম্বন্ধে সচেতন?

ম—হ্যাঁ তাই, এমনকি যুক্তি অনুসারেও তাই।

ভ—বিজ্ঞানের দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় সংবিৎ সম্বন্ধে সচেতন হলেও প্রজ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশ দেখা যায় না। তা যদি হয় তবে একে সুষুপ্তি অবস্থাতেও পাওয়া যাবে।

ম—উপস্থিত চেতনা অন্তঃকরণ দ্বারা সম্ভব হয়। প্রজ্ঞান সর্বদাই প্রকাশিত, এমনকি সুষুপ্তিতেও প্রকাশিত থাকে। যদি কেউ জাগৃতিতে অবিরত সচেতন থাকে তবে সুষুপ্তিতেও থাকবে।

তাছাড়া একে এইভাবে উপমা দেওয়া যায়—একজন রাজা সভাগৃহে প্রবেশ ক'রে বসলেন তারপর স্থান ত্যাগ করলেন।

তিনি পাকশালায় যান না। সেজন্য সেখানের লোকেদের কি "রাজা এখানে আসেন নি" বলা ঠিক হয়? যখন জাগৃতিতে চেতনা আছে তখন সুষুপ্তিতেও আছে।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৮

৪৮২। ইন্দোরের ডাঃ পাণ্ডে দর্শনার্থে এখানে এসেছেন। তিনি সংশয় নিরসনার্থে ভগবানের কাছে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কোন বাস্তব উপায় জানতে চাইলেন।

ম—একজন লোককে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সে তখন পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাকে গান্ধার দেশের পথ জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে শেষে সেখানে পৌঁছেছিল। সেরূপ সব পথই আত্মজ্ঞানে শেষ হয়। এগুলো সবই একটি মাত্র লক্ষ্যের উপায়সরূপ।

ভ—একটা প্রতীক থাকলে ধ্যানের সুবিধা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে কোন প্রতীক নেই।

ম—তুমি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কর। তুমি কি প্রতীকের দিকে দেখিয়ে বল, এটা আত্মা। তুমি হয়ত শরীরকে আত্মা ভাবো। কিন্তু সুষুপ্তির কথা চিন্তা কর। তখনও তুমি থাকো। সেখানে কি প্রতীক থাকে? অতএব প্রতীক ছাড়াই আত্মার উপলব্ধি হয়।

ভ—ঠিক কথা। আমি কথার মধ্যে শক্তি অনুভব করছি। কিন্তু তবু মন্ত্র ইত্যাদি কি সহায়ক নয়?

ম—তারা সাহায্য করে। মন্ত্র কি? তুমি কেবল মন্ত্রের শব্দটা চিন্তা করছ। তার জপে অন্য চিন্তা দূর হয়। কেবল মন্ত্রজপের

চিন্তা থাকে। সেটাও স্বয়ং মন্ত্রস্বরূপ অনন্ত আত্মাকে স্থান ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

মন্ত্র, ধ্যান, ভক্তি ইত্যাদি সবই সাধন সহায় আর অবশেষে যা তারা নিজেই সেই স্বরূপে নিয়ে যায়।

একটু পরে মহর্ষি বলতে লাগলেন—

প্রত্যেকেই আত্মা আর অসীমও বটে। তথাপি প্রত্যেকে শরীরকে আত্মা বলে ভুল করে। কিছু জানার জন্য জ্ঞানের দরকার। সেই জ্ঞানটা একটা বোধের মত যা স্থূল আলো ও অন্ধকারকে প্রকাশ করে। তাহলে সেই অন্য বোধটা এই আপাত আলো ও অন্ধকারের অতীত। এটা নিজে আলো নয় বা অন্ধকারও নয়, তবু এটা দু'টিকেই প্রকাশ করে বলে একে বোধ বলা হয়। এটা অসীমও বটে আর চেতনারূপেই থাকে। চেতনাই আত্মা যার সম্বন্ধে সবাই সচেতন। কেউ আত্মা থেকে দূরে নয়। সুতরাং সবাই আত্মজ্ঞানী। তথাপি কেউ এই মৌলিক সত্যটা জানে না আর আত্মাকে জানতে চায় না, এ এক রহস্য! শরীরকে আত্মা বলে ভুল করাই এই অজ্ঞানের কারণ। একজন জ্ঞানী নয় এই ভুল ধারণাটা ত্যাগ করাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান কিছু নূতন ক'রে পেতে হয় না। নিত্য হতে গেলে এটা নিশ্চয়ই আগে থেকেই আছে। নতুবা আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টার কোন অর্থ হয় না।

'দেহাত্মবুদ্ধি' বা 'আমি জ্ঞানী নই' এই ভুল ধারণা চলে গেলে পরব্রহ্ম বা আত্মাই কেবল সেখানে থাকে, বর্তমান জ্ঞানের অবস্থায় তাকেই আত্মজ্ঞান বলা হয়। যা হোক, বাস্তবিক সত্য হল আত্মজ্ঞান শাশ্বত আর এইক্ষণেও আছে অর্থাৎ নিত্যবর্তমান।

পরিণামতঃ আত্মজ্ঞানের অর্থ অজ্ঞান দূর করা ছাড়া আর বেশী কিছু নয়।

ভ—আমার জীবিকা কর্মস্থানে থাকতে বাধ্য করে। আমি

সাধু সন্নিধানে থাকতে পারি না। পরিবেশের জন্য সৎসঙ্গের অভাবেও কি আমার আত্মজ্ঞান হতে পারে?

ম—সৎ 'অহম্ প্রত্যয় সারম্' = আত্মার আত্মা। সাধু সেই আত্মার আত্মা। তিনি সর্বভূতে নিহিত। কেউ কি আত্মা ছাড়া আছে? না। সুতরাং কেউ সৎসঙ্গ থেকে দূরে নয়।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮

৪৮৩। একজন দর্শনার্থী সীতারামিয়া—

পতঞ্জলি যোগসূত্রের 'সংযমন' বলতে কি বোঝায়?

ম—মনের একাগ্রতা।

ভ—হৃদয়ে সংযমন করলে 'চিত্ত সংবিৎ' লাভ হয় বলা হয়। তার অর্থ কি?

ম—'চিত্ত সংবিত'ই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধি।

৪৮৪। ভ—আমার মনে হয় আত্মানুসন্ধানের জন্য একজন গৃহস্থেরও ব্রহ্মচর্য ও দীক্ষার প্রয়োজন আছে: আমি ঠিক বলেছি?

কিংবা একজন গৃহস্থ কি কেবল সাময়িকভাবে ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নেবে?

ম—আগে কে স্বামী ও স্ত্রী ঠিক কর। তাহলে আর এ প্রশ্ন উঠবে না।

ভ—অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলেও কি মনের ক্রিয়া দমন করে 'আমি কে?' অনুসন্ধান করা যায়? এরা কি পরস্পর-বিরোধী নয়?

ম—এই সব প্রশ্ন মনের দুর্বলতার জন্য হয়। মনের ক্রিয়া কমে গেলে এর (মনের) শক্তি বাড়ে।

ভ—কর্ম প্রকল্পের অর্থ কি এই যে জগতটা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিণাম? যদি তাই হয় তবে কার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া?

ম—আত্মোপলব্ধি না হওয়া অবধি কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ; আত্মজ্ঞানের পর কোন কর্ম নেই, জগতও নেই।

৪৮৫। ভ—আত্মবিচার শুরু করলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, এর কি প্রতিকার ?

ম—নাম সঙ্কীর্তন কর।

ভ—ঘুমে তা হয় না।

ম—ঠিক। অভ্যাসটা জাগ্রতকালেই করতে হবে। ঘুম থেকে উঠলেই আবার শুরু কর। নিদ্রিত ব্যক্তি আত্মবিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তার কোন অভ্যাস করার দরকার নেই। জাগ্রৎ সত্তাই এটা চায় সুতরাং তাকেই এটা করতে হবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলতে লাগলেন—মন বড় রহস্যময়। এর সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হয়। পরের দু'টিতে বিক্ষেপ হয়। সত্ব অবস্থায় এটি শুদ্ধ ও নির্বিশেষ। সুতরাং সেখানে কোন চিন্তা নেই আর এটা আত্মার সমপর্যায়। মন আকাশের মত। আকাশে যেমন বস্তু থাকে মনেও সেরূপ চিন্তা থাকে। আকাশ যেন মন আর বস্তুসমূহ যেন চিন্তা। একজনের পক্ষে জগৎ পরিমাপ করা আর ব্যাপারগুলো বোঝার আশা করা বৃথা। এ অসম্ভব। কারণ বস্তুগুলো মনের সৃষ্টি। তাদের পরিমাপ করতে যাওয়া আর নিজের ছায়ার মাথায় পা দিতে যাওয়া একই। একজন যত এগিয়ে যায় তার ছায়াও ততই দূরে সরে যায়। সুতরাং সে তার ছায়ার মাথায় পা দিতে পারে না। (এখানে শ্রীভগবান অনেকগুলো প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত গল্প যেমন বাঁদর ও আর্শি ইত্যাদি বললেন।) একটি শিশু দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখে প্রতিবিম্বের মাথাটা ধরতে চায়। সে যেমন নীচু হয়ে হাত বাড়ায় তার মাথাও দূরে সরে যায়। শিশু বার বার চেষ্টা করে। মা তার কষ্ট দেখে দয়ার্দ্র হন। সেজন্য তিনি শিশুটির ছোট হাতটি নিয়ে তার মাথায় দিয়ে ছেলেটিকে আর্শিতেও যে মাথাটা

ধরা হয়ে গেছে তা দেখতে বলেন। অনুরূপভাবে যারা জগৎ সম্বন্ধে বিচার করতে চায় সেই অজ্ঞানী লোকেরাও শিশুর মত। জগতটা মনের সৃষ্টি আর তার সত্তা মনেই রয়েছে। একে বাইরের বস্তুরূপে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। জগতকে বুঝতে গেলে আত্মায় যেতে হবে।

আবার লোকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে মন দমন হয় কি করে। আমি বলি, "আমায় মনটা দেখাও আর তাহলে কি করতে হবে বুঝতে পারবে।" বস্তুতঃ মন কতগুলো চিন্তার সমষ্টি। এর দমন কেবলমাত্র চিন্তা বা ইচ্ছা দিয়ে কি প্রকারে সাধিত হয়? তোমার চিন্তা ও ইচ্ছাসমূহ মনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নূতন চিন্তার সৃষ্টি হয়ে আরও মনের বিস্তার হয়। অতএব মন দিয়ে মনকে নাশ করার চেষ্টা বোকামি। একমাত্র উপায় এর উৎসটা খুঁজে তাকে ধরে থাকা। তাহলে মন আপনা হতেই লয় হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্র বলে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' (মনের ক্রিয়ার দমন) কিন্তু আমি বলি 'আত্মবিচার'। এটাই বাস্তব উপায়। 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' ঘুমে, মূর্ছায় ও অনশনেও হয়। সেখানে কারণটা চলে গেলে আবার চিন্তার উদয় হয়। তবে আর তাতে কি লাভ হয়? মূর্ছার অবস্থায় কোন দুঃখ নেই কেবল শান্তি। কিন্তু মূর্ছাভঙ্গ হলে আবার দুঃখ অনুভূত হয়। সুতরাং নিরোধ নিরর্থক আর তাতে স্থায়ী ফল লাভ হয় না।

তবে লাভটা স্থায়ী হয় কি করে? একমাত্র দুঃখের কারণ অনুসন্ধানেই হয়। দুঃখটা বিষয়ের জন্য। তারা যদি না থাকে তবে চিন্তারাশিও থাকে না আর সে কারণে দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়ে যায়। "বিষয়গুলো লোপ হয় কি করে?" সেটাই পরের প্রশ্ন। শ্রুতি ও ও ঋষিরা বলেন যে বিষয়গুলো মনের সৃষ্টি। তাদের কোন বাস্তব সত্তা নেই। অনুসন্ধান কর আর এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ কর। ফলে সিদ্ধান্ত এই হবে যে বাস্তব জগতটা বিষয়ীর চেতনাতেই রয়েছে। এরূপে আত্মাই একমাত্র সত্য যা জগতে পরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত রয়েছে।

দ্বৈতবোধ না থাকায় কোন চিন্তা উঠে তোমার শান্তি নষ্ট করবে না। এই আত্মজ্ঞান। আত্মা শাশ্বত আর তার উপলব্ধিও তাই।

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান আরও কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করলেন—

যখনই চিন্তা দ্বারা বিচলিত হবে তখনই নিজের আত্মাতে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াই 'অভ্যাস'। এটা কোন কিছুর ওপর একাগ্র হওয়া বা মনকে অন্যমনস্ক করা নয় পরন্তু আত্মাতে প্রত্যাহৃত হওয়া।

ধ্যান, ভক্তি, জপ ইত্যাদি অসংখ্য চিন্তারাশিকে দূরে রাখার উপায়। একটিমাত্র চিন্তা থাকে, সেটাও আত্মাতে লয় হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা উদ্ধৃত করে বললেন যে মনের চিন্তাহীন অবস্থাই উপলব্ধি আর সেই অবস্থার অনুভূতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি নিজেই শ্রীব্রান্টনের বই-এর একটা অংশ পড়লেন যেখানে একে 'অবর্ণনীয়' বলা হয়েছে। উত্তর সেখানেই রয়েছে। তিনি বলার চেষ্টা করলেন যে এটা হয়ত পারা না দেওয়া কাচে দেখার মত আর বর্তমান অভিজ্ঞতা একটা পারা দেওয়া আর্শিতে দেখার মত।

শ্রীভগবান বললেন, এটা একটা নির্মল দর্পণ যেন আর একটা নির্মল দর্পণের সামনে ধরা রয়েছে অর্থাৎ কোন প্রতিবিম্ব নেই।

২রা মে, ১৯৩৮

৪৮৬। শ্রীগণপৎরাম—আমি কি করে 'আমি কে?' খুঁজে পাবো?

ম—দু'টি কি আত্মা আছে যে একজন আর একজনকে খুঁজবে?

ভ—আত্মা একটাই কিন্তু তার নিশ্চয় দু'টি ভাগ আছে যার একটা আমি আর অন্যটা সঙ্কল্প (অর্থাৎ চিন্তক ও চিন্তা)।

একটু পরে সে বললে—

কৃপা করে বলুন আমি কি করে 'আমি' উপলব্ধি করবো। আমি কি 'আমি কে?' জপ করবো।

ম—কোন প্রকার জপ করার কথা বলা হয়নি।

ভ—আমি কি 'আমি কে?' চিন্তা করবো?

ম—তুমি জান যে 'আমি'-চিন্তাটা ওঠে। সেই 'আমি'-চিন্তাটা ধরো আর তার মূল খোঁজো।

ভ—উপায়টা কি জানতে পারি?

ম—এখন যা বলা হল, করে দেখো।

ভ—কি করতে হবে বুঝতে পারলাম না।

ম—যদি এটা একটা বস্তুলীন (অবজেকটিভ্) কিছু হত তবে একটা বাস্তব উপায় বলা যেত। এটা আত্মলীন (সাবজেক্টিভ্) বিষয়।

ভ—আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।

ম—কি! তুমি যে আছ সেটা কি বুঝতে পারো না?

ভ—কৃপা করে উপায়টা বলুন।

ম—তোমার নিজের বাড়ীর ভিতর কি পথ দেখাবার প্রয়োজন হয়? এটা তোমার নিজের অন্তরে।

ভ—আপনি আমায় কি করতে বলেন?

ম—কেনই বা তুমি কিছু করবে আর কি-ই বা করবে? কেবল শান্ত হয়ে থাকো। এটা করো না কেন? প্রত্যেককেই আপন আপন রুচি অনুসারে করতে হবে।

ভ—আমার পক্ষে কি উপযুক্ত দয়া করে বলুন। আমি আপনার কাছে শুনতে চাই।

কোন উত্তর হল না।

৪৮৭। একজন অল্পবয়সী ইংরাজ মহিলা মুসলমানী পোষাক পরে এসেছে। মনে হয় সে উত্তর ভারতে ছিল আর ডঃ জি. এইচ. মিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল।

শ্রীভগবান 'দি ভিসনের' জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী ভারতানন্দের লেখা 'দি ব্লাক সান্' থেকে একটি পরিচ্ছেদ পড়লেন। কয়েক মিনিট পরে কুমারী জে. জিজ্ঞাসা করলে—

এই পরিচ্ছেদ থেকে মনে হয় একজন যতক্ষণ না চেতনায় মিশে যায় ততক্ষণ ধ্যান করতে থাকবে। আপনি কি এটা ঠিক মনে করেন ?

ম—হাঁ।

ভ—আমি আরও এগিয়ে জিজ্ঞাসা করি—যেখান থেকে আর ফেরা যায় না একজন কি ইচ্ছাকৃত ভাবে সেখানে যাবে, এটা কি ঠিক ?

কোন উত্তর নেই, খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

অপরাহ্নে :—

ভ—আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ?

ম—আত্মজ্ঞানই চরম লক্ষ্য আর এটাই তার পরিসমাপ্তি।

ভ—আমি বলতে চাই, আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি ?

ম—আত্মজ্ঞান খুঁজছ কেন ? তোমার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকো না কেন ? স্পষ্টই মনে হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় তুমি অসন্তুষ্ট। আত্মাকে জানলে এই অসন্তোষ চলে যায়।

ভ—যে আত্মজ্ঞান অসন্তোষ দূর করে, সেটা কি ? আমি জগতে রয়েছি আর সেখানে যুদ্ধ চলছে। আত্মজ্ঞান কি এটা (যুদ্ধ) থামাতে পারে ?

ম—তুমি কি জগতে আছ ? কিংবা জগতটা তোমাতে রয়েছে ?

ভ—আমি বুঝতে পারলাম না। জগৎ নিশ্চয়ই আমার চতুর্দিকে রয়েছে।

ম—তুমি জগতের কথা বলছ আর তার ঘটনার কথা বলছ।

সেগুলো কেবলমাত্র তোমার ধারণা। ধারণাগুলো মনের আর মনটা তোমার অন্তরে। সুতরাং জগৎ তোমার অন্তরে।

ভ—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আমি চিন্তা না করলেও জগতটা থাকে।

ম—তুমি কি বলতে চাও জগতটা মন থেকে পৃথক আর এটা মনের অভাবেও থাকে?

ভ—হাঁ।

ম—তোমার সুষুপ্তিতে কি জগৎ থাকে?

ভ—থাকে।

ম—সুষুপ্তিতে কি তুমি জগৎ দেখো?

ভ—না, আমি দেখি না। কিন্তু অন্যেরা যারা জাগ্রত, তারা দেখে।

ম—তুমি কি এ সম্বন্ধে সুষুপ্তিতে সচেতন থাকো? কিংবা এখনই তুমি অন্যদের জানা সম্বন্ধে সচেতন হও?

ভ—আমার জাগ্রত অবস্থায় জানি।

ম—অতএব তুমি জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা বলছ আর সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা বলছ না। তোমার জাগৃতি ও স্বপ্নে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় কারণ তারা মনের সৃষ্টি। সুষুপ্তিতে মন লীন হয়ে যায় আর জগৎ বীজ আকারে থাকে। সেটা তুমি জাগ্রত হলে আবার প্রকাশিত হয়। অহংকার জেগে ওঠে, নিজেকে শরীর বলে নির্ধারণ করে আর জগৎ দেখে। সুতরাং জগতটা মনের সৃষ্টি।

ভ—তা কি করে হয়?

ম—তুমি কি স্বপ্নে একটা জগৎ সৃষ্টি করো না? জাগ্রত অবস্থাটাও একটা দীর্ঘায়িত স্বপ্ন। জাগ্রত ও স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার পিছনে নিশ্চয় একজন দ্রষ্টা আছে। সেই দ্রষ্টা কে? সেটা কি শরীর?

ভ—তা হতে পারে না।

ম—সেটা কি মন ?

ভ—সেটাই হওয়া উচিত।

ম—কিন্তু মনের অভাবেও তুমি থাকো।

ভ—কিরূপে ?

ম—সুষুপ্তিতে।

ভ—তখন আছি কিনা জানি না।

ম—যদি না থাকো তবে গতদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ কর কি করে ? ঘুমে কি 'আমি'র নিরবচ্ছিন্নতা ছেদ হওয়া সম্ভব ?

ভ—হতে পারে।

ম—তা যদি হয় একজন 'জনসন' 'বেনসন্' হয়ে জেগে উঠবে। তবে লোকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা হবে কি করে ?

ভ—আমি জানি না।

ম—যদি এই যুক্তি স্পষ্ট না হয় তবে অন্যভাবে অনুসরণ কর। তুমি স্বীকার কর 'আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম', 'আমি গভীর ঘুমের ফলে বেশ সুস্থ বোধ করছি। সুতরাং ঘুমটা তোমার একটা অভিজ্ঞতা। যে অনুভব করেছিল এখন সে নিজেকে বক্তার 'আমি' রূপে ভাবছে। সুতরাং এই আমিটা সুষুপ্তিতেও ছিল।

ভ—হাঁ।

ম—সুতরাং 'আমি' সুষুপ্তিতে ছিল। তখন যদি জগৎ থাকত সে কি বলেছিল, সে আছে ?

ভ—না। কিন্তু জগৎ এখন বলছে যে সে আছে। আমি যদি এর অস্তিত্ব অস্বীকারও করি, আমি একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে পায়ে আঘাত পেতে পারি। আঘাত পাওয়াই পাথরের অস্তিত্ব তথা জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

ম—ঠিক তাই। পাথর পায়ে ব্যথা দেয়। পা কি বলে পাথর আছে ?

ভ—না—'আমি' বলি।

ম—এই 'আমি'টা কে? আমরা আগেই দেখেছি এটা শরীর হতে পারে না কিংবা মনও হতে পারে না। এই 'আমি'টাই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা অনুভব করে। এই অভিজ্ঞতাগুলো সিনেমার পর্দায় সঞ্চরমান ছবির মত। ছবির আবির্ভাবে ও তিরোভাবে পর্দার কিছু হয় না। অনুরূপভাবে আত্মাকে অবিচলিত রেখে এই তিনটি অবস্থা পর্যায়ক্রমে আসে যায়। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা মনের সৃষ্টি। সুতরাং আত্মাতেই সব রয়েছে। সেই আত্মা তার পূর্ণতায় আনন্দময়, এটা জানাই আত্মজ্ঞান। এর প্রয়োজনীয়তা পূর্ণতাকে উপলব্ধি করা আর এরূপে আনন্দকেও জানা।

ভ—আত্মজ্ঞানী হয়ে জগতের আনন্দের জন্য কিছু না করলে সেটা কি পূর্ণ আনন্দ হতে পারে? যখন চীন ও স্পেনদেশে যুদ্ধ চলছে তখন একজন কিরূপে আনন্দিত হবে? জগতকে সাহায্য না করে আত্মজ্ঞানী হয়ে থাকা কি স্বার্থপরতা নয়?

ম—তোমাকে দেখানো হয়েছে যে আত্মা জগতময় পরিব্যাপ্ত ও তারও অতীত। জগৎ আত্মা ছাড়া থাকতে পারে না। এরূপ আত্মার উপলব্ধিকে যদি স্বার্থপরতা বল তবে সেই স্বার্থপরতা জগতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এটা নিন্দার কিছু নয়।

ভ—আত্মজ্ঞানী কি একজন অজ্ঞানীর মতই জীবন যাপন করে না?

ম—হাঁ, কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে, একজন আত্মজ্ঞানী জগতকে আত্মার অতিরিক্ত দেখে না, তার জ্ঞান প্রকৃত ও পূর্ণ হওয়ার জন্য অন্তরে আনন্দ থাকে, অন্যপক্ষে অন্যজন জগতকে পৃথক দেখে ও নিজেকে অপূর্ণ মনে করে আর দুঃখী হয়। এ ছাড়া শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ একই।

ভ—জ্ঞানীরাও কি ঠিক অন্য লোকেদের মত জগতে যুদ্ধ হচ্ছে জানে?

ম—হাঁ।

ভ—তবে তারা সুখী হয় কি করে?

ম—সিনেমার পর্দা কি আগুন জ্বলে উঠলে কিংবা সমুদ্র উদ্বেলিত হলে নষ্ট হয়? আত্মার পক্ষেও তাই।

আমি শরীর কিংবা মন বোধটা এতই দৃঢ় যে অন্যভাবে বুঝলেও একজন এই ধারণার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। একজন একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে এটা মিথ্যা বলে বুঝতে পারে। জাগ্রত অভিজ্ঞতাও অন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা। সুতরাং প্রত্যেক অবস্থা অন্য অবস্থার বিরোধী। অতএব এগুলো দ্রষ্টার ওপর হওয়া কেবলমাত্র রূপান্তর কিংবা যে আত্মা অখণ্ড ও নির্বিকার থাকে তাতে হওয়া প্রতীয়মান ব্যাপার মাত্র। যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাগুলো কেবলমাত্র একটা ব্যাপার; সেরূপ জন্ম, বিকাশ এবং মৃত্যুও আত্মার ওপর একটা ব্যাপার, কিন্তু আত্মা অখণ্ড ও নির্বিকার। জন্ম মৃত্যু একটা কল্পনা। এটা শরীর বা মনের ব্যাপার। আত্মা এই শরীরটা জন্মাবার আগেও ছিল আর এই শরীরটা মরে গেলেও থাকবে। এরূপে ক্রমান্বয়ে যত শরীরই ধারণ করা হোক না কেন এটা তাদের সঙ্গে আছে। আত্মা অমর। ব্যাপারগুলো পরিবর্তনশীল ও নশ্বর প্রতীত হয়। শরীরের জন্য মৃত্যুকে ভয় হয়। এটা আত্মার পক্ষে সত্য নয়। এই ভয়ও অজ্ঞানের জন্য হয়। আত্মজ্ঞানের অর্থ আত্মার পূর্ণতা ও অমরতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। মরণশীলতা একটা কল্পনা ও দুঃখের হেতু। আত্মার অমর-স্বরূপ উপলব্ধি করে এ থেকে মুক্ত হও।

৩রা মে, ১৯৩৮

সেই মহিলা আবার বললে—

যদি জগতটা একটা স্বপ্ন হয় তবে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে এর সমন্বয় কি করে হয়?

ম—সমন্বয় একে আত্মার অচ্ছেদ্য অংশরূপে জানা।

ভ—কিন্তু স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। আর সেটা জাগ্রত

অবস্থার দ্বারা অস্বীকৃত হয়।

ম—জাগ্রত অভিজ্ঞতাও সেরূপ।

ভ—একজন পঞ্চাশ বছর বাঁচে আর জাগ্রত অবস্থায় একটা ধারাবাহিকতা দেখে যা স্বপ্নে থাকে না।

ম—তুমি ঘুমালে আর একটা স্বপ্ন দেখলে তাতে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা মনে কর সংক্ষিপ্তভাবে পাঁচ মিনিটে দেখলে। সেখানেও একটা ধারাবাহিকতা থাকে। এখন কোনটা সত্য ? তোমার জাগ্রত অবস্থার পঞ্চাশ বছর কিংবা তোমার পাঁচ মিনিটের স্বপ্ন ? সময়ের মান দু'টি অবস্থায় পৃথক। ব্যস্। এ ছাড়া দু'টি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ভ—জীবাত্মা এই অপস্রিয়মান ব্যাপারে ও জন্ম-জন্মান্তরের ক্রমান্বয়ে শরীর গ্রহণে নির্লিপ্ত থাকে। প্রত্যেকটা শরীর নিজেকে সক্রিয় করার জন্য প্রাণটা কি করে পায় ?

ম—জীবাত্মাকে জড়ের থেকে পৃথক করা হয় আর এটা প্রাণে পূর্ণ। শরীরটা তার দ্বারা জীবন্ত হয়।

ভ—জ্ঞানী তবে জীবাত্মা আর জগৎ সম্বন্ধে সচেতন নয়।

ম—সে জগৎ দেখে কিন্তু তাকে আত্মার অতিরিক্ত বলে দেখে না।

ভ—যদি জগৎ দুঃখপূর্ণ হয় তবে সে আর জগৎ ভাবনা করবে কেন ?

ম—জ্ঞানী কি তোমায় বলে যে জগতটা দুঃখময় ? এটা অন্যেরাই যারা দুঃখ অনুভব করে তারাই জগতটা দুঃখপূর্ণ ব'লে জ্ঞানীর সাহায্য চায়। তখন জ্ঞানী তার অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাখ্যা করে বলে যে যদি একজন তার আত্মাতে ফিরে যায় তবে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখ ততক্ষণই অনুভূত হয় যতক্ষণ বস্তুকে নিজের থেকে পৃথক মনে হয়। কিন্তু যখন আত্মাকে অখণ্ড ও পূর্ণ বলে জানা যায় তখন কে আর কি অনুভব করার জন্য থাকে ? জ্ঞানীর মন পবিত্র আত্মা আর অন্য

মন শয়তানের আড্ডা। জ্ঞানীর পক্ষে এটাই স্বর্গরাজ্য। "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।" সেই স্বর্গরাজ্য নিত্য বর্তমান।

৪৮৮। একদল যুবক জিজ্ঞাসা করলে—"বলা হয় শরীরের স্বাস্থ্যই মনের স্বাস্থ্য, তবে কি আমরা শরীরটাকে সর্বদা স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান রাখার চেষ্টা করব না?"

ম—এভাবে স্বাস্থ্যের জন্য শরীরের যত্নের আর শেষ হবে না।

ভ—পূর্বকর্মফলে এখনকার অভিজ্ঞতা, যদি আমরা আগে কি ভুল করেছি জানি তবে সেগুলো সংশোধন করতে পারি।

ম—একটা ভুল শোধরালেও আর সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল রয়ে যাবে, সেগুলো তোমাকে অসংখ্য জন্ম দেবে। সুতরাং এটা ঠিক প্রণালী নয়। একটা গাছকে যত ছাঁটা যায় সেটা তত বাড়ে। কর্ম যতই শোধরাতে যাও আরও কর্ম সঞ্চয় হয়। কর্মের মূল খোঁজো আর সেটা কেটে ফেলো।

৪ঠা মে, ১৯৩৮

৪৮৯। অন্য একদল দর্শনার্থী আত্মজ্ঞানের পদ্ধতি জানতে চাইলে। উত্তর দেওয়া প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন—প্রবর্তকদের মনকে ধরে বিচার করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনটা কি? এটা আত্মার প্রতিফলন। এটা কার আর কোথা থেকে উঠেছে দেখো। দেখা যাবে যে 'আমি'-চিন্তাটাই মূল কারণ। আরও গভীরে যাও; 'আমি'-চিন্তা অদৃশ্য হবে আর সেখানে একটি সীমাহীন ব্যাপক 'আমি' চেতনা প্রকাশ পাবে। একেই অন্যভাবে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে। এ যখন উপাধিযুক্ত হয় তখনই ব্যক্তিসত্তা হয়।

৪৯০। ইংরাজ মহিলাটি শ্রীভগবানের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য প্রার্থনা করলে। সে শুরু করলে, "আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় এ স্থান ত্যাগ করছি। আমি আমার বাড়ীতে আত্মজ্ঞানের আনন্দ পেতে চাই। যদিও সেটা পাশ্চাত্য দেশে সহজ নয় কিন্তু আমি চেষ্টা করবো। এটা করার উপায় কি ?

ম—যদি উপলব্ধিটা বাইরের কিছু হত তবে তোমার যাতে ভাল হয় ও সামর্থ্যানুসারে তোমাকে একটা পথ দেখানো যেত। তখন প্রশ্ন উঠবে যে সেটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, যদি হয় তবে কত দিনে হবে। কিন্তু এখানে উপলব্ধিটা আত্মার। তুমি আত্মা ছাড়া থাকো না। আত্মা সব সময়ে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু তুমি কেবল সেই তথ্যটা ধরতে পারছ না। উপলব্ধি এখন বর্তমানে জগৎ ভাবনায় আড়াল পড়ে গেছে। এখন জগতকে তোমার বাইরে দেখা হচ্ছে আর সেই সংক্রান্ত ধারণা তোমার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করেছে। যা করতে হবে সেটা কেবল এই অজ্ঞানটা অতিক্রম করা আর তখন আত্মা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে দেখা যাবে। আত্মাকে জানার জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন নেই। সব চেষ্টাই সত্যের বাধা দূর করার জন্য করা হয়।

একজন মহিলার গলায় একটা হার আছে। সে ভুলে গিয়ে মনে করে যে সেটা হারিয়ে গেছে আর ব্যস্ত হয়ে এখানে ওখানে সর্বস্থানে খোঁজে। না পেয়ে সে বান্ধবীদের জিজ্ঞাসা করে যে কেউ সেটা কোথাও পেয়েছে কিনা, শেষে একজন দয়াবতী বান্ধবী গলা দেখিয়ে তাকে হারটা ছুঁতে বলে। অনুসন্ধানকারিণীও তাই করলে, হারটা পাওয়া গেল আর সে খুশি হল। আবার অন্যান্য সখীদের সঙ্গে দেখা হলে তারা জিজ্ঞাসা করে যে হারানো হারটা পাওয়া গেছে কিনা ; সে তাদের 'হাঁ, পেয়েছি' বলে, যেন সেটা সত্যই হারিয়ে ছিল আর পরে পাওয়া গেছে। তার নিজের গলার হারকে আবিষ্কারের আনন্দ আর হারানো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আনন্দ

একই। বাস্তবিক সত্য এই যে সে কোন সময়ে সেটা হারায় নি বা ফিরেও পায়নি। তবু এক সময়ে দুঃখী হয়েছিল আর এখন সুখী হল। আত্মজ্ঞানও ঠিক সেরূপ। আত্মা সর্বদাই অনুভূত হচ্ছে। এই উপলব্ধি এখন আড়াল পড়ে গেছে। যখন আবরণটা দূর হয়ে যায় লোকে নিত্য অনুভূত আত্মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়। নিত্য-আত্মজ্ঞান যেন নূতন করে পাওয়া জ্ঞান বলে মনে হয়।

এখন বর্তমান অজ্ঞানটা দূর করার জন্য একজন কি করবে? প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হও। এই ব্যাকুলতা যতই বাড়বে ভ্রান্ত জ্ঞানের শক্তি তত কমে যাবে, অবশেষে সেটা অদৃশ্য হবে।

ভ—পূর্বে আপনি বলেছেন যে গভীর ঘুমে কোন চেতনা নেই। কিন্তু আমি কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে সেই অবস্থাতেও ঘুমিয়ে আছি অনুভব করেছি।

ম—এখন এই তিনটি তথ্য চেতনা, ঘুম ও তার জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটা অপরিবর্তনীয়। যে চেতনা ঘুমকে একটা অবস্থা বলে জেনেছিল সে এখন জাগ্রত অবস্থায় জগৎ দেখছে। জগতের অভাবই ঘুমের অবস্থা। জগৎ আসতে বা যেতে পারে—অর্থাৎ একজন জাগ্রত বা নিদ্রিত হতে পারে—চেতনার কোন বিকার হয় না। এটা একটা ধারাবাহিক তথা পূর্ণ সত্তা যার ওপর জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটি অবস্থা চলে যাচ্ছে। এইক্ষণেও সেই চেতনা হয়ে থাকো। সেটাই আত্মা—সেটাই জ্ঞান—সেখানেই শান্তি—সেখানেই আনন্দ।

মহিলা মহর্ষিকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলে।

৭ই মে, ১৯৩৮

৪৯১। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীকিশোরলাল মসরুওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্রহ্মচর্য কিভাবে পালন করা উচিত যাতে জীবনে তা সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?"

ম—এটা ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার, সাত্ত্বিক খাদ্য, প্রার্থনা ইত্যাদি এর প্রয়োজনীয় উপায়।

ভ—যুবকেরা কুঅভ্যাসে পড়ে। তারা সেটা ত্যাগ করার জন্য আমাদের কাছে উপদেশ চায়।

ম—মনের সংস্কার দরকার।

ভ—আমরা কি তাদের বিশেষ খাদ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি পরামর্শ দিতে পারি?

ম—কিছু ওষুধ আছে। যৌগিক আসন ও সাত্ত্বিক খাদ্যে উপকার হয়।

ভ—কয়েকজন যুবক ব্রহ্মচর্য ব্রত নেয়। তারা দশ বারো বছর পরে এরজন্য অনুতাপ করে। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য যুবকদের কি ব্রহ্মচর্য ব্রত নিতে উৎসাহিত করবো?

ম—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য হলে এ প্রশ্ন উঠত না।

ভ—যুবকেরা ব্রহ্মচর্যের যথার্থ অর্থ না বুঝে ব্রত নেয়। সেটা পালন করতে অসমর্থ হয়ে আমাদের পরামর্শ চায়।

ম—তাদের ব্রত নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তারা ব্রত না নিয়েও চেষ্টা করতে পারে।

ভ—আত্মজ্ঞানের জন্য কি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের সাধনা প্রয়োজন?

ম—আত্মজ্ঞানই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য। ব্রতটা ব্রহ্মচর্য নয়। ব্রহ্মে থাকাই ব্রহ্মচর্য আর এরজন্য জোর করে একটা চেষ্টা করা নয়।

ভ—বলা হয় কাম. ক্রোধ ইত্যাদি সদ্‌গুরুর সন্নিধানে ত্যাগ হয়ে যায়। হয় কি?

ম—এটা ঠিক। আত্মজ্ঞানের আগে কাম ও ক্রোধ ত্যাগ হয়ে যাবে।

ভ—কিন্তু একজন গুরুর সকল শিষ্য সমান উন্নত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পতন হতে দেখা যায়। এরজন্য কে দায়ী?

ম—আত্মজ্ঞান ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। গুরুর আদর্শ অনুযায়ী চলা সব সময়ে সম্ভব নয়।

ভ—প্রবৃত্তি কি আত্মজ্ঞানকে প্রভাবিত করে?

ম—শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা স্বতঃই হয়।

ভ—আত্মজ্ঞানের পূর্বে কি সব মলিনতা দূর করা প্রয়োজন নয়?

ম—জ্ঞানই সব মলিনতা দূর করে দেবে।

ভ—গান্ধীজী প্রায়ই তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের পতনে বিচলিত হন। তিনি ভেবে পান না এটা কেন হয় আর ভাবেন যে এটা তাঁর নিজের দোষেই হয়েছে। এটা কি ঠিক?

ম—(শ্রীভগবান হাসলেন ও কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলেন) গান্ধীজী নিজে আদর্শবান হতে বহু কষ্ট করেছেন। সবাই সময়ে ঠিক হবে।

ভ—হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ কি ঠিক?

ম—এই প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই মতবাদের সপক্ষ ও বিপক্ষ আছে। এমনকি বর্তমান জন্মটাও অস্বীকার করা হয়, 'ন ত্বেবাহম্ জাতু নাসম্' ইত্যাদি (ভগবদ্গীতা)। আমরা কোন সময়ে জন্মাইনি ইত্যাদি।

ভ—ব্যক্তিসত্তা কি অনাদি নয়?

ম—অনুসন্ধান কর আর দেখো ব্যক্তিসত্তা আদৌ আছে কি না। এই সমস্যার সমাধান ক'রে তার পর জিজ্ঞাসা কর। নাম্মালবার বলে, "অজ্ঞানে আমি অহংকারকে আমি ভেবেছিলাম; যাহোক প্রকৃত জ্ঞানে অহংকার কোথাও নেই আর কেবল তুমি 'আত্মা' রূপে আছ।" দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী উভয়েই আত্মজ্ঞান লাভের বিষয়ে সহমত। আমরা আগে এটা করি তারপর আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করবো। অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ কেবল যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। আত্মার উপলব্ধি হলে এ প্রশ্ন উঠবে না। এমনকি

শুকেরও নিজের ব্রহ্মচর্যের ওপর বিশ্বাস ছিল না, অন্যপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। আত্মজ্ঞানকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় সত্য, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় যা স্বাভাবিক অন্য অবস্থায় সেগুলো অনুশীলনীয় পদ্ধতি। আত্মজ্ঞান লাভ হলেই দেহাত্মবুদ্ধির নাশ হয়। এর নাশ হলে বাসনার নাশ হয় আর সকল সদ্‌গুণই অবশিষ্ট থাকে।

ভ—জ্ঞানীরও সংস্কার থাকে বলা হয়।

ম—হাঁ, সেগুলো ভোগহেতু (ভোগের জন্য), বন্ধহেতু (বন্ধনের জন্য) নয়।

ভ—ভণ্ড সাধুরা এই ব্যাপারটার সুবিধা নেয়। তারা সাধুর ভান করে কিন্তু পঙ্কিল জীবন যাপন করে। তারা বলে প্রারব্ধ। আমরা খাঁটি ও নকল সাধু কি করে চিনব?

ম—যে কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করেছে সে বার বার 'এটা আমার প্রারব্ধ' বলতে পারে না। 'জ্ঞানীরা পৃথক জীবন যাপন করেন' অন্যদের বোঝাবার জন্য বলা হয়। জ্ঞানীরা তাদের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারের জন্য এই কৈফিয়ৎ ব্যবহার করতে পারে না।

(কয়েক মিনিট পরে শ্রীভগবান কিশোরলালের দুর্বল শরীরের বিষয়ে বললেন।)

শ্রীকিশোরলাল—আমার হাঁপানী আছে। আমি কোনদিন সবল ছিলাম না। এমন কি শৈশবেও মায়ের স্তন্য পান করিনি।

ম—এখানে মন শক্তিশালী কিন্তু শরীর দুর্বল।

ভ—আমি রাজযোগ অভ্যাস করতে চেয়েছিলাম। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য পারিনি। শরীরের চলাফেরার জন্য মনও অস্থির হয়।

ম—মনস্থির থাকলে শরীর যত খুশি ঘুরে বেড়াক।

ভ—প্রবর্তকের পক্ষে এটা কি অসুবিধাজনক নয়?

ম—অসুবিধা হলেও চেষ্টা করা উচিত।

ভ—নিশ্চয়। কিন্তু চেষ্টাগুলো ক্ষণস্থায়ী।

ম—'ক্ষণস্থায়ী' ধারণাও অন্যান্য ধারণার মত একটা। যতক্ষণ চিন্তা আছে ততক্ষণ এ চিন্তা উঠবে। একাগ্রতাই আমাদের স্বরূপ (অর্থাৎ সত্তা)। এখন চেষ্টা আছে; আত্মজ্ঞান হলে চেষ্টা চলে যায়।

ভ—একে মনের বিচলনের অন্তর্বর্তী অবস্থা বলা হয়।

ম—এটাও মনের চঞ্চলতার জন্য হয়।

ভ—স্বীকার করলে, যখনই সে কোন মৌলিক কিছু পেয়েছে বলে মনে করেছে পরে দেখেছে যে আগেই অন্য কেউ সেটা পেয়ে গেছে।

শ্রীভগবান দেখালেন যে সব কিছুই বীজ আকারে আছে সুতরাং নূতন কিছুই নেই।

৮ই মে, ১৯৩৮

৪৯২। পাহাড়ের স্বত্ব নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মন্দিরের মামলায় শ্রীভগবান সাক্ষীরূপে আহুত হন। একটা কমিসন তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করলে। সেই সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন যে শিব সর্বদা তিনরূপে—ব্রহ্মরূপে (পরব্রহ্ম), লিঙ্গরূপে (এখানে পাহাড়) ও সিদ্ধরূপে থাকেন।

পাহাড়ে কয়েকটি তীর্থ (পুষ্করিণী) আছে যথা মুনাইপল-তীর্থ পদ-তীর্থ আর এগুলো বিরূপাক্ষ দেবর ও গুহ নমঃশিবায়ারের জন্য বা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয়। আর ঋষভ-তীর্থও আছে। এগুলো সবই ভালভাবে রাখা হয়েছে।

আদিতে শিব অগ্নিস্তম্ভ রূপে প্রকাশিত হন। প্রার্থনা করা হলে জ্যোতি পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে আর এটি লিঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। দুই-ই শিব।

মহর্ষি বলেছিলেন—বাড়ীঘর বা আশ্রম আমার চারপাশে গড়ে ওঠে। আমি এদের ইচ্ছা করি না। আমি এদের চাই না কিংবা বাধাও দি না। আমি বেশ জানি যে আমি না চাইলেও কাজ হয়ে যায়। সুতরাং আমি ধরে নিয়েছি যে তারা 'হবেই' আর সেজন্য 'না'-ও বলি না।

প্রশ্ন—বর্তমান সর্বাধিকারী কি আপনার স্বত্বাধিকারী?

ম—হাঁ, কেবল তত্ত্বাবধানের জন্য।

(অর্থাৎ স্বত্বাধিকার বলতে কেবল দেখাশোনা করা বোঝায়।)

প্রশ্ন—তিনিই কি কাজকর্ম চালান?

ম—সে কাজকর্ম দেখাশোনা করে। কাজ অন্যেরাও করে।

১৮ই মে, ১৯৩৮

৪৯৩। একজন আন্ধ্র দর্শনার্থী—কি উপায়ে আমার মন আপনার শ্রীচরণে একাগ্র হবে?

ম—'আমি কি কখন শ্রীচরণ হতে দূরে?' এই চিন্তায়।

ভ—এ চিন্তা দৃঢ় হবে কি করে?

ম—যে চিন্তাগুলো একে বাধা দেয় তাদের দূরে সরালে।

৪৯৪। শ্রীভগবান্ ম্যাড্যাম্যাজেল প্যাসকালিন মৈলার্তের 'টার্ণ ইস্টওয়ার্ডস্' বইটি আদ্যোপান্ত দেখলেন—আর প্রায় একঘণ্টা তার বিষয় বললেন। তিনি বললেন যে লেখনটি আবেগময় আর লেখিকাও সংবেদনশীলা। বইটির রচনাশৈলী সাবলীল ও তাঁর কথা স্মরণ করে শেষ করা হয়েছে। দু'চারটি ভুল দেখানো যায় যেগুলো পরের সংস্করণে ঠিক করতে হবে। নানদানার চরিত্রটি দু'টি পৃথক ঘটনা এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দু'বার লেখা হয়েছে। পৃথ্বী, অপ ইত্যাদি

লিঙ্গগুলোর স্থানও ভুল হয়েছে। শ্রীভগবান মনে করেন যে বইটি বেশ ভালই হয়েছে। তিনি 'টার্ণ ইস্টওয়ার্ডস্'-এর অর্থ করলেন 'টার্ণ টু দি সোর্স অফ লাইট'। এই বইটি শ্রীব্রান্টনের বই-এর ভাল সম্পূরক (অতিরিক্ত) সংখ্যা হতে পারে।

২৯শে মে, ১৯৩৮

৪৯৫। এরণাকুলাম কলেজের অধ্যাপক একজন কোচিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রীভগবানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথাবার্তা হল।

শ্রীভগবান ঈশ্বরের নিকট সমর্পণের পরামর্শ দিলেন। দর্শনার্থী একজন আই. সি. এস. কর্মকর্তার কথা বললেন। সেই ভদ্রলোক শিক্ষার্থী অবস্থায় অবিশ্বাসী ও নাস্তিক ছিল। এখন সে খুব ভক্ত হয়েছে। যারা তাকে আগে চিনত তারা তার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এইগুলো বিশেষ দ্রষ্টব্য—

দর্শনার্থী বললেন—"একজনের ভোগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণভাবে মিটে গেলেই সে ত্যাগ করতে পারে।" শ্রীভগবান হেসে বাধা দিয়ে বললেন, "আগুনটা বোধহয় স্পিরিট ঢেলেও নিভানো যায়। (সকলের হাস্য)। যতই ভোগ হয় সংস্কার ততই দৃঢ় হয়। সেগুলো দুর্বল হলেই আর কর্মক্ষম হতে পারে না। এরূপ (সংস্কারের) শক্তিহীনতা কেবল আত্মসংযমের দ্বারাই হতে পারে ; ভোগে গা ভাসালে হয় না।"

ভ—সেগুলোকে কি করে দুর্বল করা যায় ?

ম—জ্ঞানে। তুমি জানো তুমি মন নও। কামনাগুলো মনের। এরূপ জ্ঞান একজনকে সেগুলো দমন করতে সাহায্য করে।

ভ—কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে তারা সংযত হয় না।

ম—প্রত্যেকবার যখন তুমি কামনা পূর্ণ করতে যাও, এটা দমন করা উচিত এ বোধ আসে। বার বার এরূপ মনে পড়লে সময়ে

ইচ্ছাটা কমে যায়। তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি? তুমি এটা কি করে ভুলতে পারো? জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কেবলমাত্র কতগুলো মনের অবস্থা। এগুলো আত্মা নয়। তুমি এই অবস্থাগুলোর সাক্ষী। তোমার প্রকৃত স্বরূপকে সুষুপ্তিতে পাওয়া যায়।

ভ—কিন্তু আমাদের ধ্যানের সময়ে ঘুমিয়ে না পড়তে বলা হয়।

ম—সেটা তন্দ্রা। এটা যেন না আসে দেখতে হবে। যে সুষুপ্তির পর জাগরণ হয় সেটা প্রকৃত সুষুপ্তি নয়। যে জাগৃতির পর সুষুপ্তি হয় সেটা প্রকৃত জাগৃতি নয়। তুমি কি এখন প্রকৃত জাগ্রত? তুমি তা নও। তোমাকে তোমার প্রকৃত স্বরূপে জেগে উঠতে হবে। তোমার মিথ্যা ঘুমিয়ে পড়া চলবে না আর মিথ্যা জেগে থাকাও চলবে না। সেজন্যে—

"লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তম্ বিক্ষিপ্তম্ সমায়েৎ পুনঃ।"

এর অর্থ কি? এর অর্থ তুমি এই অবস্থাগুলোর কোন একটাতেও পড়বে না কিন্তু তাদের মধ্যেও তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকবে।

ভ—এই অবস্থাগুলো কেবল আমাদের মনের।

ম—কার মন? এটা ধরো আর দেখো।

ভ—মনকে ধরা যায় না। এটাই এই সব সৃষ্টি করে। এর ক্রিয়া দেখা যায় কিন্তু প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না।

ম—ঠিক তাই। তুমি বর্ণালীর (স্পেক্‌ট্রামের) অনেক রঙ দেখো। সব ক'টি মিলে সাদা আলো হয়। কিন্তু তিনপলা কাচে সাতটা রঙ দেখা যায়। সেরূপ এক আত্মাই মন, জগৎ, শরীর ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে বিশ্লিষ্ট হয়। অর্থাৎ তুমি যা দেখতে চাও, সে তাই হয়।

ভ—এটা বাস্তবে অভ্যাস করা কঠিন। আমি বরং ঈশ্বরকে ধরে থেকে তাঁকেই সমর্পণ করবো।

ম—সেই সব থেকে ভাল।

ভ—আসক্তি ছাড়া কর্ম কি করে করব? স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে। তাদের প্রতি কর্তব্য করতে হবে। স্নেহ-মমতা চাই। ঠিক বলেছি?

ম—কলেজে কি করে কাজ কর?

ভ—(হেসে)—বেতনের জন্য।

ম—আসক্তির দ্বারা বদ্ধ না হয়ে কেবল কর্তব্য কর্মের জন্য।

ভ—কিন্তু আমার ছাত্ররা আমার কাছে স্নেহ-মমতা আশা করে।

ম—'যোগবাশিষ্ঠ' বলে অন্তরে অনাসক্তি বাইরে আসক্তি।

৯ই জুন, ১৯৩৮

৪৯৬। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীভগবানের একটি রোচক আলোচনা হয়। সেই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান মন্তব্য করেছিলেন—

এমনকি এইক্ষণেও অবিদ্যা তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানার বাধা।

ভ—অবিদ্যা কি করে দূর হয়?

ম—'যা ন বিদ্যতে সা অবিদ্যা' (যা নেই তাই অবিদ্যা)। সুতরাং এটা নিজেরই একটা কপোল-কল্পনা। সত্য হলে যায় কি করে? তার সত্তাটাই মিথ্যা আর সেজন্য এটা অদৃশ্য হয়।

ভ—যদিও বুদ্ধিগতভাবে বুঝেছি তথাপি আমি আত্মোপলব্ধি করতে পারি না।

ম—এই চিন্তাটাই বা কেন তোমার বর্তমান উপলব্ধির অবস্থায় পীড়া দেবে?

ভ—আত্মা এক, তবু আমি বর্তমান দুঃখ থেকে নিজেকে মুক্ত দেখি না।

ম—কে এটা বলে? এটা কি আত্মা যে এক মাত্র আছে, সে বলে? প্রশ্নটা স্ববিরোধী।

ভ—আত্মোপলব্ধির জন্য কৃপা চাই।

ম—তুমি যে একজন মানুষ হয়েছ 'আর একটা উচ্চশক্তি তোমায় চালিত করছে বুঝতে পারছ, এটাও কৃপারই জন্য হয়েছে। কৃপা তোমার অন্তরে। ঈশ্বরোগুরুরাত্মেতি (ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা সমার্থ)।

ভ—আমি সেই কৃপার প্রার্থী।

ম—হাঁ, হাঁ।

১০ই জুন, ১৯৩৮

৪৯৭। আর এক কথা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন—

সত্ব—বোধ বা প্রকাশ

রজঃ—বিষয়ী আর

তমঃ—বিষয়

এমনকি সত্ববোধও একটা প্রতিফলিত বোধ। এটা যদি শুদ্ধ, মূল বোধ হত তবে তাতে কোন বিকার থাকত না। মনাকাশই ভূতাকাশে প্রতিফলিত হয় আর তাতে বিষয়কে বিষয়ী থেকে পৃথক দেখায়।

ব্যবহারদশাতেও (বাস্তব জীবনেও) সমাধি আছে। সমাধি ছাড়া আমাদের কাজকর্মের (ব্যবহারের) কোন অস্তিত্ব নেই। পর্দার ওপর ছবি চলা-কালেও পর্দা আছে আবার ছবি প্রতিফলিত না হলেও আছে। সেরূপ আত্মা সর্বদাই আছে তা সেটা ব্যবহার (কাজকর্ম) বা শান্তিদশা যাই হোক না কেন।

৪৯৮। লোকে প্রায়ই বলে যে মুক্ত পুরুষের জনসমাজে তাঁর বাণী

প্রচার করা উচিত। তারা যুক্তি দেয় যে যতক্ষণ তাঁর চারিপাশে দুঃখ-কষ্ট রয়েছে তিনি কি করে মুক্ত হন? ঠিক। কিন্তু কে মুক্ত? তিনি কি দুঃখকে নিজের অতিরিক্ত দেখেন? তারা মুক্তির অবস্থা লাভ না করেই মুক্ত পুরুষের অবস্থা নির্ণয় করতে চায়। মুক্ত পুরুষের দিক থেকে তাদের যুক্তিটা এরূপ—একজন লোক ঘুমালো আর সে স্বপ্নে কয়েকজন লোক দেখলো। জেগে উঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘুমের লোকেরা কি জেগেছে?' এটা হাস্যকর।

আবার একজন সৎ লোক বলে, "আমি যদি মুক্তি না পাই তাতে কিছু এসে যায় না কিংবা আমি না হয় সবশেষেই মুক্তি পাবো, আমার মুক্তির আগে আর সবাই মুক্ত হয়ে যাক, আমি তাদের সাহায্য করবো।" এ সব বেশ ভাল। কল্পনা কর একজন স্বপ্ন দেখছে আর বলছে, "এরা সবাই আমার আগে জেগে উঠুক।" এই স্বপ্নাবিষ্ট লোকটি আমাদের উপরিবর্ণিত শুভানুধ্যায়ী দার্শনিকের থেকে বেশী হাস্যকর নয়।

৪৯৯। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর আরও প্রশ্ন ছিল—

স্বামীজী, আপনি অল্প বয়সে পাহাড়ের ওপরে যে আশ্রমে ছিলেন আমি তা দেখেছি। আপনার জীবনীও পড়েছি। আপনার তখন ঈশ্বর আছেন অনুভব ক'রে তাঁর কাছে প্রার্থনা বা এই অবস্থা লাভের জন্য কোন সাধনা করার কথা মনে হয়েছিল কিনা, বলবেন?

ম—জীবনীটা ভাল করে পড় তাহলেই বুঝতে পারবে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই একই প্রকার সত্য অর্থাৎ অজ্ঞানীদের কল্পনা জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা সত্য নয়।

ভ—জ্ঞানী কি তবে অন্যায় কাজ করতে পারেন কিংবা তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব?

ম—একজন অজ্ঞানী একজনকে জ্ঞানী বলে মনে করে আর তাকে শরীর বলে নির্ধারণ করে। যেহেতু সে আত্মা কি জানে না

সেজন্য নিজের শরীরকেই আত্মা ভাবে আর সেই ভুলটা জ্ঞানীর সম্বন্ধেও আরোপ করে। অতএব জ্ঞানীকে একটা শরীর মনে করা হয়।

আবার যদিও অজ্ঞানী কর্তা নয় তথাপি সে নিজেকে কর্তা মনে করে আর শরীরের কাজগুলো নিজের বলে বিবেচনা করে ; সে জ্ঞানীর শরীরটাকে কাজ করতে দেখে মনে করে যে জ্ঞানীও কাজ করছে। কিন্তু জ্ঞানী প্রকৃত সত্য জানে আর তার ভুল হয় না। জ্ঞানীর অবস্থা অজ্ঞানী বুঝতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানীরই যত প্রশ্ন হয়, জ্ঞানীর মনে কোন প্রশ্ন ওঠে না। সে যদি কর্তা হত তাহলে সে কর্মকে পরিচালনা করতে পারত। আত্মাও কর্তা হতে পারে না। এখন কে কর্তা খুঁজে দেখো, তা হলেই আত্মা প্রকাশ পাবে।

ভ—কর্মে অদ্বৈতভাব হতে পারে না। সেই থেকেই প্রশ্ন উঠছে।

ম—কিন্তু শ্লোকে বলা হয়েছে 'করবে'। 'কর'টা কেবল অভ্যাসীর, আর সিদ্ধের জন্য নয়।

ভ—হাঁ, আমি এখন বুঝেছি। তাছাড়া গুরুর সম্বন্ধেও অদ্বৈতভাব হতে পারে না। সঙ্গতি রাখতে গেলে উপদেশ নেওয়া হয় না।

ম—হাঁ, গুরু অন্তরে, বাইরে নয়। একজন তামিল ভক্তকবি বলেছেন, "হে গুরু! তুমি সর্বদাই অন্তরে আছ কেবল এখন আমায় পথ দেখাতে ও রক্ষা করতে বাইরে মানবরূপে প্রকাশ হয়েছ!" যা অন্তরে আত্মা তাই সময় হলে বাইরে গুরুর মূর্তিরূপে দেখা দেয়।

ভ—অতএব এটাই আশয়। একজন জ্ঞানীকে দেখলেই তাঁকে জানা হয় না। জ্ঞানীর শরীর দেখা হয়, তাঁর জ্ঞান দেখা যায় না। একজন জ্ঞানীকে বুঝতে হলে জ্ঞানী হতে হবে।

ম—জ্ঞানী কাউকে অজ্ঞানী দেখে না। তার চোখে সবাই জ্ঞানী। অজ্ঞান অবস্থায় একজন তার অজ্ঞান জ্ঞানীর ওপর আরোপ করে আর তাকে কর্তা বলে ভুল করে। জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞানী আত্মা

থেকে কিছু পৃথক দেখে না। আত্মা পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ ও কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান। সুতরাং তার দৃষ্টিতে কোন অজ্ঞান নেই। এইরূপ দৃষ্টি-বিপর্যয় বা আরোপের একটা দৃষ্টান্ত আছে। দু'টি বন্ধু পাশাপাশি ঘুমালে। তারমধ্যে একজন স্বপ্ন দেখলে যে তারা দু'জনে বহু স্থান ভ্রমণ করে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। জেগে উঠে সেগুলো ব'লে সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে যে সেগুলো ঠিক কিনা। অন্যজন তাকে পরিহাস ক'রে বললে যে সেগুলো কেবল তার স্বপ্ন যা অন্যের পক্ষে খাটে না।

সেরূপ তার কাল্পনিক ধারণাগুলো অন্যের ওপর আরোপকারী অজ্ঞানীরও এই স্থিতি।

অল্পবয়সে অজ্ঞান অবস্থা আর উপস্থিত জ্ঞানের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীভগবান বললেন—

সাধারণতঃ যা মনে করা হয় সেরূপ কোন জ্ঞান নেই। সাধারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের ধারণা আপেক্ষিক ও মিথ্যা। তারা সত্য না হওয়ার জন্য স্থায়ী নয়। প্রকৃত অবস্থা অদ্বৈত। আত্মা। এটা শাশ্বত আর একজন জানুক বা না জানুক এটা নিত্য। এটা 'কণ্ঠাভরণ' বা 'দশম' ব্যক্তির মত।

ভ—যা অন্যে দেখিয়ে দেয়।

ম—সেও বাইরে নয়। তুমি শরীরকে গুরু বলে ভুল কর। কিন্তু গুরু নিজে তা মনে করেন না। তিনি নিরাকার আত্মা। সেটা তোমার অন্তরে; তিনি তোমায় পথ দেখাবার জন্য বাইরে আবির্ভূত হন।

৫০০। ভ—যখন সব চিন্তা দূর হয়ে যায় আর মন স্থির হয়ে যায় বা একটা কিছু নেই বা শূন্য অবস্থায় পৌঁছে যায় সেখানে, 'ঈপ্সিত' বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে (অর্থাৎ আমকে আম বলে দেখার মত) দেখার জন্য 'সাধকের' কিরূপ চেষ্টার প্রয়োজন হয় ?

ম—কে এই কিছু নেই বা শূন্যতা দেখে? প্রত্যক্ষ দেখা কি? আমটাকে দেখা কি তুমি প্রত্যক্ষ বল? এর মধ্যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া আছে। সুতরাং এটা অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান নয়, পরোক্ষ (আপেক্ষিক) জ্ঞান। এখন একটা বস্তু দেখছ তাই পরে বলছ কিছু নেই (অর্থাৎ যখন কিছু দেখ না)। দু'টিই মনের ক্রিয়া। এ দু'টি বলার পিছনে যা রয়েছে সেটাই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা) আছে, মানস প্রত্যক্ষ (মন দিয়ে দেখা) আছে আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ (সত্তা বলে অনুভব) আছে। শেষেরটাই সত্য। অন্যগুলো আপেক্ষিক ও মিথ্যা।

ভ—যদি কোন চেষ্টার প্রয়োজন না থাকে তবে মনের এই স্থায়ী শূন্যতাকে কি আত্মোপলব্ধির অবস্থা বলা যায়?

ম—যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ চেষ্টার প্রয়োজন আছে। এই শূন্য অবস্থাটাই সকল দার্শনিকদের বিতর্কের বস্তু।

ভ—আত্মোপলব্ধির অবস্থায় কোন কিছু 'প্রত্যক্ষভাব' থাকে কিংবা আত্মোপলব্ধি কেবল সত্তার অনুভূতি বা উপলব্ধি কিংবা আত্মার স্থিতি?

ম—প্রত্যক্ষই সত্তা আর এটা কোন অনুভূতি ইত্যাদি নয়?

ভ—যতক্ষণ না সাধক অনুভব করে যে সে নিজেই তার ঈপ্সিত বস্তু ততক্ষণ তার (সাধকের) এইসব প্রশ্ন হয়।

ম—ঠিক। তুমি সাধক কিনা দেখো। আত্মাকে প্রায়ই জ্ঞাতা বলে ভুল করা হয়। সুষুপ্তিতে অর্থাৎ অজ্ঞানে কি আত্মা নেই? অতএব আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অতীত। এই সংশয়গুলো মনের ভূমিতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনকে শুদ্ধ রাখতে বলা হয় আর যখন রজঃ ও তমঃ চলে যায় তখন কেবল সত্ত্ব মন থাকে। সুতরাং সত্ত্ব অবস্থায় (উঁণ্‌দল কানে) 'আমি' চলে যায়।

জ্ঞানচক্ষুর অর্থ ইন্দ্রিয়ের মত আর একটা দেখার চোখ নয়। 'জ্ঞানমেব চক্ষু'। দূরদর্শন ইত্যাদি জ্ঞানচক্ষুর ক্রিয়া নয়।

যতক্ষণ একটা বিষয় ও তার জ্ঞাতা আছে সেটা কেবলমাত্র আপেক্ষিক জ্ঞান। জ্ঞান আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। এটাই পরম।

আত্মাই বিষয়ী ও বিষয়ের মূল। এখন অজ্ঞান আবৃত হওয়ায় বিষয়ীকেই মূল বলে মনে হচ্ছে। বিষয়ী জ্ঞাতা আর ত্রিপুটির একটা অংশ, এই অংশগুলো অন্যোন্য-সাপেক্ষ। সুতরাং বিষয়ী বা জ্ঞাতা কখন চরম সত্য হতে পারে না। সত্য বিষয়ী ও বিষয়ের অতীত। যখন উপলব্ধি হবে তখন কোন সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ
ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"

হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয় সকল সংশয় ছিন্ন হয়। একেই প্রত্যক্ষ বলে আর তুমি যা ভাবছ তা প্রত্যক্ষ নয়। অবিদ্যা নাশই আত্মোপলব্ধি। আত্মজ্ঞান কেবল ঔপচারিক (আরোপিত)। অবিদ্যা নাশকে আত্মজ্ঞানরূপ শ্রুতিমধুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

১২ই জুলাই, ১৯৩৮

৫০১। মহীশূরের একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে—

ভ—আমি শরীরটা কি করে পেলাম?

ম—তুমি 'আমি' ও 'শরীর' বলছ। এ দু'টির মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। তুমি তবে শরীর নও। প্রশ্নটা শরীরের নয় কারণ সেটা জড়। এমন সময় আছে যখন তুমি শরীর সম্বন্ধে সচেতন নও—অর্থাৎ সুষুপ্তিতে। তখন এ প্রশ্ন ওঠে না। তা সত্ত্বেও সেই সুষুপ্তিতে তুমি থাকো। তবে এখন প্রশ্নটা কার উঠছে?

ভ—অহংকারের।

ম—হাঁ। শরীর ও অহংকার এক সঙ্গে ওঠে আর লয় হয়। সুষুপ্তিতে এমন একটা সময় আছে যখন তুমি অহংকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

নও। এখন তুমি অহংকার-যুক্ত। এই দু'টি অবস্থার মধ্যে কোনটা তোমার প্রকৃত অবস্থা? তুমি সুষুপ্তিতে ছিলে আর সেই 'তুমিই' এখন আছ। তবে এখন সংশয় হচ্ছে আর তখন কেন হয় না? তোমার কথা ঠিক যে এটা অহংকারের জন্য হয়। তুমি অহংকার নও। অহংকারটা আত্মা ও শরীরের মধ্যে একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা। তুমি আত্মা। এই অহংকারের উৎস খোঁজো আর দেখো সংশয় থাকে কিনা।

শ্রীভগবান কয়েক মিনিট পরে যোগ করলেন—

শাস্ত্র অনুসারে উত্তর হবে শরীরটা কর্মের ফল। প্রশ্ন হবে কর্ম কোথা থেকে এল? আমাদের বলতে হবে "আগের জন্মের" ইত্যাদি ইত্যাদি আর এর শেষ নেই। কোন অজানা অনুমানের ওপর নির্ভর না করে সোজাসুজি সমাধানের প্রণালী "এটা কার কর্ম বা কার শরীর?" জিজ্ঞাসা করা। সেজন্য আমি এভাবে উত্তর দিলাম। এটাই বেশী কার্যকরী।

১৪ই আগস্ট, ১৯৩৮

৫০২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীযুক্ত যমনালাল বাজাজ আরও কয়েকজনের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করতে এসেছেন।

১৬ই আগস্ট—শ্রীযুক্ত জে. বি-র প্রশ্ন—

কি করে মনকে স্থায়ীভাবে সদ্‌বুদ্ধিতে রাখা যায়?

ম—সকল প্রাণীই তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন অতএব সবারই বুদ্ধি আছে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বুদ্ধিতে কিছু পার্থক্য আছে কারণ মানুষ কেবল জগৎ যা তাই দেখে না আর সেই অনুসারে কাজ করে না, উপরন্তু তার কামনাও পূর্ণ করতে চায় এবং সে তার বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। তার কামনা পূর্ণ করার প্রচেষ্টায় সে তার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করলেও তা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তখন সে ভাবে ও বিচার করে।

স্থায়ী আনন্দ ও শান্তি লাভের ইচ্ছা এরূপে তার নিজের স্বরূপের নিত্যতা প্রমাণ করে। সেটা পেলেই সব পাওয়া হয়ে যায়।

এরূপ আন্তর অনুসন্ধানের পথই মানুষের বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ অভ্যাসে বুদ্ধি অনুভব করে যে তার ক্রিয়া একটা উচ্চশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত হচ্ছে। সে সেই শক্তির কাছে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং একটা অবস্থায় তার ক্রিয়া থেমে যায়। এরূপে যখন তার ক্রিয়া থেমে যায় তখন সেই পরম শক্তিই একমাত্র থাকে। সেটাই আত্মোপলব্ধি ; সেটাই চরম ; সেটাই লক্ষ্য।

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেবল উচ্চশক্তির কাছে তার অধীনতা স্বীকার করা আর সে যে তাকে লাভ করতে পারে না সেটা জানা। সুতরাং লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে তার (বুদ্ধির) নাশ হওয়া চাই।

ভ—একটা শ্লোক উদ্ধৃত করলেন যার অর্থ, "আমি রাজ্য ইত্যাদি চাই না কেবল চিরকাল তোমার সেবা করতে চাই, এতেই আমার পরমানন্দ" ঠিক কি না ?

ম—হাঁ, যতক্ষণ বিষয়ী ছাড়া বিষয় বলে কিছু আছে (দ্বৈতবোধ) ততক্ষণ কামের (কামনার) স্থান আছে। যদি বিষয় না থাকে, কামও নেই। কামনাহীন অবস্থাই মোক্ষ। সুষুপ্তিতে কোন দ্বৈতবোধ নেই আর কোন কামনাও নেই। অন্যপক্ষে জাগ্রত অবস্থায় দ্বৈতবোধ আছে আর কামনাও আছে। দ্বৈতবোধ থাকার জন্য বিষয়কে পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। এটা বহির্মুখী মন, এটাই দ্বৈতবোধ ও কামনার মূল। যদি একজন জানে যে আনন্দটা আত্মা ছাড়া আর কিছু নয় তবে মন অন্তর্মুখী হয়। যদি আত্মা লাভ হয় তবে সব কামনাই পূর্ণ হয়। এটাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'আপ্তকামং আত্মকামং অকামশ্চ' (কামনাপূর্তি)—সেটাই মোক্ষ।

এখানে জে. বি. তাঁর কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনি সদ্‌বুদ্ধি বলতে বুদ্ধি বলেন নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে

কি করে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৎ ও ন্যায় পথে মনকে স্থির সঙ্কল্প করা যায়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন এই দৃঢ়তা কি করে লাভ করা যায়।

ম—সর্বোত্তম লক্ষ্য লাভ করতে হলে যা আবশ্যক তা হল ব্যক্তিত্বের নাশ। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের সহগামী। ভাল ও মন্দ বুদ্ধির নাশ হলে ব্যক্তিত্বের নাশ হয়। অতএব প্রশ্ন ওঠে না।

ভ—কিন্তু একজনকে সদ্‌বস্তু জানতে হবে, সৎপথ খুঁজে নিতে হবে, সদ্‌ধর্ম পালন করতে হবে আর তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে হবে। নতুবা সে নষ্ট হয়ে যাবে।

ম—অটলভাবে সদভিমুখী থাকলে প্রকৃত শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ভ—বাধা আসে। একজনের পথের বাধা দূর করার উপযুক্ত শক্তি কি করে লাভ হয়?

ম—ভক্তি ও তার সঙ্গে সাধুসঙ্গের দ্বারা।

ভ—একটু আগে মোক্ষ লাভের জন্য ব্যক্তিত্ব নাশের কথা বলা হয়েছে। এখন ভক্তি ও সৎসঙ্গ উপায় বলা হচ্ছে। এতে কি 'আমি ভক্ত' 'আমি সৎসঙ্গী'রূপ ব্যক্তিতা থাকে না?

ম—উপায়টা সাধককে দেখানো হল। সাধকের নিশ্চয় এ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের নাশ হয় নি। নতুবা প্রশ্ন উঠত না। সাধকের ব্যক্তিত্ব নাশের জন্য পথ দেখানো হয়েছে। এজন্য এটা যথাযথ।

ভ—স্বরাজের কামনা কি সৎ?

ম—নিঃসন্দেহে এরূপ ইচ্ছা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই শুরু করা হয়। তবু বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কর্ম করা কালে দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটা বিস্তার হয় যার ফলে ব্যক্তিত্ব সমগ্র দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিত্বের বিস্তার বাঞ্ছনীয় যার ফলে তৎসংক্রান্ত কর্ম নিষ্কাম হয়।

ভ—যদি বহু কষ্টে ও বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে স্বরাজ লাভ হয় তবে কি সেই ব্যক্তির তাতে আনন্দিত ও গর্বিত হওয়া ন্যায্য নয়?

ম—সে নিশ্চয় তার কর্ম করা কালে কোন সময়ে উচ্চশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল যার শক্তিমত্তার বিষয় সর্বদাই স্মরণ ও দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে। তবে আর সে গর্বিত হবে কি করে? এমনকি সে ফলের জন্যও গ্রাহ্য করে না। তবেই কর্ম নিষ্কাম হয়।

ভ—কি করে কর্মীর নির্ভুল সততা সুনিশ্চিত করা যায়?

ম—সে যদি নিজেকে ঈশ্বর কিংবা গুরুর কাছে সমর্পণ ক'রে থাকে তবে যার কাছে সমর্পণ করেছে সেই শক্তিই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে। কর্মীর আর পথের ন্যায়পরতা বা অন্য কিছুর সম্বন্ধে চিন্তা করার কিছু নেই। যদি সে তার গুরুর প্রতিটি আদেশ পালনে সক্ষম না হয় তবে সংশয় জাগে।

ভ—পৃথিবীতে কি এমন কোন শক্তি নেই যে তার ভক্তদের প্রতি কৃপা করতে পারে যাতে তারা শক্তিমান হয়ে দেশের কাজ ও স্বরাজ লাভ করতে পারে? (শ্রীমহর্ষি নীরব রইলেন। এর কারণ তিনি পরে বলেছিলেন যে সেরূপ শক্তি আছে।)

ভ—দেশের প্রাচীন মহাত্মাদের তপস্যার ফল কি বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সাহায্যের জন্য পাওয়া যাবে না?

ম—এটা আছে, কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে কেউ এর একমাত্র স্বত্বাধিকার দাবী করতে পারে না। এই আনুকূল্য সবাই সমানভাবে ভোগ করে। (একটু থেমে) এরূপ কোন গুরুবল ছাড়াই কি আজকের জাগরণ এসেছে? (এখানে শ্রীভগবান বললেন যে ১৮৯৬ সালে তাঁর তিরুভন্নমালাই আসার পূর্বে ভারতে কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। কেবল দাদাভাই নওরোজী একজন সংসদ সদস্য হয়েছিলেন।)

অল্পক্ষণ নীরব থাকার পর জে. বি. বললেন—"শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ এমন মহৎ, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী কর্মী, তিনি দেশের জন্য তাঁর অত্যন্ত লাভজনক কর্ম ত্যাগ করেছেন। দেশেরও তাঁকে প্রয়োজন আছে। তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর সুস্থ নয় সর্বদাই দুর্বল ও অসুস্থ।

দেশের এরূপ মহৎ সন্তানের জন্য এরূপ নিষ্ঠুরতা কেন?

(শ্রীমহর্ষি কেবল তাঁর অনবদ্য হাসিটি হাসলেন)

১৭ই আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৩। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক শ্রীজে· এম· লোরে আশ্রমে প্রায় দু'মাস আছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—

আজ রাত্রে আমি চলে যাচ্ছি। এখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাকে আমেরিকা যেতে হবে। আমি মহর্ষির কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করছি। আমি আমাকে যা জানি তিনি আমাকে তার থেকে ভালভাবে জানেন। সুতরাং আমি যখন গুরুর থেকে দূরে থাকব সে সময়ে আমায় উৎসাহিত করার জন্য তাঁর কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করি।

ম—তুমি যা কল্পনা করছ গুরু বাইরে, তা নয়। তিনি 'অন্তরে', বস্তুতঃ তিনি আত্মা। এই সত্যটি অনুভব কর। অন্তরে খোঁজো আর সেখানেই তাঁকে লাভ কর। তবেই তোমার তাঁর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ থাকবে। বাণী সব সময়ে আছে, এ কখনই নীরব নয়; এ তোমাকে কখন ত্যাগ করে না কিংবা তুমি কখন গুরুর কাছ থেকে চলে যেতে পারো না।

তোমার মন বহির্মুখী। এই প্রবণতার জন্য সে বিষয়কে বাইরে দেখে আর তার মধ্যে গুরুকেও দেখে। কিন্তু সত্য এর বিপরীত। গুরুই আত্মা। মনকে অন্তর্মুখীন কর আর দেখবে যে বিষয় অন্তরে। আরও দেখবে, যে তোমার আত্মা সেই তোমার গুরু আর তিনি ছাড়া কিছুই নেই।

যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর সেজন্য তুমি বিষয়গুলোকে বাইরে বলে ধরে নিয়েছ। কিন্তু তুমি কি শরীর? তুমি তা নও। তুমি আত্মা। 'সেখানেই' সব বিষয় ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

রয়েছে। কিছুই আত্মার অতিরিক্ত নয়। যে গুরু তোমারই আত্মা তাঁর কাছ থেকে দূরে যাবে কি করে? তোমার শরীরটা এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাচ্ছে ধরে নিলেও সে কি কখন আত্মা থেকে দূরে যায়? অনুরূপভাবে তুমি কখনই গুরু ছাড়া নও।

শ্রীলোরে যদিও মহর্ষির ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত তথাপি এই উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমনকি স্পষ্টতঃই অভিভূত হল। সে প্রার্থনা করলে যে শ্রীভগবানের কৃপা যেন তার ওপর সর্বদা থাকে।

শ্রীভগবান—গুরু আত্মা হওয়ায়, কৃপা আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শ্রীএল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীমহর্ষিকে প্রণাম করলে আর প্রার্থনা করলে যে তার যেন সত্য লাভ হয়।

ম—এমন কোন মুহূর্ত আছে কি যখন তুমি আত্মাকে না জেনে আছ? তুমি কি কখন আত্মা ছাড়া থাকতে পারো? তুমি সর্বদাই 'তাই'।

ভ—আপনি মহান গুরু জগতে আনন্দ ও শান্তি প্রসারিত করছেন। আপনার করুণার সীমা হয় না কেন না আপনি মানব দেহ ধারণ করে জগতে রয়েছেন! কিন্তু আমি একটা কথা জানতে চাই যে দেশের উপকার করা ও জননেতা হওয়ার আগে আত্মজ্ঞান লাভের আবশ্যকতা আছে কিনা।

ম—আগে আত্মজ্ঞান লাভ কর আর বাকী সব আপনি হবে।

ভ—আমেরিকা শিল্প-বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও নানা বিষয়ে এখন সর্বগরিষ্ঠ। সে কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও এরূপ উন্নতি করবে?

ম—নিশ্চয়ই, এটা হতেই হবে।

ভ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এটা হবে! আমি একটা যন্ত্রশিল্প সংস্থার অংশীদার। কিন্তু এটা আমার জীবনের অত্যাবশ্যক ব্যাপার

নয়। আমি আমার সংস্থার দৈনন্দিন কাজে আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্প্রসারের চেষ্টা করি।

ম—বেশ ভাল। তুমি যদি নিজেকে উচ্চশক্তির কাছে আত্মসমর্পন কর তবে সবই ঠিক আছে। সেই শক্তি তোমার সব ভার নেবেন। কেবল যতক্ষণ তুমি নিজেকে কর্তা মনে কর ততক্ষণ তুমি তার (কর্মের) ফল ভোগ করতে বাধ্য। অন্যপক্ষে তুমি যদি সমর্পণ কর আর তোমার ব্যক্তিসত্তাকে সেই উচ্চশক্তির হাতের একটা যন্ত্র মনে কর, সেই উচ্চশক্তি তোমার কর্মফল সমেত সব ভার নেবেন। তোমাকে আর তার জন্য ভাবতে হবে না আর কাজ স্বতঃই নির্বিঘ্নে হবে। তুমি সেই শক্তিকে স্বীকার কর বা না কর নিয়ম বদলায় না। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন হয়। তুমি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করার সময়ে মাথায় বোঝা বইবে কেন? রেলগাড়ী তোমাকে ও তোমার বোঝা, সেটা তোমার মাথায় কিংবা গাড়ীর মেঝেতে থাক, নিয়ে যাবে। তুমি সেটা মাথায় রেখে গাড়ীর কিছু ভার লাঘব করছ না বরং অকারণে নিজের কষ্ট বাড়াচ্ছ। জগতের লোকেদের কর্তৃত্ববোধও এরূপ।

ভ—আমি দর্শন সম্বন্ধে গত কুড়ি বছর যাবৎ আলোচনা করছি। কিন্তু অন্যেরা যেরূপ দাবী করে সেরূপ কোন অলৌকিক কিছু অনুভব করিনি। আমার দূরশ্রবণ বা দূরদর্শন ইত্যাদি কোন শক্তি লাভ হয়নি। আমি নিজেকে এই শরীরে বদ্ধ হয়ে আছি ছাড়া আর কিছু অনুভব করি না।

ম—ঠিক আছে। সত্য কেবলমাত্র এক আর সেটা আত্মা। বাকী আর সব তার ওপর, তার দ্বারা, তারই ব্যাপারমাত্র। দ্রষ্টা, বিষয় ও দৃক্‌শক্তি সবই কেবল আত্মা। কেউ কি আত্মাকে বাদ দিয়ে দেখা বা শোনার কাজ করতে পারে? কাছের কিছু শোনা বা দেখা আর বহুদূরের কিছু শোনা বা দেখার মধ্যে কি পার্থক্য? দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় সুতরাং মনেরও দরকার হয়।

কোন ক্ষেত্রেই এদের ত্যাগ করা যাবে না। যেকোন ভাবেই হোক সেখানে অধীনতা রয়েছে। তবে দূরশ্রবণ ও দূরদর্শনের জন্য মোহ কিসের ?

তাছাড়া যা লাভ করা যায়, কালে তা নষ্ট হয়ে যায়। এরা স্থায়ী হতে পারে না।

একমাত্র স্থায়ী বস্তু সত্য আর সেটাই আত্মা। তুমি বল 'আমি আছি', 'আমি যাচ্ছি, 'আমি বলছি', 'আমি করছি' ইত্যাদি। এদের সবগুলোতে আমি ও আছির মধ্যে একটা সংযোজক চিহ্ন (-) দাও। (আই অ্যাম্, আই অ্যাম্ গোয়িং, আই অ্যাম্ টকিং, আই অ্যাম্ ডুইং, এখন আই ও অ্যাম্ এর মধ্যে হাইফেন দাও। আই-অ্যাম্।) এরূপে আমি-আছি। 'এটাই' স্থায়ী ও মৌলিক সত্য। এই সত্যই ঈশ্বর মুসাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, "আমি আছি যা আমি-আছি।" "শান্ত হও আর জানো যে 'আমি-আছি'ই ঈশ্বর।" সুতরাং 'আমি-আছি'ই ঈশ্বর।

তুমি জানো যে তুমি আছো। তুমি তোমার অস্তিত্ব কোন মুহূর্তে অস্বীকার করতে পারো না। কারণ অস্বীকার করার জন্যও তোমায় থাকতে হবে। তোমার মনকে শান্ত করলে এটা (বিশুদ্ধ অস্তিত্ব) জানা যায়। মনটাই ব্যক্তির বহির্মুখী বৃত্তি। যদি সেটা অন্তর্মুখীন করা যায় তবে সময়ে 'শান্ত' হয় আর সেই 'আমি-আছি'ই অবশিষ্ট থাকে। 'আমি-আছি'-ই পূর্ণ সত্য।

ভ—আমি আনুপূর্বিক উত্তরটির মর্ম উপলব্ধি করছি।

ম—কে সেখানে কি উপলব্ধি করার জন্য রয়েছে ?

হৃদয় সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন। শ্রীভগবান বললেন—ডান বা বাঁয়ের কথা ছেড়ে দাও। এটা শরীর সংক্রান্ত। হৃদয়ই আত্মা। এটা উপলব্ধি কর আর তাহলে তুমি নিজেই দেখতে পাবে। (শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রণাম ক'রে শ্রীলোরে বিদায় নিলে।)

১৮ই আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৪। একজন দর্শনার্থী শ্রীঅরবিন্দের 'অধিমানস' 'অতিমানস' 'চৈত্য' 'দিব্য' পরিভাষা সম্বন্ধে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে।

ম—আত্মা বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। এই সব পার্থক্য দূর হয়ে যাবে।

৫০৫। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বললেন—আমি মহাত্মা গান্ধীজীর অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছি, আমায় শীঘ্রই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। শ্রীভগবান কি আমাকে তাঁর জন্য কোন বাণী দেবেন ?

ম—অধ্যাত্ম শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ ক'রে তাঁকে পরিচালিত করছে। এই যথেষ্ট। আর বেশী কি দরকার ?

১৯শে আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৬। 'সদ্‌বিদ্যা'র প্রথম শ্লোকটি ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীভগবান বললেন—সৎ-ই (সত্তাই) চিৎ (অখণ্ড জ্ঞান), আর চিৎ-ই সৎ ; যা আছে একটাই আছে। নতুবা জগতের জ্ঞান ও নিজের সত্তা অনুভব অসম্ভব হবে। এর অর্থ উভয়ই সত্তা ও জ্ঞান। যাহোক দু'টিই এক। অপরপক্ষে এটা যদি কেবল সৎ হয় আর চিৎ না হয়, এরূপ সৎ কেবল জড়। এটাকে জানতে হলে আর একটা চিৎ-এর প্রয়োজন হবে ; এরূপ চিৎ-এর অস্তিত্বও সৎ ব্যতীত থাকতে পারে না। তথাপি একে থাকতেই হবে। এখন চিৎকে সৎ বলে ধরা হলে, সৎ জড় হওয়ায় চিৎও জড় হয়ে যায়, যা হতে পারে না। আবার তাকে জানতে আরও একটি চিৎ-এর প্রয়োজন হবে। এটাও অসম্ভব।

অতএব সৎ ও চিৎ একই।

২২শে আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৭। একজন আর্যসমাজী ভদ্রলোক আর একজন সঙ্গীর সঙ্গে বাঙ্গালোর থেকে শ্রীভগবানের দর্শনার্থে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—

যোগ-অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কি? এটা কি ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা বিশ্বের উপকারার্থে করা হয়?

ম—যোগের অর্থ দু'টি বস্তুর সংযোগ। তারা কি? খোঁজো। প্রয়োজন বা উপকার কোন একটা কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে। সেটা কি? খোঁজো।

ভ—জাতিভেদ কি থাকা উচিত?

ম—এরূপ ভেদটা দেখছে কে? খুঁজে দেখো।

ভ—আমি দেখছি এই আশ্রমে এটা পালন করা হয়। খুব সম্ভব শ্রীভগবানের বিনা অনুমোদনে অন্যেরা এখানে এটা মানে।

ম—তুমি কে যে অন্য ইত্যাদি বলছ? তোমার সুষুপ্তিতে কি অন্য ইত্যাদি লক্ষ্য করেছিলে?

ভ—আমি একজন ব্যক্তি। আমি আমার সুষুপ্তিতে অন্যদের না দেখতে পারি কিন্তু আমি এখন তাদের দেখছি।

ম—তুমি যে দেখো এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে এখন দেখে আর যে সুষুপ্তিতে দেখে না সে কেবল তুমি—একই ব্যক্তি। তুমি কেন এখন ভেদ দেখে নিজেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে? সুষুপ্তির সময়ে যেমন ছিলে তাই থাকো।

ভ—তা হতে পারে না। আমি এখন দেখছি পক্ষান্তরে আমি সুষুপ্তিতে এটা দেখি না। তারজন্য যা রয়েছে তার কোন পার্থক্য হয় না।

ম—দ্রষ্টা ছাড়া কি বস্তু থাকে?

ভ—তাদের অস্তিত্ব দ্রষ্টা নিরপেক্ষ।

ম—তুমি তারা আছে বল, না, তারা এসে তোমায় বলে যে তারা আছে ?

ভ—আমি জানি যে তারা আছে।

ম—সুতরাং এটা কেবল তোমার জানা। তাদের অস্তিত্ব পারমার্থিক নয়।

ভ—আমি না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকবে।

ম—তাদের সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান না থাকলেও তুমি তাদের অস্তিত্ব দাবী করছ ? (হাস্য)

ভ—ব্রহ্ম সবার মধ্যে আছে। সেখানে কোন ভেদ নেই। জাতিভেদ উচ্চনীতির পরিপন্থী।

ম—ব্রহ্মকে টেনে আনছ কেন ? তাঁর কোন অভিযোগ নেই। যার অভিযোগ আছে সেই-ই ব্যাপারটার খোঁজ করুক।

ভ—আপনি একজন মহাত্মা। আপনি জাতিভেদ স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু লোকেরা কেন এখানে ভেদটা মানে ?

ম—আমি কি তোমায় বলেছি যে আমি একজন জ্ঞানী বা একজন মহাত্মা ? তুমি নিজেই এটা বলছ। কিংবা আমি এই জাতির ব্যাপারে কোন অভিযোগ করিনি।

ভ—পরমাত্মা সবার মধ্যে আছেন।

ম—এসব নাম কেন আনছ ? তাঁরা তাঁদের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁরা তোমার সাহায্য চান না।

ভ—মহাত্মা গান্ধীও সমত্ব স্বীকার করেন···।

ম—গান্ধী এখানে নেই।

ভ—অরবিন্দ জাতি মানেন না। আপনি কি অনুমোদন করেন ?

ম—অরবিন্দের কথা তুমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমার মত যাই হোক না কেন তাতে তোমার কি এসে যায় ? এটা তোমার কি কাজে লাগবে ? তোমার এ সম্বন্ধে কি কোন মতামত আছে? সেটাই তোমার কাজে লাগবে, অন্যদের মত নয়।

ভ—আমি জাতিভেদ প্রথা মানি না। মহাত্মাদের মতামত উপদেশ হিসাবে মূল্যবান। আমার প্রচেষ্টার জন্য আমি আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।

ম—মহাত্মা তোমাকে বলছেন যে নিজেকে খোঁজো আর লাভ কর। তুমি তা করবে না অথচ তাঁর আশীর্বাদ চাইছ।

ভ—আমি উপদেশ পালনের চেষ্টা করছি। কিন্তু জাতিভেদ বেদনাদায়ক। এটা যাওয়া উচিত।

ম—কার পক্ষে বেদনাদায়ক ?

ভ—সমাজের জনগণের…।

ম—তুমিই এটা বলছ। এমন দেশ আছে যেখানে জাতিভেদ নেই। তাদের কি কোন কষ্ট নেই ? যুদ্ধ, পরস্পর বিধ্বংসকারী হানাহানি ইত্যাদি রয়েছে। তুমি সেই অন্যায়গুলো দূর কর না কেন ?

ভ—এখানেও অসঙ্গতি রয়েছে।

ম—পার্থক্য সব সময়ে আছে, কেবল মানুষ নয় জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদিতেও আছে। এই ব্যাপারটা এড়ানো যাবে না।

ভ—বর্তমানে জীবজন্তুদের কথা ভাবছি না।

ম—কেন নয় ? তারা যদি কথা বলতে পারত তারাও তোমার সঙ্গে সমতা দাবী করত আর যে কোন মানুষের থেকে কিছু কম উগ্রভাবে তোমার কথার বিরোধিতা করত না।

ভ—কিন্তু আমরা কি করতে পারি। এটা ঈশ্বরের সৃষ্টি।

ম—যদি ওটা ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, অপর অংশটা তোমার তৈরী, তাই তো ?

ভ—এটা মানুষের সৃষ্ট বিভেদ।

ম—তোমার ভেদ দেখার দরকার কি ? জগতে বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা একতা আছে। আত্মা সবার সমান। আত্মায় কোন পার্থক্য নেই, যা কিছু পার্থক্য সব বাইরের ওপরভাসা। তুমি একত্বকে খোঁজো আর আনন্দ লাভ কর।

বৈচিত্র্যের দুঃখ একত্ব দেখার আনন্দে মিটে যাবে। তাছাড়া একজন রাজা একজন ভৃত্যেরও ছদ্মবেশ নিতে পারে। তাতে ব্যক্তিসত্তার কোন পার্থক্য হয় না।

ভ—পার্থক্যে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উচ্চমন্যতাই অন্যায়।

ম—একজনের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও পার্থক্য আছে। পা-টা ছুঁলে হাতটা দূষিত হয় না। প্রত্যেক অঙ্গ নিজের নিজের কাজ করে। পার্থক্যের জন্য আপত্তি করছ কেন?

ভ—লোকে জাতিভেদে অবিচার অনুভব করে। এর মূলোৎপাটন করা উচিত।

ম—যেখানে কোন ভেদ দর্শন নেই তুমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে পৌঁছে সুখী হতে পারো। তুমি জগৎ সংস্কার করার আশা কি করে করতে পারো? চেষ্টা করলেও পারবে না। কাব্যকণ্ঠ গণপতি. শাস্ত্রী হরিজনদের মন্ত্র দিতে চেয়েছিল আর তাদের ব্রাহ্মণ করবে বলেছিল। কিন্তু হরিজনেরাই সেটা নিতে এগিয়ে এল না। তাতেই বোঝা যায় যে তারা হীনমন্যতায় ভুগছে। অন্যকে সংস্কার করার আগে এটা দূর কর।

অধিকন্তু যেখানে এসব প্রথা মানা হয় সেখানে যাও কেন? আর নিজেকে দুঃখ দাও কেন? যেখানে এসব নেই সেখানে গিয়ে সুখী হও না কেন?

গান্ধীজীও সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। তিনিও নীচু জাতির হীনমন্যতার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের মত কারও ওপর জোর করে খাটাতে পারেন না। তিনি অহিংসা পালন করেন। সুতরাং ব্যাপারটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে।

ভ—আমাদের জাতিভেদ প্রথা দূর করার জন্য কাজ করা উচিত।

ম—তবে কর। তুমি যদি জগতে কৃতকার্য হও তবে দেখো এখানেও এটা থাকে কিনা

ভ—এটাই সেই প্রথম স্থান হওয়া উচিত যেখানে আমি সংস্কার করতে চাই।

ম—তুমি সংস্কারের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করছ কেন? ঘুমিয়ে পড়ো। আর দেখো সেখানে কোন পার্থক্য আছে কিনা। সেখানে বিনা চেষ্টায় তুমি সব পার্থক্য দূর্ করে ফেলবে। (হাস্য)

২৪শে আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৮। একজন ভারতীয় আই. সি. এস. কর্মকর্তা হলঘরে কয়েক-ঘণ্টার জন্য ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে—"অহিংসা কি জগতের যুদ্ধ দূর করতে পারে?" শ্রীভগবান কোন উত্তর দিলেন না আর তখন সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য বাইরে যাওয়ার সময় হয়েছিল। পরের দিন আর একজন সেই প্রশ্নটা পুনরায় করলে শ্রীভগবান বললেন যে প্রশ্নেই উত্তর আছে। পূর্ণ অহিংসায় কোন যুদ্ধ নেই, এটা জানা কথা।

২৬শে আগস্ট, ১৯৩৮

৫০৯। শ্রীম্যাক্ইভারের সঙ্গে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হল আর সে দীক্ষা সম্বন্ধে বললে।

শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দীক্ষা কি?" কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "দীক্ষা অনেক রকম, মন্ত্রের দ্বারা, চক্ষুর দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা ইত্যাদি দীক্ষা হয়।"

ভ—ভগবানের মৌন দীক্ষা, তাই না?

ম—হাঁ, এটাই সর্বোত্তম দীক্ষা।

ভ—এটা কি কেবল বিচারমার্গের পক্ষে খাটে?

ম—সব মার্গই বিচারমার্গের অন্তর্গত।

ভ—হাঁ, কিন্তু একজন যদি এগুলো পৃথক পৃথক ভাবে করতে চায় তবে এটা খাটবে না। খাটবে কি?

ম—না।

ভ—মনে করুন একজনের আত্মজ্ঞানের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়, এগুলো সহায়ক মার্গের অন্তর্গত মনে করতে হবে। তারা কি তাই নয়?

ম—হ্যাঁ।

ভ—এর জন্য অন্য দীক্ষাও প্রয়োজন হবে?

ম—হ্যাঁ।

ভ—এই থেকে আরও একটা প্রশ্ন ওঠে—যতক্ষণ আমি ভগবানের শ্রীচরণে রয়েছি ততক্ষণ আমায় একজন বিশ্বাসী খ্রীস্টান বলা যাবে না।

শ্রীভগবান বাধা দিয়ে বললেন যে এটাই খ্রীস্টীয় ধর্মের সার সংগ্রহ।

ভ—হ্যাঁ, কিন্তু বর্তমান যাজক শ্রেণীর চোখে নয়। সে অনুসারে আমি আর যাজকদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি না। আমি কি অন্য স্থানে সাহায্য নেওয়ার অনুমতি পেতে পারি?

ম—এটা তোমার ওপর নির্ভর করে।

একটুক্ষণ নীরবতার পর শ্রীভগবান বললেন যে যারা এখানে আসে তারা যেন একটা রহস্যময় শক্তির দ্বারা নীত হয়, সেই তাদের ভার নেবে। কথাবার্তা এরপরই প্রায় শেষ হয়ে গেল।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১০। শ্রীটি. কে. এস. আইয়ার একটা বই পড়লে; সেখানে অন্তঃকরণকে পাঁচ ভাগে বিভাজিত করা হয়েছে—

(১) উল্লম্, (২) মন, (৩) বুদ্ধি, (৪) চিত্ত ও (৫) অহংকার।

শ্রীভগবান বললেন সাধারণতঃ চারটি ভাগ করা হয়। পঞ্চম উল্লম্‌কে পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে মেলাবার জন্য আনা হয়েছে।

(১) উল্লম্ (চেতনা)—আকাশতত্ত্ব, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে ভ্রূমধ্য অবধি।

(২) মন (চিন্তাশক্তি)—বায়ুতত্ত্ব, ভ্রূমধ্য হতে কণ্ঠ।

(৩) বুদ্ধি (বিচারশক্তি)—অগ্নিতত্ত্ব, কণ্ঠ থেকে হৃদয়।

(৪) চিত্ত (স্মৃতিশক্তি)—অপতত্ত্ব, হৃদয় থেকে নাভি।

(৫) অহংকার (অহংবৃত্তি)—পৃথ্বীতত্ত্ব, নাভি থেকে মেরুদণ্ডের প্রান্ত অবধি।

এরূপে উল্লম্ শুদ্ধ মন বা মনের শুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ চিন্তা-শূন্য মন। এটি মনের আকাশ, চিন্তা দ্বারা অকলুষিত মনের ব্যাপ্তির সমপর্যায়। যখন একজন ঘুম থেকে ওঠে তার মাথা উঁচু হয়ে ওঠে আর একটা চেতনার বোধ জাগে। এই বোধ পূর্বেই হৃদয়ে ছিল সেটা পরে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে চেতনারূপে অনুভূত হয়। কিন্তু অহংকার না ওঠা অবধি এর কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। এই নির্বিশেষ অবস্থায় এটা বিশ্বাতীত (বিশ্বাতীত মন বা বিশ্বাতীত চেতনা)। এই অবস্থাটা সাধারণতঃ অতি অল্পক্ষণ থাকে আর অলক্ষ্যে চলে যায়। এটাই অহংকারের অনধিকার প্রবেশের ফলে বিশেষিত ও বিশ্লেষিত হয় আর লোকটি বলে 'আমি'। এটা সব সময়ে কোন একটা বস্তুর সংযোগে সাধিত হয় (এখানে শরীর)। সুতরাং শরীরকেই 'আমি' বলে মনে হয় আর সবই তাকে অনুসরণ করে।

উল্লম্ (শুদ্ধ মন) প্রতিফলিত চৈতন্য হওয়ার জন্য একে চন্দ্র বলা হয়। মূলবোধটি হৃদয়ে থাকে, তাকে সূর্য বলা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১১। মেজর চাডউইক "ন কর্মণা ন প্রজয়া…" শ্লোকটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছে। শ্রীভগবান তার অর্থ বলছিলেন। 'ব্রহ্মলোক'কে আত্মলীন (সাবজেক্টিভ) ও বিষয়লীন (অবজেক্টিভ) দু'ভাবেই অর্থ করা যায়। শেষের অর্থে, যে শাস্ত্রে এই শ্লোকের কথা

আছে তাতে বিশ্বাস থাকা চাই। অপরপক্ষে প্রথম অর্থে এটা কেবল একটা অনুভূতি আর তার জন্য বাইরের কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। 'ব্রহ্মলোকে'র অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার। 'পরান্তকাল' অপরান্ত কালের বিপরীত। শেষেরটিতে জীব পুনর্জন্ম নেওয়ার জন্য বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। তাদের বিস্মৃতি অবিদ্যার আবরণে ঘেরা। 'পরা' শরীরের অতীত। 'পরান্তকাল' দেহ ইত্যাদি চেতনার অতীত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান। 'পরামৃতাৎ প্রকৃতেঃ'—প্রকৃতির অতীত। 'সর্বের' অর্থ সকলেই জ্ঞান ও মোক্ষলাভের অধিকারী। "যতয়ঃ—যমনিয়ম সমেতঃ সংপুরুষঃ"—সংযত সৎব্যক্তি। সমগ্র অংশটার অর্থ অসৎ হতে সৎ-এ যাওয়া।

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি ॥১

বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥ ২

দহ্র বিপাপং পরমেশ্মভূত
যৎ পুণ্ডরীকং পুর মধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রে গগনং বিশোকং
তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ॥ ৩

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো
বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।

তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ
স মহেশ্বরঃ ॥ ৪

অমৃতত্ব নহে লভ্য, কর্মে, পুত্রলাভ, ধনে
ত্যজি এসবারে কেহ লভে যে তাহারে।
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ (সৎ) একক স্ব-ভাস্বর
লভে যতি তারে হৃৎ-গুহায় নিহিত ॥ ১

বেদান্ত বিজ্ঞান জ্ঞান সুনিশ্চিত করি,
সন্ন্যাস যোগারাধনায় শুদ্ধ সত্ত্ব যতি।
পরম-অমৃত লভি, জ্ঞানে দেহ ত্যজি,
সকল বন্ধন মুক্ত, লভে ব্রহ্মলোক ॥ ২

দেহমধ্যে হৃদ্‌পদ্মে নিষ্পাপ আকাশ
তার সূক্ষ্মতম সুষিরে ব্রহ্মের স্থান।
সেই সূক্ষ্মছিদ্রের বিশোক গগনে
অন্তর্লীন যে রয়েছে সেই তো উপাস্য ॥ ৩

বেদের আদিতে স্বরঃরূপে যে কথিত
সকল বেদান্ত যারে করে প্রতিষ্ঠিত।
প্রকৃতি যাহাতে করে আপনারে লীনা
তাহারেই জানো তুমি মহান্ ঈশ্বর ॥ ৪

শ্রীটি. কে. এস. আইয়ার মুক্তলোক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে। শ্রীভগবান বললেন এর অর্থ ব্রহ্মলোক।

ভ—এই লোক লাভ করতে হলে কোন সূক্ষ্মতনু (সূক্ষ্ম শরীর) যথা প্রণবতনু বা শুদ্ধতনুর প্রয়োজন আছে কিনা।

ম—প্রণবই প্রকৃত জপ। যা হোক একে অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বা বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। নাদ ও বিন্দু—প্রাণ ও মন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ তিনটি মন্ত্র ও তুরীয় মন্ত্রের কথা বলে। বাস্তবিক আশয়, এটাই প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক।

আরও প্রশ্ন করা হলে মহর্ষি উত্তর দিলেন—বলা হয় পঞ্চ পদমহাবাক্যানি (পাঁচ অক্ষরের মহাবাক্য) অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি অতি নিজম্' (তুমি হও তাই এই মহান সত্য) আছে। প্রথম তিনটি শব্দে লক্ষ্যার্থ (তাৎপর্য) সন্নিহিত আছে; এদের সবগুলোই এক সত্যকে সূচিত করে। অস্তিত্বহীন অবিদ্যা নিবারণের জন্য কত যে চেষ্টা আর কতই যে সাধন প্রণালী আছে!

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১২। শ্রীভগবান বললেন—সবাই মনচেতনাকে আত্মচেতনা বলে ভুল করে। সুষুপ্তিতে মন নেই; কিন্তু কেউ ঘুমে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এমনকি একটি ছোট ছেলেও জেগে উঠে বলে "আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম" আর তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। 'আমি' জেগে ওঠে, মন পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্মুখী হয় আর বস্তু দেখে, একে ওরা প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'আমি' কি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, ওরা হতবুদ্ধি হয়ে যায় কারণ 'আমি' নিজেকে একটা দৃশ্যমান বস্তুর মত বাইরে প্রকট করে না আর কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর দর্শনকেই তাদের নিকট জানা বলে মনে হয়—এই অভ্যাস তাদের এত দৃঢ়। 'তেবারমের' একটি পদে আছে, "হে সিদ্ধ, সকল দুঃখ দূর করতে আগ্রহী, অনুমান ও প্রমাণ নিয়ে ব্যাকুল হয়ো না! আমাদের বোধ অন্তরে নিত্য প্রকাশিত! শুদ্ধ মনে ঈশ্বরে থাকো!"

এই অপরোক্ষ অনুভূতি। সাধারণ লোক কি তা স্বীকার করবে? তারা চায় ঈশ্বর তাদেব সম্মুখে জ্যোতির্ময়রূপে বৃষভারূঢ় হয়ে আসুন। এরূপ দর্শন একবার হলেও তার শেষ তো হবেই। অতএব এটা ক্ষণস্থায়ী। 'তেবারম্' শাশ্বত নিত্য অনুভূত সত্তার কথা বলে। এই 'তেবারম্' একজনকে সোজসুজি সত্যে নিয়ে যায়।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১৩। মেজর চাডউইক তার ছন্দে রচিত মন্ত্রের অনুবাদটা শ্রীভগবানকে আবার পড়তে দিলে। শ্রীভগবান ভাষ্যকারের টীকা মৃদুস্বরে প'ড়ে তার ব্যাখ্যা করলেন। 'ব্রহ্মলোক'কে একটা স্তর-বিশেষরূপে বিবেচনা করাও স্বীকার্য। পৌরাণিকেরা এই অর্থ নেয় আর অন্যান্য মতবাদেও ক্রমমুক্তির ব্যাখ্যাকালে এবিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু উপনিষদ সদ্যোমুক্তির কথা বলে, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রমন্তি", "ইহৈব প্রলীয়ন্তে"—প্রাণের উৎক্রমণ (প্রয়াণ) হয় না; তারা এখানেই লয় হয়। সুতরাং ব্রহ্মলোক ব্রহ্মোপলব্ধি (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার)। এটা কোন স্থান নয়, একটা অবস্থা। দ্বিতীয় অর্থে 'পরামৃতাৎ'কে ঠিকভাবে বুঝতে হবে। অব্যাকৃত বিশ্বাতীত কারণিক শক্তি হওয়ার জন্য এটি পরা, আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া অবধি এটা থাকে সেজন্য 'অ-মৃত'। সুতরাং পরামৃতাৎ-এর অর্থ অব্যাকৃত। ক্রমমুক্তি মতবাদ বলে যে উপাসক তার ইষ্ট দেবতার লোকে যায়, তার পক্ষে সেটাই ব্রহ্মলোক। অন্য সব জীবাত্মারা বিভিন্ন লোকে গিয়ে পুনর্জন্মের জন্য ফিরে আসে। কিন্তু যারা ব্রহ্মলোকে গিয়েছে তারা আর আসে না। তাছাড়া যারা কোন একটা বিশেষ লোক পেতে ইচ্ছা করে তারা পদ্ধতি অনুসারে সাধনা করলে তা লাভ করে। অপরপক্ষে যতক্ষণ অবধি বিন্দুমাত্র কামনা থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মলোক লাভ হয় না। কামনাশূন্যতাই তার পুনর্জন্মের হেত্বাভাব সূচিত করে।

ব্রহ্মার কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেক লোকের ইষ্ট-দেবতার একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাঁর লয় হয় তখন সেই লোকেরও লয় হয়। সে লোকের অধিবাসীরাও তাদের আত্মজ্ঞানের পূর্বে ব্যক্তিগত চেতনা যাই থাক মুক্ত হয়ে যায়।

ক্রমমুক্তিবাদীরা সদ্যোমুক্তির ধারণাতে আপত্তি করে কারণ জ্ঞানীর অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহচেতনা চলে যাওয়ার কথা কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জীবিত থাকেন। তারা বলে, "মন না থাকলে শরীরের ক্রিয়া হয় কি করে?" উত্তরটা কিছু বিস্তৃত।

জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের থাকা অসঙ্গত নয় কারণ সুষুপ্তিতে শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে অজ্ঞানের বীজ থাকতে দেখা যায়। অসঙ্গতিটা কেবল জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় উদয় হয়। অজ্ঞানের দু'টি বিভাব—আবরণ (আচ্ছাদন) ও বিক্ষেপ (নানাত্ব)। এরমধ্যে আবরণ সত্যকে আড়াল করে। সেটা সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে। নানাত্ব (বিক্ষেপ) অন্য সময়ের ক্রিয়াপরতা। এর ফলে বৈচিত্র্য হয় যা জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায়। যদি আড়াল অর্থাৎ আবরণ চলে যায় তবে সত্য দর্শন হয়। জ্ঞানীর এটা চলে যায় সুতরাং তার কারণ-শরীর থাকে না। তার কেবল বিক্ষেপ থাকে। সেটাও জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর এক নয়। অজ্ঞানীর বহু প্রকার বাসনা অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকে। অপরপক্ষে জ্ঞানীর কর্তা হওয়া শেষ হয়ে গেছে। এরূপে তার মাত্র এক ধরণের বাসনাই থাকে। সেটাও অতি দুর্বল আর তাকে অভিভূত করতে পারে না কারণ সে সর্বদাই আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন। ক্ষীণ ভোক্তৃত্ব বাসনাই যা অবশিষ্ট মনরূপে জ্ঞানীর থাকে, সেকারণে সে শরীরে জীবিত আছে বলে মনে হয়।

এই ব্যাখ্যা মন্ত্রে প্রয়োগ করলে অর্থ হয়—জ্ঞানীর কারণ-শরীর নষ্ট হয়ে গেছে; স্থূল শরীর তাকে বিচলিত করে না আর বাস্তবিক-পক্ষে সেটাও নেই। কেবল সূক্ষ্ম শরীর আছে। একে অন্যভাবে 'আতিবাহিক' শরীর বলে। স্থূল শরীর ত্যাগের পর সবাই এটা

(আতিবাহিক) ধরে থাকে। আর এর দ্বারাই তারা উপযুক্ত স্থূল শরীর গ্রহণ না করা অবধি বিভিন্ন লোকে বিচরণ করে। জ্ঞানী সূক্ষ্ম শরীরে ব্রহ্মলোকে বিচরণ করে বলা হয়। তারপর সেটাও ত্যাগ হয়ে যায় আর সে চরম মুক্তি লাভ করে।

সমগ্র ব্যাখ্যা কেবল দর্শকদের জন্য। জ্ঞানী নিজে কখনই এরূপ প্রশ্ন করে না। সে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে যে সে কোন উপাধির দ্বারা বদ্ধ নয়।

ভ—পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় 'চরম মুক্তি' কি?

ম—আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম শরীর শুদ্ধ বোধ যা ঠিক ঘুম থেকে ওঠা ও অহংকারের উদয়ের অন্তর্বর্তী কালে অনুভূত হয়। এটা বিশ্বাতীত চেতনা। এটা হৃদয় হতে প্রতিফলিত বোধ। যখন প্রতি-ফলন থেমে গিয়ে কেবল মূলবোধরূপে হৃদয়ে থাকে তখন চরম মুক্তি।

ভ—'যোগবাশিষ্ঠ' বলে যে জীবনমুক্তের চিত্ত 'অচল'।

ম—অবশ্য তাই। 'অচল চিত্ত' আর শুদ্ধ মন এক। জ্ঞানীর মনকে শুদ্ধ মন বলা হয়। 'যোগবাশিষ্ঠ' আরও বলে যে ব্রহ্ম জ্ঞানীর মন ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ব্রহ্ম কেবল শুদ্ধ মন।

ভ—ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ ব্যাখ্যা কি এই শুদ্ধ মনের পক্ষেও উপযোগী হবে? কারণ এটাও চরম মুক্তিতে নাশ হয়ে যায়।

ম—যদি শুদ্ধ মন স্বীকার করা হয় তবে জ্ঞানীর অনুভূত আনন্দও প্রতিফলিত বলে স্বীকার করতে হয়। এই প্রতিফলনকেও মূলে লয় হতে হবে। অতএব জীবনমুক্ত অবস্থাকে একটি নির্মল দর্পণে আর একটি অনুরূপ দর্পণের প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। এই প্রতিবিম্বে কি দেখা যাবে? শুদ্ধ আকাশ। অনুরূপভাবে জ্ঞানীর প্রতিফলিত আনন্দ প্রকৃত আনন্দেরই সমপর্যায়।

এগুলো কেবল শব্দ সম্ভার। একজন কেবল অন্তর্মুখীন হলেই যথেষ্ট হয়। অন্তর্মুখীন মনের জন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এগুলো অন্যদের জন্য।

৫১৪। শ্রীম্যাক্‌ইভার একজন আবাসিক ভক্ত, সে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে যে সুইজারল্যাণ্ডের একজন গুরুর আমন্ত্রণে সে সেখানে যাবে কিনা। শ্রীভগবান বললেন—কোন একটা শক্তি তাকে এখানে এনেছে আর সেই শক্তি তাকে ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছে। সে এইটুকু মনে রাখুক যে জগতটা মনের প্রক্ষেপ আর মনটা আত্মাতেই রয়েছে। শরীর যেখানেই থাকুক মন যেন সংযত থাকে। শরীর চলে কিন্তু আত্মা চলে না। জগতটা আত্মায় রয়েছে ; ব্যস্‌।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১৫। ভ—গতকালের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে আবরণ ভঙ্গ হলে কারণ শরীর নষ্ট হয়। এটা স্পষ্ট। কিন্তু স্থূল শরীরের কি করে নাশ হয় ?

ম—বাসনা দু'প্রকার। বন্ধহেতু ও ভোগহেতু। জ্ঞানী অহংকার অতিক্রম করায় বন্ধনের কারণগুলো নিষ্ফল হয়ে যায়। এরূপে বন্ধহেতুর নাশ হয়ে কেবলমাত্র প্রারব্ধ ভোগবাসনা রূপে থাকে। অতএব বলা হয় যে জ্ঞানের পর কেবল সূক্ষ্ম শরীর থাকে। 'কৈবল্য' বলে যে জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে 'সঞ্চিত' কর্ম নাশ হয়ে যায় ; বন্ধনের বোধ না থাকায় 'আগামী'ও কাজ করে না ; আর প্রারব্ধ কেবল ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। এরূপে শেষেরটি সময়ে ক্ষয় হয়ে গেলে দেহও পাত হয়ে যায়।

শরীরত্রয় ও কর্মত্রয় কেবল তার্কিকদের মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকটি শব্দগুচ্ছ। জ্ঞানী এদের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

একজন মুমুক্ষুকে সে কে জানার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সে যদি তাই করে তবে সে উপরি উক্ত আলোচনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। আত্মাকে জানো আর শান্তিতে থাকো।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১৬। একটা প্রশ্ন হল জগৎ সত্য অথবা মিথ্যা কারণ অদ্বৈত-বাদীরা এ দু'টিকেই স্বীকার করে। শ্রীভগবান বললেন যে যদি আত্মা থেকে পৃথক দেখা হয় তবে মিথ্যা আর আত্মারূপে দেখলে সত্য।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১৭। 'যোগবাশিষ্ঠে'র দু'টি শ্লোকের উল্লেখ হল যেখানে ম্লেচ্ছদেশে অভিচার ক্রিয়া থাকার কথা আছে। শ্রীম্যাক্‌ইভার বললে যে পাশ্চাত্য দেশে যা মনে হয় তার থেকে বেশী অভিচার ক্রিয়ার প্রচলন আছে। তারপর লেখক স্মরণ করলে যে শ্রীপল ব্রাণ্টন একবার বলেছিলেন যে একজন মহিলার অভিচার ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় তিনি তাকে স্পষ্টই ভয় করতেন।

শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করলেন যে ভদ্রলোকটি 'দেবিকালোত্তর' পড়েছে কি না। তখন তিনি বললেন যে সেখানে অভিচার প্রয়োগের নিন্দা করা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করলেন যে এরূপ ক্রিয়ায় একজন নিজেরই বিনাশ ঘটায়। অবিদ্যা নিজেই অনিষ্টকারী আর একজনকে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করে। এর সঙ্গে আবার অভিচার ক্রিয়া যোগ করা কেন?

ভ—অভিচার ক্রিয়া দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া (প্রতিরোধ) কি?

ম—ভক্তি।

ভ—অপ্রতিরোধই লাঞ্ছনা ইত্যাদি সকল প্রকার মন্দের একমাত্র প্রতিকার বলে মনে হচ্ছে।

ম—ঠিক তাই। যদি একজন অন্যের কুৎসা বা ক্ষতি করে তবে তার প্রতিকার প্রত্যুত্তর বা প্রতিরোধ করলে হয় না। কেবল

শান্ত হয়ে থাকো। এই শান্তি উপদ্রুত ব্যক্তির মনে শান্তি আনবে আর অপরাধী যতক্ষণ না দোষ স্বীকার করবে ততক্ষণ তাকে অস্থির করে তুলবে।

স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতে মহাত্মাদের ওপর অভিচার ক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে আসছে। দারুকবনের তপস্বীরা স্বয়ং শিবের ওপর এটা প্রয়োগ করেছিল।

তারপর আলোচনা আবার ব্রহ্মলোকের বিষয়ে ঘুরে গেল।

শ্রীভগবান বললেন যে ব্রহ্মলোক আর আত্মলোক একই। আবার ব্রহ্মৈব লোকঃ=ব্রহ্মই লোক (ব্রহ্ম স্বয়ংই লোক) আর ব্রহ্মই আত্মা। সুতরাং ব্রহ্মলোক কেবলমাত্র আত্মাই।

লোক ও আলোক সমার্থ। এটাই 'উল্লাতুনারপতু'র (সদ্ বিত্থার) 'আন্দামিল্লাক্কান্'। লোক্যতে ইতি লোকঃ (যা দেখা যায় তাই লোক)।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫১৮। একজন তেলেগু পণ্ডিত শ্রীভি. গুপ্ত এখানে দর্শনার্থে এসেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন—অহংকৃতি (অহংকার) আর 'অহম্' এক নয়। দ্বিতীয়টি পরম সত্য, অপরপক্ষে প্রথমটি অহংকার। সত্য অনুভবের আগে একে দমন করতে হবে। পরম সত্তা অপ্রত্যক্ষ আর তার প্রথম লক্ষণ 'অহম্ স্ফুরণ' (আমির বোধ)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলে 'অহম্ নামা অভবৎ (তার নাম অহম্ হয়েছিল) ১।৪।১। এটাই সত্যের প্রথম নাম।

পণ্ডিত অনুগ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে চাইলে। এটা কি শিষ্যের মনের ওপর গুরুর মনের ক্রিয়া বা অন্য কিছু?

ম—সর্বোৎকৃষ্ট কৃপা মৌন। এটাই সর্বোত্তম উপদেশ।

ভ—বিবেকানন্দ বলেছেন যে মৌনই তারস্বরে প্রার্থনা।

ম—এটা সাধকের মৌন। গুরুর মৌন প্রকট উপদেশ। এটাই কৃপার পরাকাষ্ঠা। অন্য দীক্ষা যেমন স্পর্শ, চাক্ষুস ইত্যাদি মৌন থেকে নিঃসৃত হয়। অতএব তারা গৌণ। মৌনই মুখ্যতম। যদি গুরু মৌন থাকেন সাধকের মন স্বতঃই শুদ্ধ হয়ে যায়।

ভ—সাংসারিক দুঃখে কি ঈশ্বর কিংবা গুরুর কাছে প্রার্থনা করা উচিত?

ম—নিঃসন্দেহে।

৫১৯। ম—মহাবাক্য ও তাদের ব্যাখ্যায় অন্তহীন আলোচনার সৃষ্টি হয় আর তাতে সাধকের মন বহির্মুখে বিচরণ করে। মনকে অন্তর্মুখী করতে হলে মানুষকে সরাসরি 'আমি'তে স্থির হতে হবে। তবেই বাইরের ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয় আর পরম শান্তি বিরাজ করে।

পরে শ্রীভগবানের নিকট 'যোগবাশিষ্ঠে'র একটা অংশ পড়া হল, তাতে চাক্ষুষ ও স্পর্শ দীক্ষার কথা ছিল।

শ্রীভগবান বললেন—শিষ্যেরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে দক্ষিণামূর্তি মৌন অবলম্বন করেছিলেন। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট দীক্ষা। অন্যান্য দীক্ষা এর অন্তর্গত। অন্যান্য দীক্ষায় বিষয়ী ও বিষয় সম্বন্ধ আছে। প্রথমে বিষয়ীর উদয় হয় তারপর বিষয়। এ দু'টি না থাকলে একজন কি করে অন্যকে দেখে বা স্পর্শ করে? মৌন দীক্ষাই পরম শ্রেষ্ঠ; দৃষ্টি, স্পর্শ ও উপদেশ এরই মধ্যে সমাবিষ্ট আছে। এটাই অন্যকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ করে আর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

৫২০। একজন অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক (শ্রীলোমান) এখানে দর্শনার্থে এসেছে। সে মনে হয় হিন্দুদর্শন পড়ছে। সে একত্বে বিশ্বাস করে, জীব এখনও ভ্রমে পতিত ইত্যাদি দিয়ে শুরু করলে।

ম—তুমি কিরূপ একত্বে বিশ্বাস কর? সেখানে জীবের স্থান কোথায়?

ভ—একত্ব পরমতত্ত্ব।

ম—একত্বে জীবের স্থান নেই।

ভ—কিন্তু জীব পরমতত্ত্ব অনুভব করেনি আর নিজেকে পৃথক কল্পনা করে।

ম—জীব পৃথক রয়েছে কারণ কল্পনা করার জন্য তাকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে।

ভ—কিন্তু এটা অসৎ।

ম—অসৎ বস্তু কিছু উৎপন্ন করতে পারে না। এটা যেন তোমার এরূপ বলা হচ্ছে যে তুমি শশকের শৃঙ্গ দিয়ে পশুবধ করেছ। খরগোশের শিঙ হয় না।

ভ—আমি এর অবাস্তবতা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি স্থূল স্তরের কথা বলছি।

ম—তুমি বলছ 'আমি'। সেই 'আমি'টা কে? যদি এটা খুঁজে পাওয়া যায় তারপর তুমি ভ্রমটা কার বলতে পারো।

একটু পরে শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—

তুমি বলছ তুমি এখন স্থূল স্তরে আছো। স্বপ্নহীন নিদ্রায় তুমি কোন স্তরে থাকো?

ভ—আমি মনে করি তখনও স্থূল স্তরে থাকি।

ম—তুমি বলছ 'আমি মনে করি'। তার অর্থ তুমি যখন জাগ্রত তখন এটা বলছ। যাই হোক তুমি স্বীকার কর যে গভীর নিদ্রায় তুমি থাকো। থাকো না?

ভ—হাঁ, কিন্তু তখন আমি সক্রিয় নই।

ম—সুতরাং তুমি সুষুপ্তিতে ছিলে। এক তুমিই বরাবর আছো? তাই না?

ভ—হাঁ।

ম—পার্থক্য এই যে—তুমি সুষুপ্তিতে ক্রিয়াশীল ছিলে না। বরং এখন জাগ্রত অবস্থায় তুমি চিন্তাশক্তিযুক্ত আর সুষুপ্তিতে চিন্তা-ক্রিয়ারহিত। তাই না?

ভ—হাঁ।

ম—তবে তোমার প্রকৃত স্বরূপ কোনটা? এটা কি চিন্তা-শক্তিযুক্ত কিংবা চিন্তাশক্তিমুক্ত অবস্থা?

ভ—এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু সুষুপ্তিতে আমি আমার সত্তার সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না।

ম—সেটা তুমি এখন বলছ; তুমি তোমার সুষুক্তিতে এ কথা বলো না। কিংবা তুমি কি তোমার সত্তা (সুষুপ্তিতে আপন অস্তিত্ব) অস্বীকার কর?

ভ—না।

ম—আশয় এই যে তুমি উভয় অবস্থাতেই থাকো। পরম সত্তাই আত্মা। তুমি সত্তা সম্বন্ধেও সচেতন। সেই সত্তাই আবার চেতনা (সৎ ও চিৎ)। এটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

ভ—কিন্তু আত্মজ্ঞানের জন্য চিন্তার প্রয়োজন হয়।

ম—'সেই চিন্তাশক্তি'র লক্ষ্য হল সকল চিন্তা দূর করা।

ভ—আমার অজ্ঞানের জন্য আমি পরম সৎ-চিৎ-কে অনুভব করতে পারছি না।

ম—'আমি'টা কে? অজ্ঞানটা কার! তুমি যে উপলব্ধি করেই রয়েছ তার প্রমাণের পক্ষে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই যথেষ্ট। এমনকি কেউ আছে যে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে? কিংবা কেউ কি বলে যে সে তার সুষুপ্তিতে ছিল না? এরূপে বিশুদ্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। স্বীকার করার অর্থ চেতনা। সেজন্য সকল মানুষই আত্মজ্ঞানী। অজ্ঞানী লোক একটিও নেই।

ভ—হাঁ, আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে। আত্মজ্ঞানের অবস্থা নিষ্কাম অবস্থা। একজন মানুষ যদি কামনাশূন্য হয়, সে আর মানুষ থাকে না।

ম—তুমি সুষুপ্তিতে তোমার অস্তিত্ব স্বীকার কর। তখন তুমি সক্রিয় থাকো না। তোমার স্থূল দেহ সম্বন্ধে কোন চেতনা ছিল

না। তুমি নিজেকে এই দেহে সীমিত মনে করো নি। সুতরাং তোমার আত্মা থেকে পৃথক কিছু দেখো নি।

এখন তোমার জাগৃতিতে তুমি সেই অস্তিত্বরূপেই আছ আর তার ওপর শরীররূপ উপাধি যুক্ত হয়েছে। এই উপাধির জন্যই তোমার বিষয় দর্শন হচ্ছে। সে কারণে কামনা জাগছে। কিন্তু তোমার কামনাশূন্য সুষুপ্তি অবস্থায় তুমি এখনকার থেকে কিছু কম সুখী ছিলে না। তোমার কোন অভাববোধ ছিল না। তুমি কামনাগুলোকে আশ্রয় দিয়ে নিজেকে ক্লিষ্ট করো নি। কিন্তু এখন তুমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছ কারণ তুমি একটা মানুষের শরীরের মধ্যে নিজেকে সীমিত করেছ। তুমি এই উপাধি ধরে রাখতে ইচ্ছা কর কেন আর কামনা-কেই বা প্রশ্রয় দাও কেন?

শ্রীভগবান বলে চললেন—

শরীর কি তোমায় বলে যে সে আছে? সেটা নিশ্চয় শরীর থেকে পৃথক অন্য একটা কিছু যে সচেতন থাকে। সেটা কি?

তুমি কি বলতে চাও যে এটা 'আমি' অর্থাৎ অহংকার যেটা ব্যক্তির ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে জেগে ওঠে? বেশ, তাই যেন হল। শরীর চেতন নয়। পরমসত্তাও কিছু বলে না। অহংকারই বলে। একজন সুষুপ্তিতে মুক্তি চায় না। এ আকাঙ্ক্ষা কেবল জাগ্রত অবস্থায় ওঠে। এরূপ জাগ্রত অবস্থার ক্রিয়াগুলো অহংকারের, যা 'আমি'রই সমপর্যায়। এই 'আমি'টাকে খোঁজো। এরূপ করলে আর 'আমি' হয়ে থাকলে এই সব সংশয় দূর হয়ে যাবে।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫২১। কয়েকজন কংগ্রেসী ভদ্রলোক মহর্ষিকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো লিখে জানালে—

(১) ভারতকে আর কতদিন দাসত্ব ভোগ করতে হবে?

(২) ভারতের সন্তানেরা কি তার স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে নি?

(৩) মহাত্মা গান্ধীর জীবিত কালে ভারত কি স্বাধীন হবে?

উপরি উক্ত প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হল না। শ্রীভগবান কেবল মন্তব্য করলেন—

গান্ধীজী ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন আর তাঁর নির্দেশে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তিনি ফলের জন্য চিন্তা করেন না কিন্তু যা ঘটে তাকে স্বীকার করে নেন। জাতীয় কর্মীদের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—কাজটা কি সফল হবে?

ম—এ প্রশ্নটা উঠছে কারণ প্রশ্নকর্তা নিজেকে সমর্পণ করে নি।

প্র—তবে কি আমরা দেশের জন্য চিন্তা ও কাজ করব না?

ম—আগে নিজের ব্যবস্থা কর, বাকী সব আপনা হতে হবে।

প্র—আমি নিজের কথা বলছি না, দেশের কথা বলছি।

ম—প্রথমে সমর্পণ কর আর দেখো। সমর্পণের অভাবে সংশয়গুলো ওঠে। সমর্পণের দ্বারা শক্তিলাভ কর, তখন দেখবে যে তোমার শক্তির মাত্রার অনুপাতে পরিবেশও উন্নত হয়েছে।

প্র—আমাদের কাজটা শ্রেয় কিনা তা কি জানা উচিত নয়?

ম—দেশের কাজে গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ কর। 'সমর্পণ'ই মন্ত্র।

শ্রীভগবানকে নিম্নলিখিত চিঠিটিও দেওয়া হল—

"আমরা চারজন কুর্গ থেকে এসেছি আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে দিল্লী গিয়েছিলাম, এখন ফিরে যাচ্ছি। আমরা কুর্গ কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি। কুর্গ কংগ্রেস কমিটি ও কুর্গের জনসাধারণের জন্য কৃপা ক'রে আমাদের কিছু বাণী দিন।"

যখন কাগজটা তাঁর হাতে দেওয়া হল, শ্রীভগবান বললেন য একই উত্তর এখানেও খাটে। সমর্পণ শব্দেই বাণী রয়েছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

৫২২। একজন দর্শনার্থী শ্রীভগবানকে বললে—

আমি জ্ঞানলাভ করতে চাই।

ম—কে জ্ঞানলাভ করতে চায়?

ভ—আমি চাই।

ম—এই 'আমি'টা কে? 'আমি'টা খোঁজো ও তারপর দেখো আরও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে কিনা।

২রা অক্টোবর, ১৯৩৮

৫২৩। একটি তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেন বাংলা দেশ থেকে কয়েকজন দর্শনার্থী নিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন বললে যে, সে শ্রীপল ব্রান্টনের বই পড়ে অবধি শ্রীভগবানকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। সে আরও জিজ্ঞাসা করলে—

আমার প্রবৃত্তি আমি কি করে দমন করবো?

ম—এদের মূল খোঁজো তারপর এটা সহজ হবে। (পরে) প্রবৃত্তি কি? কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। তারা ওঠে কেন? বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও দ্বেষের জন্য এটা হয়। বিষয়গুলো তোমার দৃষ্টিতে কি করে প্রক্ষিপ্ত হয়? তোমার অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের জন্য। কিসের অজ্ঞান? আত্মার। এরূপে যদি আত্মাকে পাও আর তাতেই থাকো তবে প্রবৃত্তির জন্য কোন দুর্ভোগ হবে না।

(পরে) আবার প্রবৃত্তির কারণ কি? সুখের ইচ্ছা বা ভোগের কামনা। সুখের ইচ্ছা হয় কেন? কারণ তোমার স্বরূপই

আনন্দ আর এটা স্বাভাবিক যে তুমি নিজের স্ব-ভাবে থাকবে। এ আনন্দ আত্মা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। একে অন্য কোথাও খুঁজো না পরন্তু আত্মা খোঁজো আর তাতেই থাকো।

আবার দেখো, যে আনন্দ স্বাভাবিক তাকে কেবল আবিষ্কার করা যায় সুতরাং তা হারায় না। অপরপক্ষে যে আনন্দ অপর বস্তুজাত তা বাহ্য আর সেজন্য হারাতে বাধ্য। অতএব এটা স্থায়ী হতে পারে না আর অনুসন্ধানের যোগ্যও নয়।

অধিকন্তু ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। জ্বলন্ত আগুন পেট্রল দিয়ে নিভানো যায় না। সাময়িক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার চেষ্টা ক'রে পরে সেটা দমন করা যাবে ধারণা করা কেবল মূর্খতা মাত্র।

নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তি দমনের আরও অন্যান্য উপায় আছে সেগুলো (১) পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, (২) উপবাস, (৩) যৌগিক ক্রিয়া, (৪) ঔষধ। কিন্তু তাদের উপযোগিতা সাময়িক। প্রতিবন্ধক সরিয়ে নিলে সেগুলো আরও প্রবল বেগে জেগে ওঠে। সেগুলোকে একেবারে ত্যাগ করাই একমাত্র উপায়। এটা পূর্ব কথিত উৎসের অনুসন্ধানে হয়।

৫২৪। আর একজন যাত্রী জিজ্ঞাসা করলে—

আমি একজন গৃহস্থ। একজন গৃহস্থের পক্ষে কি মুক্তিলাভ সম্ভব আর তা যদি হয় তবে কি উপায়ে হয়?

ম—আচ্ছা, পরিবার কি? কার পরিবার? যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায়, অন্য প্রশ্নগুলোর স্বতঃই সমাধান হয়ে যাবে।

বলো দেখি—তুমি পরিবারে রয়েছ কিংবা পরিবার তোমাতে রয়েছে?

দর্শনার্থী উত্তর দিলে না। তখন শ্রীভগবানের উত্তর দান

চলতে লাগল—তুমি কে? তোমার জীবনের তিনটি অবস্থা আছে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তুমি সুষুপ্তিতে পরিবার ও তার বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন নও। সুতরাং এ প্রশ্নগুলোও তখন ওঠে না। কিন্তু তুমি এখন পরিবার ও তার বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন আর তার জন্য মুক্তি খুঁজছ। কিন্তু তুমি সর্বদাই এক লোক।

ভ—যেহেতু এখন আমি পরিবারে রয়েছি অনুভব করছি সেজন্য তার থেকে মুক্তি চাওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

ম—তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ভাবো আর বলো—তুমি পরিবারে কিংবা পরিবার তোমাতে?

আর একজন দর্শনার্থী বাধা দিয়ে—পরিবার কি?

ম—ঠিক তাই। এটা জানা উচিত।

ভ—আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। তারা আমার ওপর নির্ভর করে। এটাই পরিবার।

ম—পরিবারের লোকেরা কি তোমার মনকে বেঁধে রাখে? তুমি নিজেকে তাদের সঙ্গে যুক্ত কর? তারা কি তোমার কাছে এসে বলে, "আমরা তোমার পরিবার, আমাদের সঙ্গে থাকো?" কিংবা তুমিই তাদের পরিবার বলে ভাবো আর তাদের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত মনে কর?

ভ—আমিই তাদের পরিবার বলে ভাবি আর নিজেকে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ মনে করি।

ম—ঠিক তাই। যেহেতু তুমি মনে কর যে অমুক আমার স্ত্রী আর অমুক অমুক আমার ছেলে মেয়ে সেজন্য তুমি নিজেকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত মনে কর।

এ চিন্তাগুলো তোমার। তাদের অস্তিত্ব তোমার ভিতরে রয়েছে। তুমি এ চিন্তাগুলোকে প্রশ্রয় দিতে বা ত্যাগ করতে পারো। প্রথমটা বন্ধন আর দ্বিতীয়টা মুক্তি।

ভ—এটা আমার কাছে স্পষ্ট হল না।

ম—তোমার চিন্তা করার জন্য তুমি নিশ্চয় আছো। তুমি এ চিন্তা বা অন্য চিন্তা করতে পারো। চিন্তাগুলো পরিবর্তনশীল, কিন্তু তুমি নও। এই চলন্ত চিন্তাগুলোকে যেতে দাও আর নিত্য আত্মাকে ধরে থাকো। এই সঞ্চরমান চিন্তাসমূহই তোমার বন্ধন। সেগুলো ত্যাগ করলেই মুক্তি। বন্ধনটা বাইরে নয়। সুতরাং মুক্তির জন্য কোন বাহ্যিক প্রতিকারের প্রয়োজন নেই। এটা তোমার আয়ত্তের মধ্যে আর তুমি চিন্তা করে এরূপে বন্ধনে পড়তে পারো বা চিন্তা না করে মুক্তও হতে পারো।

ভ—কিন্তু চিন্তা না করে থাকা সহজ নয়।

ম—তোমায় চিন্তাশূন্য থাকতে হবে না। কেবল চিন্তার মূলটা চিন্তা করো; খোঁজো আর তাকে লাভ কর। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। যখন সেটা পাওয়া যাবে চিন্তাগুলো স্বতঃই চলে যাবে। সেটাই বন্ধন হতে মুক্তি।

ভ—হাঁ। এখন বুঝলাম। এখন শিখলাম। গুরুর কি প্রয়োজন আছে?

ম—যতক্ষণ নিজেকে একজন ব্যক্তি মনে করছ ততক্ষণ একজন গুরু চাই যিনি তোমায় দেখিয়ে দেবেন যে তুমি সীমার (উপাধির) দ্বারা বদ্ধ নও আর উপাধি হতে মুক্ত হওয়াই তোমার স্বরূপ।

৫২৫। আর একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—

কর্ম বন্ধন। একজন কোন না কোন কর্ম না করেও থাকতে পারে না। সুতরাং বন্ধন বাড়তেই থাকে। এরূপ অবস্থায় একজন কি করবে?

ম—একজন এরূপ কর্ম করুক যাতে বন্ধন দৃঢ় না হয়ে ক্ষীণ হয়ে যায়। অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্ম।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৮

৫২৬। জনৈক দর্শনার্থী শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—

লোকে ঈশ্বরকে একটা নাম দেয় আর বলে যে এটা পবিত্র নাম, জপ করলে পুণ্য হয়। এটা কি সত্য হতে পারে?

ম—কেন নয়? তোমারও একটা নাম আছে যাতে তুমি উত্তর দাও। কিন্তু তোমার শরীর সেই নাম নিজের ওপর লিখে জন্মায়নি বা কাউকে বলে নি যে তার নাম অমুক অমুক। তা সত্ত্বেও তোমার একটা নাম দেওয়া হয়েছে যেটা ধরে ডাকলে তুমি সাড়া দাও কারণ তুমি নিজেকে সেই বলে নির্ধারণ করেছ। অতএব নামটা একটা কিছু বোঝায় আর এটা কেবলমাত্র কল্পনা নয়। অনুরূপভাবে ঈশ্বরের নামও কার্যকরী। নাম জপ হলে যাকে উদ্দেশ্য করে নামটা তার স্মরণ হয়। সে কারণে এতে পুণ্য হয়।

কিন্তু লোকটি সন্তুষ্ট হল না। অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময়ে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করলে।

শ্রীভগবান তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে কৃপার আশ্বাসরূপ কতগুলো শব্দে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে তাকে কি করে তৃপ্ত করবে।

দু'জনেই হাসলেন আর দর্শনার্থী বিদায় নিলে।

৫২৭। কুর্গের কয়েকজন সম্ভ্রান্তা মহিলা হলঘরে ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমি একটি মন্ত্র নিয়েছি, লোকে আমায় ভয় দেখাচ্ছে যে সেটা জপ করলে অভাবনীয় ফল হতে পারে। এটা কেবলমাত্র "প্রণব" সেজন্য উপদেশ চাই'ছি। আমি কি জপ করতে পারি? আমার এর ওপর বেশ বিশ্বাস আছে।

ম—নিশ্চয়, বিশ্বাসের সঙ্গে জপ করা উচিত।

ভ—এই জপই কি যথেষ্ট ? কিংবা আপনি আমায় অনুগ্রহ করে আরও কিছু উপদেশ দেবেন ?

ম—মন্ত্র জপের উদ্দেশ্য, যে জপটা বিনা চেষ্টায় একজনের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে সেটা অনুভব করা। বাচিক জপ মানস হয় আর মানস জপ নিজেকে শাশ্বতরূপে প্রকাশ করে। সেই মন্ত্রই ব্যক্তির স্বরূপ। সেটাই তার আত্মোপলব্ধির অবস্থা।

ভ—এরূপে কি সমাধির আনন্দ লাভ করা যায় ?

ম—জপ মানস হয় আর শেষে আত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করে। সেটাই সমাধি।

ভ—আমাকে অনুগ্রহ করুন আর আমার চেষ্টাকে শক্তিমান করুন।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৮

৫২৮। একজন মধ্য বয়স্ক আন্ধ্র ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—দৃষ্টি স্থির করার জন্য (বা মন একাগ্র করার জন্য) ঈশ্বর-চিন্তার কি প্রয়োজন আছে ?

ম—সাধনাটা কি ?

ভ—ত্রাটক (দৃষ্টি স্থির করা)।

ম—কিসের জন্য ?

ভ—একাগ্রতার জন্য।

ম—এই সাধনায় চোখের কাজ ঠিকই হবে ; কিন্তু এই অভ্যাসে মনের কাজ কোথায় ?

ভ—তার জন্য কি করবো ?

ম—নিঃসন্দেহে ঈশ্বর-চিন্তা।

ভ—অভ্যাসে কি লোকে অসুস্থ হয় ?

ম—হতে পারে। কিন্তু আপনা হতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভ—আমি দিনে চার ঘণ্টা ধ্যান ও দু'ঘণ্টা ত্রাটক অভ্যাস করেছিলাম। অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন অন্যেরা বলে যে এটা আমার সাধনার জন্য হয়েছে। সুতরাং ধ্যান করা ছেড়ে দিয়েছি।

ম—সব কিছু অনুকূল হয়ে যাবে।

ভ—চোখের দৃষ্টি কি স্বাভাবিক ভাবে স্থির হওয়া ভাল নয়?

ম—কি বলতে চাও?

ভ—দৃষ্টি স্থির করার জন্য কি অভ্যাসের প্রয়োজন আছে কিংবা একে স্বাভাবিক ভাবে হতে দেওয়া ভাল?

ম—কোন কিছুকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা ছাড়া অভ্যাস আর কি? দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এটা স্ব-ভাব হয়।

ভ—প্রাণায়ামের কি প্রয়োজন আছে?

ম—হ্যাঁ। এটা উপকারী।

ভ—আমি এটা অভ্যাস করিনি। কিন্তু আমি কি এটা শুরু করব?

ম—যথেষ্ট মনোবল থাকলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

ভ—মনোবল লাভ করব কি করে?

ম—প্রাণায়ামে।

ভ—খাদ্য নিয়ন্ত্রণের কি প্রয়োজন আছে?

ম—নিশ্চয়, সাহায্যকারী।

ভ—আমার ধ্যান কি নিরাকার কিংবা সাকারের হবে?

ম—কি বলতে চাও?

ভ—আমি কি পর্যায়ক্রমে একবার শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামের ধ্যান করতে পারি?

ম—ভাবনার অর্থই খণ্ডতা অর্থাৎ ভেদভাব।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮

৫২৯। কথা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বললেন যে তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর শ্রীঅরুণাচলের স্তুতি-বন্দনা গান করেছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত গল্পটি বললেন—

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে জ্ঞানসম্বন্ধর এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি তিনবছরের তাঁর বাবা তাঁকে সিয়ালীর মন্দিরে নিয়ে যান। তাঁকে পাড়ে রেখে তাঁর বাবা পবিত্র পুষ্করিণীতে স্নান করতে যান। তিনি ডুব দিলে ছেলেটি বাবাকে না দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তৎক্ষণাৎ শিব ও পার্বতী বিমানে করে সেখানে উপস্থিত হলেন। পার্বতীকে শিব ছেলেটিকে স্তন্যদুগ্ধ দিতে বললেন। পার্বতী একটি বাটিতে স্তন্যদুগ্ধ নিয়ে ছেলেটিকে পান করতে দিলেন। ছেলেটি পান ক'রে শান্ত হল।

বাবা জল থেকে উঠে দেখলেন যে ছেলেটি হাসছে আর তার মুখের চারিপাশে দুধের দাগ রয়েছে। সুতরাং ছেলেটিকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি উত্তর দিলে না। তাকে ভয় দেখানো হলে সে গান গেয়ে উঠল। সেগুলো সেই দর্শনদাতা শিবের স্তুতি। বালক গাইলে, "কুণ্ডল মণ্ডিত···চোর ; সে হরিল মন মোর···।"

এরূপে তিনি একজন বিখ্যাত ভক্ত হলেন এবং বহুলোক তাঁর দর্শনের জন্য আসতে লাগল। তিনি পরিপূর্ণ কর্মময় জীবন যাপন করেছিলেন ; দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করেছিলেন। তাঁর ষোল বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের পরই বর-বধূ স্থানীয় মন্দিরে দেবদর্শনে গেলেন ; তাদের সঙ্গে বিরাট জনতা। তাঁরা মন্দিরে পৌঁছালে সেখানটা জ্যোতির্ময় হয়ে গেল আর মন্দির দেখা গেল না। সেই জ্যোতির মধ্যে একটা পথ দেখা যাচ্ছিল। জ্ঞানসম্বন্ধর লোকেদের সেই পথে যেতে বললেন আর তারাও গেল। তিনি তাঁর নববধূকে নিয়ে সেই জ্যোতিকে প্রদক্ষিণ ক'রে লোকেদের যাওয়া পথে প্রবেশ

করলেন। জ্যোতি অদৃশ্য হয়ে গেল আর যারা তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল তাদেরও আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। মন্দিরটি আবার আগের মত দেখা গেল। এই মহাত্মার এরূপ ঘটনাবহুল সংক্ষিপ্ত জীবন।

তীর্থ পর্যটন কালে তিনি তিরুভন্নমালাই থেকে আঠারো মাইল দূরে আরিয়ানাইনাল্লুর বা তিরুকৈলোরে এসেছিলেন। সেই স্থানটি শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। (এইখানেই ভগবান তাঁর সতের বছর বয়সে তিরুভন্নমালাই আসার পথে একটি অলৌকিক জ্যোতি দেখেন। শ্রীভগবান তখন জানতেন না যে ঐ স্থানটি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্বে তিরুজ্ঞানসম্বন্ধরের পদধূলির দ্বারা পবিত্র হয়েছিল।)

যখন এই প্রাচীন মহাত্মা আরিয়ানাইনাল্লুরে বাস করছিলেন তখন একদিন এক বৃদ্ধ একটি ফুলের সাজি নিয়ে তাঁর কাছে আসে। যুবক মহাত্মা বৃদ্ধকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধ বললে যে সে অরুণাচলের—পর্বতরূপে যে ঈশ্বর এখানে রয়েছেন তাঁর সেবক।

মহাত্মা—সেটা এখান থেকে কত দূর?

বৃদ্ধ—আমি প্রতিদিন সেখান থেকে এখানে ফুল তুলতে আসি। সুতরাং কাছেই।

মহাত্মা—তবে আমি তোমার সঙ্গে সেখানে যাব।

বৃদ্ধ—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!

তাঁরা দু'জনে রওনা হলেন, মহাত্মার সঙ্গে বেশ একটা বড় দল। কিছু দূর যাওয়ার পর মহাত্মা আরও কতদূর যেতে হবে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন কিন্তু বৃদ্ধটি ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। একটু পরে একদল ডাকাত এসে যাত্রীদের ঘিরে ফেললে। তারাও তাদের যথা-সর্বস্ব ডাকাতদের দিয়ে দিলে। তারা কোন প্রকারে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাল। যুবক মহাত্মা ধ্যানে বসলেন। ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে বললেন যে ডাকাতেরা তাঁর প্রমথগণ আর এও বললেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে অনুসারে যাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু

পেল। মহাত্মা শ্রীঅরুণাচলের স্তুতিবন্দনা গান করেছিলেন। একটি পদে তিনি বলেছেন—

"তুমি জ্ঞানঘন মূর্তি, তুমি তোমার ভক্তদের 'দেহাত্মবোধ' দূর করতে সমর্থ। প্রত্যেক দিন রাত্রে হরিণ, বন্য বরাহ ও ভল্লুকের দল পাহাড় থেকে সমতল প্রদেশে খাদ্যান্বেষণে নেমে আসে। আর সমতল ভূমি থেকে যূথে যূথে হস্তী বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের ওপরে ওঠে সুতরাং বিভিন্ন দল তোমারই সানুতে মিলিত হয়।"

শ্রীভগবান বলে চললেন—সুতরাং দেড় হাজার বছর আগে এই পাহাড় নিশ্চয় ঘন জঙ্গলে ভরা ছিল। এই হাজার হাজার বছর ধরে কাঠুরে ইত্যাদির দল সব বন কেটে পরিষ্কার করে দিয়েছে।

উপমন্যু রচিত 'ভক্ত চরিতে' রহস্যময় বৃদ্ধ লোকটির জ্ঞান-সম্বন্ধরকে শ্রীঅরুণাচলের বিষয় বলা কথিকাটি তিনশত শ্লোকে লেখা আছে। মন্দিরের অর্চকদের মধ্যে একজনের এই বই ছিল আর সে গত কয়েক মাসের মধ্যে মন্দিরের মামলার ব্যাপারে এটা শ্রীভগবানকে দেখায়। শ্রীভগবান শ্লোকগুলো নকল করে নেন।

৫৩০। শ্রীভগবানের ভক্ত ও রমণাশ্রমের আবাসিক আন্নামালাই স্বামীর দিনলিপি থেকে নিম্নলিখিত অংশটি নেওয়া হয়েছে—

শ্রীরমণ ভগবানের উপদেশ—

(১) যে ব্যক্তি নিষ্কাম হয়ে জগতের সকল কর্ম করে অথচ নিজের মূল স্বরূপটি ভোলে না সেই প্রকৃত মানুষ।

আন্নামালাই স্বামী ধ্যান অভ্যাসের জন্য পাহাড়ের গুহায় একান্ত বাসের অনুমতি চাইলে তাকে দেওয়া উত্তর।

(২) সে সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। একজন মানুষ কি মুক্তি লাভের জন্য সর্বত্যাগী হবে না?

ম—একজন যে নিজের কর্ম করে আর 'আমি করি' বা 'আমি এর কর্তা' ভাবে না সে অন্য একজন যে 'আমি সর্বস্ব ত্যাগ

করেছি ভাবে' তার থেকে ভাল। এমনকি একজন সন্ন্যাসী যে 'আমি একজন সন্ন্যাসী' ভাবে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে পারে না, অপরপক্ষে একজন গৃহস্থ যে 'আমি একজন গৃহস্থ' এরূপ ভাবে না, সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

৫৩১। ভ—একজন একটা বিষয় একভাবে বলে। আর একজন সেই বিষয় অন্যভাবে বলে। সত্যকে কি করে নির্ণয় করা যায়?

ম—প্রত্যেকেই একমাত্র তার নিজের আত্মাকে সদাসর্বদা ও সর্বস্থানে দেখে। সে জগৎ ও ঈশ্বরকে তারই অনুরূপ দেখে।

একজন নায়নার (শৈব মহাত্মা) ঈশ্বরের দর্শনার্থে কালাহস্তী গিয়েছিল। সে সেখানে সবাইকে শিব ও শক্তি দেখলে কারণ সে নিজেও তাই ছিল। আবার ধর্মপুত্র (যুধিষ্ঠির) মনে করতেন যে জগতের সকলের কোন না কোন গুণ আছে আর প্রত্যেকেই তাঁর থেকে কোন না কোন অংশে ভাল। অন্যপক্ষে দুর্যোধন জগতে একটিও ভাল লোক দেখতে পায়নি। প্রত্যেকেই নিজের স্বভাবকে প্রতিফলিত হতে দেখে।

৫৩২। ভ—জগতের দুঃখ হতে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই?

ম—একটিমাত্র উপায়, সেটি হল যে কোন অবস্থায় নিজের আত্মাকে না ভোলা।

'আমি কে?' অনুসন্ধানই জগতের সকল দুঃখের একমাত্র প্রতিকার। এটা পূর্ণানন্দও বটে।

৫৩৩। গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা জেলে একুশদিন অনশন পালনের সঙ্কল্প কাগজে প্রকাশিত হতেই দু'জন যুবক শ্রীভগবানের নিকট এল; তারা খুবই উত্তেজিত ছিল। তারা বললে, "মহাত্মা এখন একুশদিন অনশন পালন করছেন। তিনি যতদিন অনশন পালন করবেন আমরাও

ততদিন অনশন পালনের জন্য ওয়ার্দ্ধা যাওয়ার জন্য শ্রীভগবানের অনুমতি চাইছি। তিনি আমাদের কৃপা করে অনুমতি দিন। আমরা খুবই অধীর হয়েছি।" এই বলে তারা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। শ্রীভগবান হাসলেন আর বললেন, "তোমাদের এরূপ সহানুভূতি ভাল লক্ষণ। কিন্তু তোমরা এখন কি-বা করতে পারবে? গান্ধীজী তপস্যা করে যে শক্তিলাভ করেছেন সেটা লাভ কর। পরে তোমরা সফল হবে।"

৫৩৪। শ্রীভগবান প্রায়ই বলতেন, "মৌন সর্বোত্তম বাগ্মিতা। শান্তি সর্বোৎকৃষ্ট কর্মপরতা। কিরূপে? কারণ একজন তার মূল স্বরূপে থাকে আর সে আত্মার সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। এরূপে সে যে কোন শক্তিকে যখন যেখানে প্রয়োজন আহ্বান ও প্রয়োগ করতে পারে। এটাই উচ্চতম সিদ্ধি।"

আন্নামালাই জিজ্ঞাসা করলে—বলা হয় নামদেব, তুকারাম, তুলসী দাস আর অন্যেরা মহাবিষ্ণুকে দেখেছেন। তাঁরা কি করে তাঁকে দেখলেন?

ম—কি করে? ঠিক যেভাবে এখানে তুমি আমায় দেখছ আর আমি তোমায় দেখছি, সেইভাবে। তারা বিষ্ণুকে কেবল এইভাবেই দেখতে পারে।

(সে লিখেছে যে, এটা শুনে তার রোমাঞ্চ হল আর একটা অদ্ভুত আনন্দ হল।)

৫৩৫। একবার 'আ' জিজ্ঞাসা করেছিল দৈনন্দিন কাজে রত হলেও একজন কি করে ভক্তিমান হতে পারে?

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন না। দশ মিনিট কেটে গেল। কয়েকজন মেয়ে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে এল। তারা নাচগান

আরম্ভ করলে। তাদের গানটা ছিল, "আমরা দুগ্ধ মন্থন করি, অবিরাম কৃষ্ণ নাম স্মরি।"

শ্রীভগবান স্বামীর দিকে চাইলেন আর বললেন যে এই তার উত্তর। এই অবস্থাকে ভক্তি, যোগ ও কর্ম বলে।

৫৩৬। 'আমি দেহ' বোধে নিমজ্জিত ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পাপী ও আত্মঘাতী। 'আমি আত্মা'র অভিজ্ঞতা সর্বোত্তম পুণ্য। এমন কি এরূপ ধ্যান এক মুহূর্তের জন্য হলেও সব সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ঠিক সূর্যের মত যার কাছ থেকে অন্ধকার দূরে চলে যায়। যদি একজন সর্বদা ধ্যানে থাকে তবে যেকোন পাপ তা সেটা যত জঘন্যই হোক না কেন তার ধ্যানে সেটা ক্ষয় না হয়ে কি পারে?

৫৩৭। একবার শ্রীভগবান বলছিলেন, "কামনাই মায়া আর নিষ্কামতাই ঈশ্বর।"

৫৩৮। 'আ' জিজ্ঞাসা করেছিল—জাগতিক কর্ম ও ধ্যানের মধ্যে কি পার্থক্য?

ম—কোন পার্থক্য নেই। এটা যেন একই বস্তুকে দু'টি ভাষায় দু'টি শব্দে প্রকাশ করা। কাকের দু'টি চোখ কিন্তু একটি কনীনিকা, সেটা যথা ইচ্ছা এচোখেও চোখে ঘোরানো যায়। হাতী শুঁড় দিয়ে নিঃশ্বাস নেয় আবার জলও পান করে। সাপ একই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখে ও শোনে।

৫৩৯। শ্রীভগবান যখন পাহাড়ে যাচ্ছিলেন, স্বামী তখন প্রশ্ন করে—চোখ খোলা কিংবা বন্ধ অবস্থায় ধ্যানের কি কিছু পার্থক্য হয়?

ম—তুমি যদি দূরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে একটা বল ছোঁড়ো বলটা উল্টে তোমার কাছে ফিরে আসে। যদি কাছে থেকে ছোঁড়ো

বলটা উল্টে ফিরে এসে তোমাকে পেরিয়ে চলে যায়। এমন কি চোখ বন্ধ থাকলেও মন চিন্তার অনুসরণ করে।

৫৪০। একবার 'আ' জিজ্ঞাসা করেছিল—ইন্দ্রিয়জাত সুখের অপেক্ষা ধ্যানে অধিক আনন্দ হয়। তবু মন আগেরটার পিছনে ছোটে আর পরেরটা চায় না। এটা কেন হয়?

ম—সুখ ও দুঃখ কেবল মনের ব্যাপার। আমাদের মূল স্বরূপ আনন্দ। কিন্তু আমরা আত্মাকে ভুলে গেছি আর শরীর ও মনকে আত্মা মনে করি। এই ভুল নির্ধারণই দুঃখের কারণ। কি করা যাবে? এই বাসনা অতি পুরাতন আর বহু জন্ম হতে চলে আসছে। সেজন্য শক্তিমান হয়েছে। এটাকে যেতে হবে তবেই মূল স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ নিজেকে প্রকাশ করবে।

৫৪১। জনৈক দর্শনার্থী শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—

জগৎ দুষ্টলোকে পরিপূর্ণ হওয়ায় এত দুঃখ। এখানে আনন্দ লাভ কি করে হবে?

ম—সবাই আমাদের গুরু। দুষ্টলোক অন্যায় ক'রে বলে 'আমাদের কাছে এস না'। ভাল লোকেরা সব সময়ে ভাল। সুতরা সকলেই আমাদের গুরু।

৫৪২। 'আ' জিজ্ঞাসা করেছিল, যেখানে আমার প্রয়োজন সহজে মিটে যাবে এরূপ স্থানে নির্জনবাসের কামনা আমি প্রায়ই করি তাহলে সমস্তক্ষণ কেবল ধ্যান করতে পারবো। এরূপ কামনা কি ভাল কিংবা খারাপ?

ম—এরূপ কামনা তাঁদের পূর্ণতার জন্য আর একটা জন্ম দেবে। কোথায় আর কিভাবে আছো তাতে কি এসে যায়? মূলতঃ মনটা সর্বদা তার উৎসে থাকা চাই। বাইরে কিছু নেই যা ভিতরেও নেই। মনই সব। মন যদি চঞ্চল হয় তবে নির্জন স্থানও বাজারের

মত জনবহুল। তোমার চোখ বন্ধ করে কোন লাভ নেই। মনের চোখ বন্ধ কর তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জগতটা তোমার বাইরে নয়। ভাল লোকেরা তাদের কাজের আগে কোন পরিকল্পনা করে না। কি দরকার? কারণ ঈশ্বর যিনি আমাদের জগতে পাঠিয়েছেন তাঁর নিজের একটা পরিকল্পনা আছে আর সেটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

৫৪৩। কোন এক উপলক্ষ্যে অনেক দর্শনার্থী এসেছে আর তারা প্রত্যেকেই একটিমাত্র প্রার্থনা 'আমাকে ভক্ত করুন, আমাকে মোক্ষ দিন' বলে প্রণাম করলে। তারা চলে যেতে শ্রীভগবান স্বগতোক্তি করলেন, "সবাই ভক্তি ও মোক্ষ চায়। আমি যদি তাদের বলি 'নিজেদের আমাকে দাও' তা তারা দেবে না। তারা যা চায় তা আর তবে কি করে পেতে পারে?"

৫৪৪। আর একবার কয়েকজন ভক্ত নিজেদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ভক্তের তুলনামূলক বিচার করছিল। তারা একমত না হতে পেরে শ্রীভগবানকে মধ্যস্থ মানলে। তিনি নীরব রইলেন। আলোচনা বেশ প্রবলভাবে হতে লাগল।

পরিশেষে শ্রীভগবান বললেন—একজন অন্যকে বুঝতে পারে না কিংবা কে বদ্ধ বা মুক্ত বলতে পারে না। সবাই জগতে বিখ্যাত হতে চায়। এটা মানুষের স্বভাব। কিন্তু কেবল সেই কামনাটাই একজনকে লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয় না। ঈশ্বর যাকে স্বীকার করেন না সে অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত হয়। যে কায় ও মনে নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করেছে সে জগদ্‌বিখ্যাত হয়।

৫৪৫। একবার 'অ' কামোত্তেজনায় অত্যন্ত পীড়িত হয়। সে এইগুলো দমন করার চেষ্টা করলে। তিনদিন উপবাস ক'রে ঈশ্বরের

কাছে এই চিন্তা হতে নিষ্কৃতির জন্য প্রার্থনা করলে। অবশেষে সে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করার সিদ্ধান্ত করলে।

শ্রীভগবান তার কথা শুনলেন ও দু'মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি বললেন, "বেশ! চিন্তাগুলো তোমাকে বিচলিত করেছিল আর তুমি তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলে। বেশ ভাল। এখনও কেন তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করছ? যখনই এরূপ চিন্তা উঠবে, বিবেচনা কর চিন্তাটা কার উঠছে আর সেগুলো তোমার থেকে চলে যাবে।"

৫৪৬। 'আ' জিজ্ঞাসা করেছিল—একজন কোন ভাল কাজ করলে কিন্তু সে ভাল কাজ করা সত্ত্বেও কষ্ট পেল। আর একজন মন্দ কাজ করলে কিন্তু বেশ সুখে রইল। এরকম কেন হয়?

ম—সুখদুঃখ পূর্বকর্মের ফল আর বর্তমান কর্মের জন্য নয়। সুখ ও দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। একজনকে বিচলিত না হয়ে সেগুলো ভোগ করতে হবে। একজনকে সর্বদা আত্মাকে ধরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কর্ম করার সময়ে উদ্বিগ্ন হবে না আর সাময়িক সুখ ও দুঃখে বিচলিত হবে না। যে সুখদুঃখে উদাসীন সেই একমাত্র সুখী হতে পারে।

৫৪৭। মুক্তিলাভে গুরুকৃপার কি অবদান?

ম—মুক্তি তোমার বাইরে কোথাও নয়। এটা কেবলমাত্র ভিতরে। যদি একজন মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয় তখন আন্তর গুরু তাকে ভিতরে টেনে নেন আর বাইরের গুরু তাকে আত্মার দিকে ঠেলে দেন। এই গুরুকৃপা।

৫৪৮। একজন দর্শনার্থী শ্রীভগবানকে (লিখে) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করলে—(১) জগতের 'বৈচিত্র্য কি সৃষ্টির সঙ্গেই উৎপন্ন হয়েছে? কিংবা এটা পরে সৃষ্টি হয়েছে? (২) সৃষ্টিকর্তা কি

নিরপেক্ষ ? তবে একজন খঞ্জ, একজন অন্ধ ইত্যাদি হয়ে জন্মায় কেন ? (৩) অষ্ট দিক্‌পাল, তেত্রিশ কোটি দেবতা ও সপ্তর্ষি কি এখনও আছেন ?

ম—প্রশ্নগুলো নিজেকেই কর তাহলেই উত্তর পাবে।

একটু পরে শ্রীভগবান বললেন—যদি আমরা প্রথমে আমাদের জানি তবে অন্যান্য বিষয় আমাদের কাছে সহজ হয়ে যায়। আগে আমাদের নিজেকে জানা যাক আর তারপর সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া যাবে। আগে নিজেকে না জেনে ঈশ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাওয়া অজ্ঞান। একজন যার ন্যাবা হয়েছে সে সবকিছু হলুদ দেখে। সে যদি বলে যে সব কিছু হলুদ রঙের তবে তার কথা কে নেবে ?

সৃষ্টির একটা আরম্ভ আছে বলা হয়। কিরূপ ? যেন গাছ ও তার বীজ, যা থেকে সেটা হয়েছে। বীজটা কি করে হল ? এইরূপ একটা গাছ থেকে। এইরূপে প্রশ্ন-পরম্পরার শেষ কোথায় ? অতএব একজন জগতকে জানার আগে নিজেকে জানুক।

৫৪৯। শ্রীভগবান প্রায়ই নমস্কার (প্রণিপাত) সম্বন্ধে এরূপ বলেন—"এই নমস্কারকে আদিতে ঋষিরা ঈশ্বরের নিকট সমর্পণের উপায়রূপে প্রবর্তন করেছিলেন। কাজটা এখনও চলে আসছে কিন্তু এর পিছনের ভাবটা নয়। নমস্কর্তা তার কাজ দিয়ে উপাস্যকে ছলনা করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা একটা ফাঁকি ও কপটতা। অনেক পাপকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা। ঈশ্বরকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ? লোকে ভাবে ঈশ্বর তার নমস্কার নিলেন আর সেও পূর্ববৎ জীবন যাপন করার অধিকার পেল। তাদের আমার কাছে আসার দরকার নেই। আমি এরূপ নমস্কারে খুশি হই না। লোকেদের মন পরিষ্কার রাখা উচিত। তা না করে তারা আমার সামনে ঘাড় নীচু ক'রে কিংবা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। এই সব কাজে কি আমায় ফাঁকি দেওয়া যায় ?"

৫৫০। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক সমারসেট মম্‌ শ্রীভগবানকে দর্শন করতে এসেছিল। সে মেজর চাডউইকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার ঘরেও গেল আর সেখানে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। মেজর চাডউইক তাকে দেখার জন্য শ্রীভগবানকে অনুরোধ করলে। শ্রীভগবান সেই ঘরে গেলেন, একটা চেয়ারে বসলেন ও শ্রীমমের দিকে চেয়ে রইলেন। সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্রীভগবানকে নমস্কার করলে। তাঁরা দু'জনে নীরবে এক ঘণ্টা মুখোমুখি বসে রইলেন। লেখক প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কথা বলে নি। মেজর চাডউইক তাকে প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহিত করে। শ্রীভগবান বললেন, "সব হয়ে গেছে। হৃদয়ের কথাই সব কথা। সব কথাই মৌনে শেষ হয়।" তারা হাসলে আর শ্রীভগবান ঘর থেকে চলে এলেন।

৫৫১। একজন লোক শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—"আত্ম-বিদ্যাকে অতি সুলভ কি করে বলা যায়?"

ম—যে কোন বিদ্যায় একজন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর প্রয়োজন, অপরপক্ষে এটাতে এসব কিছু লাগে না। এটা আত্মা। তার থেকে স্পষ্ট বস্তু আর কি কিছু আছে? সেজন্যই অতি সুলভ। কেবল তোমায় যা করতে হবে সেটা 'আমি কে?' অনুসন্ধান।

মুক্তিই একজন মানুষের প্রকৃত নাম।

৫৫২। আশ্রমে কয়েকটা ঘর বাড়ী আছে। একটা নক্‌সাও ছিল কিন্তু যে কোন কারণে সেটা হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। এই নিয়ে 'আ' ও সর্বাধিকারী অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সহমত না হওয়ায় তাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হত। একবার 'আ' এ বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্রীভগবান বললেন, "কোন্‌ বাড়ীটাই বা এখানের লোকেরা নক্‌সা অনুযায়ী তৈরী করেছে? ঈশ্বরের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে

আর সবই সেই মত হচ্ছে। যা হচ্ছে তা নিয়ে কারও চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

৫৫৩। একবার আশ্রমিকেরা শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"আমরা আগের জন্মে কে কি ছিলাম? আমরা আমাদের পূর্বজন্ম জানি না কেন?"

ম—ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণায় লোকেদের এ জ্ঞানটা দেন নি। যদি তারা জানে যে পুণ্যবান ছিল তাহলে তারা গর্বিত হবে আর অন্যপক্ষে তারা হতাশ হবে। দু'টিই খারাপ। নিজের আত্মাকে জানলেই যথেষ্ট হয়।

৫৫৪। ম—যেমন একটি নদী সমুদ্রে মিলিত হলে আর প্রবাহিত হয় না সেরূপ একজন আত্মায় ডুবে গেলে সকল চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে।

৫৫৫। এক সময়ে শ্রীভগবান স্মরণ ক'রে বললেন যে একবার কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার মতে একজনের তিন টাকায় মাস চলে যায়। শ্রীভগবান এ বিষয়ে কি বলেন?

ম—একজন মানুষ তখনই আনন্দে থাকে যখন সে জানে যে তার বাঁচার জন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

৫৫৬। একরাত্রে মেজর চাডউইক শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বলা হয় মনের উদয় হলে জগতের প্রকাশ হয়। আমার ঘুমের সময়ে কোন মন নেই। সে সময়ে অন্যদের জন্য কি জগৎ থাকে না? এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে জগৎ একটা সমষ্টি মনের সৃষ্টি? তবে আর জগৎ বাস্তব নয় স্বপ্নের মত কি করে বলা যায়?

ম—জগৎ তোমায় বলে না যে সে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত মনের সৃষ্টি। ব্যক্তি মনই জগৎ দেখে। এই মনের লয় হলে জগতেরও লয় হয়।

একটি লোক তার তিরিশ বছর পূর্বে স্বর্গত বাবাকে স্বপ্ন দেখলে। আরও দেখলে যে তার আরও চার ভাই রয়েছে আর বাবা তাঁর সম্পত্তি চারজনকে ভাগ করে দিয়েছেন। একটা ঝগড়া হল, ভায়েরা তাকে ধরে মারলে, সেই লোকটি ভয় পেয়ে জেগে উঠল। তখন তার মনে পড়ল যে সে একমাত্র সন্তান ; তার আর কোন ভাই নেই আর তার বাবাও বহুদিন আগে স্বর্গে গেছেন। তার ভয়ের পরিবর্তে সন্তোষ লাভ হল। সুতরাং দেখছ—যখন আমরা আত্মাকে দেখি তখন জগৎ নেই আর যখন আত্মাকে ভুলে যাই তখনই জগতে বদ্ধ হই।

৫৫৭। জনৈক দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—“আমাদের ভ্রূমধ্যে মনস্থির করতে বলা হয়, এটা কি ঠিক?”

ম—সবাই জানে ‘আমি আছি’। এই চেতনাকে ছেড়ে লোকে ঈশ্বরকে খুঁজতে যায়। ভ্রূমধ্যে মনস্থির করে কি লাভ? ঈশ্বর ভ্রূমধ্যে আছেন বলা কেবল একটা মূর্খতা। এরূপ পরামর্শের লক্ষ্য মনের একাগ্রতার সাহায্য করা। এটা জোর করে মনকে দমন করার একটা প্রক্রিয়া যাতে মন চঞ্চল না হয়। তাকে জোর করে একটা পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে একাগ্রতার সাহায্য হয়।

কিন্তু আত্মোপলব্ধির সর্বোত্তম সাধন ‘আমি কে?’ অনুসন্ধান করা। উপস্থিত ক্লেশ মনের জন্য আর মনকেই তা দূর করতে হবে।

ভ—খাদ্য সম্বন্ধে কি কোন বিধিনিষেধ পালন করতে হবে?

ম—পরিমিত সাত্ত্বিক আহার।

ভ—অনেক প্রকার আসনের কথা বলা হয়। এর মধ্যে কোনটা উত্তম?

ম—নিদিধ্যাসনই (মনের একাগ্রতা) সর্বোৎকৃষ্ট।

৫৫৮। একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করেছিল—"শ্রীভগবান! যখন আপনার কথা শুনলাম, আপনাকে দেখার জন্য একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল। এটা হওয়ার কারণ কি?

ম—আত্মা থেকে শরীরটা যেভাবে উঠেছে, ইচ্ছাও সেইভাবে উঠেছে।

ভ—জীবনের উদ্দেশ্য কি?

ম—জীবনের উদ্দেশ্য জানার বাসনাই পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। যারা এটা জানার জন্য অনুসন্ধান করে না তারা কেবল বৃথা জীবন কাটাচ্ছে।

৫৫৯। একজন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি কখন জ্ঞানী হব শ্রীভগবানের সেটা জানা সম্ভব। কৃপা ক'রে বলুন কবে হব।"

ম—যদি আমি ভগবান (জ্ঞানী) হই, তবে আমার অতিরিক্ত আর কেউ নেই যার জ্ঞান হবে বা যাকে আমি কিছু বলতে পারি। আর যদি অন্যের মত সাধারণ লোক হই তবে তাদের মত অজ্ঞানী। দু'দিক থেকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

৫৬০। শ্রীভগবান যখন স্নান করছিলেন কয়েকজন ভক্ত তাঁর চার-পাশে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তারপর তারা গাঁজা খাওয়া সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে। ইতিমধ্যে তাঁর স্নান হয়ে গেছে, তিনি বললেন, "ও গাঁজা! গাঁজাখোর এর আমেজে পরমানন্দ অনুভব করে। তাদের আনন্দ কি বলে বর্ণনা করবো! তারা কেবল 'আনন্দ! আনন্দ!....'বলে চিৎকার করে।" এই বলে তিনি টলে টলে মাতালের মত চলতে লাগলেন। ভক্তরা সবাই হেসে উঠল।

মনে হল যেন তিনি পড়ে যাচ্ছেন, 'আ'র কাঁধে ভর দিয়ে তিনি 'আনন্দ! আনন্দ' বলে উঠলেন।

'আ' বলে যে সেই থেকে তার সত্তার একটা পরিবর্তন হয়েছে। সে আশ্রমে গত আট বছর যাবৎ বাস করছে। সে আরও বলে যে তার মন এখন শান্ত থাকে।

৫৬১। ভ—স্বরূপ (সাকার) ও অরূপ (নিরাকার) মন কি ?

ম—যখন তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠ তখন একটা বোধ জাগে, সেটা মহৎ তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আত্মারই বোধ। একে বিশ্বাতীত চেতনা বলে। সেটাই অরূপ। বোধটা অহংকারে পড়ে আর তার থেকে প্রতিফলিত হয়। তখন শরীর ও জগৎ দর্শন হয়। এই মনটা স্বরূপ। এই প্রতিফলিত চৈতন্যের দ্বারাই বিষয় অনুভূত হয়। এই বোধকেই জ্যোতি বলে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৮

৫৬২। 'বিচার সংগ্রহ' বই-এ বলা হয়েছে যে যদিও একজনের একবার আত্মসাক্ষাৎকার হয় তথাপি সে কেবলমাত্র সে কারণে মুক্ত হতে পারে না। সে বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করা হল যে এই সাক্ষাৎকার ও জ্ঞানীর অনুভূতি এক কিনা আর যদি তাই হয় তবে তাদের প্রভাব পৃথক হয় কেন ?

ম—অনুভূতিটা এক। সকলেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে আত্মোপলব্ধি করে। অজ্ঞানীর অনুভূতি তার বাসনার দ্বারা আবৃত, অপরপক্ষে জ্ঞানীর সেরূপ নয় সুতরাং জ্ঞানীর উপলব্ধি স্পষ্ট ও স্থায়ী।

একজন সাধক দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে হয়ত একবার সত্যের আভাস পায়। এই অনুভূতিটা সাময়িকভাবে খুব স্পষ্ট হতে পারে।

তথাপি সে আবার তার পুরাতন বাসনার প্রভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় আর তার অনুভূতি কোন কাজে আসে না। এরূপ ব্যক্তি তার সকল বাধা দূর না হওয়া অবধি মনন ও নিদিধ্যাসন চালিয়ে যাবে। তবেই সে প্রকৃত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে।

ভ—একজন ব্যক্তি যে কোন চেষ্টা না ক'রে অজ্ঞানী হয়ে রইল আর একজন যে এরূপ আভাস অনুভব করলে তাদের মধ্যে কি পার্থক্য ?

ম—পরের জনের পক্ষে একটা প্রেরণা সব সময়েই থাকে যা তাকে আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা না পাওয়া অবধি আরও চেষ্টা করতে প্ররোচিত করে।

ভ—শ্রুতি বলে—'সকৃৎ বিভাতোঽয়ম্ ব্রহ্মলোক' (ব্রহ্মজ্ঞান সদা ও সর্বকালের জন্য প্রকাশিত হয়)।

ম—তারা স্থায়ী জ্ঞানের কথা বলে, ঝলক দর্শনের কথা নয়।

ভ—আপন অনুভূতিটা ভুলে গিয়ে আবার একজনের অজ্ঞানে অভিভূত হওয়া কি করে সম্ভব হয় ?

শ্রীভগবান একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝালেন—

একজন রাজা ছিলেন, তিনি প্রজাদের বেশ ভালভাবেই প্রতিপালন করতেন। একজন মন্ত্রী রাজার বিশ্বাসভাজন হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অন্যান্য মন্ত্রী ও কর্মচারীরা তাতে উদ্‌ব্যস্ত হয়ে তাকে সরাবার জন্য একটা চক্রান্ত করলে। তারা প্রহরীদের সেই লোকটিকে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে না দেওয়ার নির্দেশ দিলে। রাজা তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে খোঁজ করলেন। তাঁকে বলা হল যে লোকটি অসুস্থ সেজন্য আসতে পারে না। রাজা তাঁর বৈদ্যকে সেই লোকটিকে দেখার জন্য পাঠালেন। রাজাকে মিথ্যা খবর দেওয়া হল যে লোকটি একবার ভাল থাকে আবার মরণাপন্ন হয়। রাজা রোগীকে দেখতে যেতে চাইলেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা বললে যে এটা রাজার ধর্ম

বিরুদ্ধ। পরে তাঁকে খবর দেওয়া হল যে সে মারা গেছে। রাজা সে খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত হলেন।

সেই উদ্ধত মন্ত্রী তার নিজস্ব চরের দ্বারা সব ঘটনাই জানলে। সে অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রয়াস ব্যর্থ করার চেষ্টা করলে। যাতে সে নিজেই রাজাকে সব বলতে পারে সেজন্য সে রাজার প্রাসাদের বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একবার কোন একটা উপলক্ষ্যে সে একটা গাছে উঠে লুকিয়ে রইল আর রাজার অপেক্ষা করতে লাগল। রাজা সেই রাত্রে পালকি করে বার হলেন; লুকিয়ে থাকা লোকটি পালকির সামনে লাফিয়ে পড়ে তার পরিচয় দিয়ে চেঁচাতে লাগল। রাজার অনুচরও কম ধূর্ত নয়। সে তৎক্ষণাৎ এক মুঠা বিভূতি বার ক'রে রাজার সামনে ছড়িয়ে দেওয়াতে রাজা চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। অনুচর 'জয়' 'জয়' শব্দে চিৎকার করে উঠল আর বাজনাদারদের জোরে বাজনা বাজাতে বললে, তাতে অন্য লোকটির কথা শোনা গেল না। সে পালকি বাহকদের তাড়াতাড়ি চলার হুকুম দিলে আর সে নিজেও ভূতপ্রেত দূর করার জন্য মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। এর ফলে রাজার ধারণা হল যে, মৃতব্যক্তি ভূত হয়ে তাঁর ওপর উপদ্রব করছে।

বিফল মনোরথ লোকটি নিরাশ হয়ে তপস্যা করতে বনে চলে গেল। অনেকদিন পরে রাজা একবার শিকার করতে গিয়ে সেই ভূতপূর্ব মন্ত্রীকে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখলেন। কিন্তু পাছে ভূত আবার উপদ্রব ক'রে এই ভেবে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন।

গল্পটির তাৎপর্য এই যে লোকটিকে রক্তমাংসের শরীরে দেখা গেলেও, সে যে ভূত হয়েছে এই ভুল ধারণার বশে সত্য নির্ণয় করা সম্ভব হল না। কৃত্রিমভাবে আত্মদর্শনের ফলও এরূপ হয়।

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৮

৫৬৩। একদল লোক শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য এল। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে—"আমার মনকে কি করে সৎপথে রাখবো?"

ম—একটা দুর্দান্ত ষাঁড়কে ঘাসের লোভ দেখিয়ে গোশালায় আনা হয়। অনুরূপভাবে মনকে সৎচিন্তা দ্বারা লোভ দেখাতে হয়।

ভ—কিন্তু এটা স্থির থাকে না।

ম—ষাঁড়টি ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত সেজন্য ঘুরতে আনন্দ পায়। যাহোক তাকে কচি ঘাসের লোভ দেখিয়ে গোশালায় আনতে হবে। তথাপি সে অন্যের মাঠে চরতে যেতে ছাড়বে না। তাকে ক্রমশঃ বোঝাতে হবে যে সেই রকম মিষ্টি ঘাস তার গোশালাতেও পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে সে বাইরে না গিয়ে গোশালাতেই থাকবে। পরে একটা সময় আসবে যখন গোশালা থেকে তাড়িয়ে দিলেও সে অন্যের মাঠে না গিয়ে আপন স্থানে ফিরে আসবে। সেই রূপে মনকেও সৎপথে চলতে শিক্ষা দিতে হবে। সে ক্রমশঃ সৎপথে অভ্যস্ত হবে আর বিপথে ফিরে যাবে না।

ভ—মনকে কোন্ সৎপথ দেখানো উচিত?

ম—ঈশ্বর চিন্তা।

২৩শে-২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৮

৫৬৪। কাশ্মীরের জায়গীরদার পণ্ডিত বালকাক ধর সোজাসুজি কাশ্মীর থেকে শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য দীপাবলীর দিন এসেছে। সে শ্রীভগবানকে তার জীবন ও অবস্থা সম্বন্ধে লেখা এক তাড়া কাগজ দিলে। শ্রীভগবানের সঙ্গে তার সব কথোপকথনই ব্যক্তিগতভাবে হয়েছিল।

তার প্রশ্নের মধ্যে একটা ছিল—"এখন আমি শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করলাম, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, আমি কি এখন তাবিজ, কবজ, পূজাদি নদীর জলে ফেলে দিতে পারি?"

ম—ধর্ম শাস্ত্রানুসারে নিত্যকর্ম ভাল। এটা মন শুদ্ধির জন্য করা হয়। নিজেকে এরূপ পূজাদির পক্ষে উন্নত মনে হলেও অন্যদের জন্য তার সেটা করা উচিত। এরূপ কাজ তার সন্তান-সন্ততি ও আশ্রিতদের পক্ষে আদর্শসরূপ হবে।

৫৬২। মহীশূরের একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—"মনকে কি করে সন্মার্গে রাখা যায়?"

ম—অভ্যাসের দ্বারা। একে সৎ চিন্তা দাও। মনকে সৎ-পথে চলতে শিক্ষা দিতে হবে।

ভ—কিন্তু এটা স্থির নয়।

ম—ভগবদ্গীতা বলে, 'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ' (ক্রমশঃ মন স্থির করবে) 'আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা' (মনকে আত্মায় নিহিত ক'রে): অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম্ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা)।

অভ্যাসের প্রয়োজন। উন্নতি ক্রমশঃ হবে।

ভ—'আত্মসংস্থমে'র আত্মা শব্দের অর্থ কি?

ম—তুমি কি তোমার আত্মাকে জানো না? তুমি নিশ্চয় আছো। কিংবা তুমি কি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার কর? যদি তুমি না থাকো তবেই "এই আত্মাটা কে?" প্রশ্ন হতে পারে; কিন্তু তুমি না থাকলে আবার এই প্রশ্নটাও জিজ্ঞাসা করতে পারো না। তোমার প্রশ্নই দেখাচ্ছে যে তুমি আছো। তুমি কে খোঁজো। ব্যস্।

ভ—আমি অনেক বই পড়েছি কিন্তু আমার মন আত্মোন্মুখী হয় না।

ম—কারণ বই-এ আত্মা নেই পরন্তু তোমাতেই এটা আছে। বই পড়লে বিদ্বান হয়। এটাই উদ্দেশ্য আর এটা হয়ে গেছে।

ভ—আত্মসাক্ষাৎকার কি?

ম—তুমিই আত্মা আর সাক্ষাতও (নিত্য বর্তমান) বটে। কার (করার) স্থান এখানে কোথায়? প্রশ্নে মনে হয় যে তুমি নিজেকে অনাত্মা মনে কর। কিংবা তুমি ভাবো যে দু'টি আত্মা আছে, একটা অন্যকে জানবে। এটা অসম্ভব।

তুমি যে নিজেকে স্থূল শরীর বলে নির্ধারণ করেছ সেটাই এই প্রশ্নের মূল। বেশ, প্রশ্নটা এখন উঠছে। তোমার সুষুপ্তিতে কি এটা উঠেছিল? তখন কি তুমি ছিলে না? নিশ্চয়ই তুমি সুষুপ্তিতে ছিলে। এই দু'টি অবস্থার মধ্যে কী এমন পার্থক্য হয় যে প্রশ্নটা এখন ওঠে আর সুষুপ্তিতে ওঠে না? এখন তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর। তুমি চারিদিকে বিষয় দেখো আর আত্মাকেও সেইভাবে দেখতে চাও। অভ্যাসের শক্তি এতই দৃঢ়। ইন্দ্রিয়গুলো দর্শনের যন্ত্রসরূপ। 'তুমি' দ্রষ্টা। কেবল দ্রষ্টা হয়ে থাকো। আর কি দেখার আছে? সুষুপ্তির অবস্থা এরূপ। অতএব তখন এই প্রশ্ন ওঠে না।

এরূপে আত্মসাক্ষাৎকার কেবলমাত্র অনাত্মা নিরসন।

ভ—আত্মা এক কিংবা অনেক?

ম—এটাও ভ্রমের জন্য হয়; তুমি শরীরকে আত্মা বলে মনে কর। তুমি 'এটা আমি; ওটা সে; ওখানে আর একজন ইত্যাদি' ভাবো। তুমি অনেক শরীর দেখছ আর তাই ভাবছ যে আত্মা অনেক। কিন্তু তোমার সুষুপ্তিতে তুমি কি জিজ্ঞাসা কর 'আমি এখন ঘুমাচ্ছি আর কতজন আছে যারা জেগে আছে?' আদৌ কোন প্রশ্ন ওঠে কি? কেন ওঠে না। কারণ একমাত্র তুমিই আছ আর অনেক নেই।

ভ—আমার তত্ত্ব (সত্য) কি?

ম—তুমি নিজেই তত্ত্ব। তত্ত্ব জানার জন্য আর একজন পৃথক কেউ কি আছে? তত্ত্ব ছাড়াই বা তুমি কি করে আছ? তোমার অস্তিত্ব থাকার জন্যই তোমার প্রশ্ন হচ্ছে। তোমার অস্তিত্বই

তত্ত্ব। তত্ত্বের সাজ পোষাক ছেড়ে নিজের মূল স্বরূপে থাকো। সব শাস্ত্রই বলে যে তোমার চেষ্টা অসত্য ও অতত্ত্বে ব্যয় করো না। অতত্ত্ব ছাড়ো। তখন তত্ত্বই একমাত্র ও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হবে।

ভ—আমি আমার তত্ত্ব ও কর্তব্য জানতে চাই।

ম—আগে তোমার তত্ত্ব জানো তারপর তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারো। জিজ্ঞাসা ও কর্তব্য করার জন্য তুমি নিশ্চয় আছো। নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি কর আর তারপর তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাও।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৮

৫৬৬। 'আর্য ধর্ম' নামে একটি তামিল পত্রিকা আছে। তাতে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীভগবান একটা প্রশ্নের উত্তরে সেটা পড়ে শোনালেন। প্রবন্ধটা সংক্ষেপে এই—

বৈরাগ্য = বি + রাগ = বিগতরাগ (অনাসক্তি)।

বৈরাগ্য কেবল জ্ঞানীদের পক্ষেই সম্ভব। যা হোক সাধারণ লোক প্রায়ই এই কথাটার অপব্যবহার করে। উদাহরণসরূপ একজন প্রায় বলে, "আমি সিনেমা না দেখার সঙ্কল্প করেছি।" সে একে বৈরাগ্য বলে। এরূপ পদগুচ্ছের ও প্রাচীন বাক্যের অপপ্রয়োগ খুব বিরল নয়। আবার আমরা প্রায়ই শুনি "কুকুর দেখলে পাথর নেই : পাথর দেখলে কুকুর নেই।" সাধারণতঃ এর অর্থ করা হয় রাস্তায় কুকুর দেখলে ঢিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের একটা গভীর তাৎপর্য আছে। এটা একটা গল্পের ওপর তৈয়ারী হয়েছে—একজন ধনী লোকের বাড়ী বেশ সুরক্ষিত ছিল। এই বাড়ীর ফটকের থামে একটা হিংস্র কুকুর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। কুকুর ও শিকল একটা চমৎকার কারুকার্যের নিদর্শন। এগুলো পাথরে খোদাই করা ছিল কিন্তু জীবন্ত দেখাত। একবার একজন পথচারী সেই হিংস্র

কুকুর দেখে পালাতে গিয়ে আঘাত পায়। একজন দয়ালু প্রতিবেশী দয়া পরবশ হয়ে তাকে দেখালে যে এটা জীবন্ত কুকুর নয়। সেই লোকটি যখন দ্বিতীয়বার সেই রাস্তায় গেল তখন সে সেই শিল্পীর দক্ষতার প্রশংসা করলে আর তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ভুলে গেল। এরূপে যখন সে কুকুর দেখেছিল তখন সেটা যা দিয়ে তৈরী সেই পাথর দেখতে পায়নি ; আবার যখন সে এটা পাথরের মূর্তি বলে দেখলে তখন সে আর কামড়াতে আসা কুকুর দেখেনি। সেইজন্য এই প্রবাদ বচন। আরও তুলনা কর "হাতী ঢাকে বন, বন ঢাকে হাতী।" এখানে হাতীটা কাঠের।

আত্মা সর্বদা সৎ-চিৎ-আনন্দ। এর মধ্যে প্রথম দু'টি সকল অবস্থায় অনুভূত হয় অপরপক্ষে শেষেরটি কেবল সুষুপ্তিতে অনুভূত হয় বলা হয়। প্রশ্ন হয় কি করে আত্মার প্রকৃত সত্তা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় হারিয়ে যায়। সত্য বলতে কি এটা হারায় না। সুষুপ্তিতে কোন মন নেই আর আত্মা স্বয়ং প্রকাশ হয় অন্যপক্ষে অন্য দু'টি অবস্থায় যা দেখা যায় সেটা আত্মার প্রতিফলিত বোধ। সুষুপ্তিতে চিন্তাগুলো থেমে যাওয়ার পর আনন্দ অনুভূত হয়। এটা অন্য সময়েও প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি বা প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলো চিত্ত বৃত্তি।

যখন মানুষ রাস্তায় হেঁটে চলছে তার মন ক্ষণস্থায়ী চিন্তায় পরিপূর্ণ। মনে কর সে একটা বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সেখানে বেশ ভাল আম বিক্রি হচ্ছে। সে আম দেখে পছন্দ করলে ও কিনলে। তারপরই সে সেগুলো আস্বাদ করতে উদ্‌গ্রীব হল। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি বাড়ী এল ; সেগুলো খেলে ও খুশি হল। যখন অস্থায়ী চিন্তাগুলো আম দেখে খুশি হল তখন এটা প্রিয়বোধ ; যখন সে সেগুলো কিনে নিজের করলে তখন মোদ ; শেষে যখন সে খেলো, সেটা প্রমোদ। এই তিন প্রকার আনন্দই অন্য চিন্তাগুলো চলে যাওয়ার জন্য হয়।

৩রা-৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৬৭। শ্রীভগবান 'সদ্‌বিদ্যার' প্রথম কয়েকটি পদ শ্রীম্যাক্‌-ইভারকে এরূপে ব্যাখ্যা করলেন—

[১] প্রথম পদটি মঙ্গলাচরণ। এই বিষয়বস্তুটি কেন এখানে আনা হল? জ্ঞান কি সত্তা ছাড়া পৃথক হতে পারে? সত্তাই কেন্দ্রবিন্দু—হৃদয়। পরমসত্তার ধ্যান ও স্তুতি কিরূপে হতে পারে? বিশুদ্ধ আত্মরূপে বিরাজ করাই মঙ্গলাচরণ। এখানে জ্ঞানমার্গ অনুসারে নিরাকার ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হয়েছে।

[২] দ্বিতীয় পদে সাকার ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পদে আত্মার একত্বের উল্লেখ আছে ; বর্তমান পদে পরমেশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে।

অধিকন্তু দ্বিতীয় পদে (১) পাঠের অধিকারী, (২) বিষয়বস্তু, (৩) সম্বন্ধ এবং (৪) ফল বলা হয়েছে। যে এর উপযুক্ত সেই পাঠের অধিকারী। জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বই যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

সবাই জানে যে তারা একদিন না একদিন মারা যাবে ; কিন্তু তারা এ বিষয় গভীরভাবে ভাবে না। সবারই মৃত্যুভয় আছে—এ ভয়টা ক্ষণিক। মৃত্যুকে ভয় হয় কেন? কারণ 'দেহ-আমি' বোধ। সকলেই বেশ ভালভাবেই জানে যে শরীরটা মরে ও সেটা দাহ করা হয়। শরীরটা যে মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায় তা সবাই বিদিত আছে। 'দেহ-আমি' বুদ্ধি থাকার জন্য আমি নিজেও মরে যাবো মনে ক'রে মৃত্যুকে ভয় হয়। জন্ম ও মৃত্যু কেবল দেহের হয় কিন্তু সেটা আত্মাতে আরোপিত হয়, তা থেকেই আত্মার জন্ম ও মৃত্যুরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়।

জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করার চেষ্টায় মানুষ পরমেশ্বরের নিকট তার রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করে। এরূপে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির জন্ম হয়। তাঁকে কিরূপে আরাধনা করা যাবে? জীব দুর্বল

ও সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাঁর কাছে কিরূপে উপস্থিত হওয়া যাবে? নিজের সম্পূর্ণ ভার তাঁর নিকট অর্পণ করাই একমাত্র পথ; সম্পূর্ণ সমর্পণই একমাত্র উপায়। অতএব সে ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। সমর্পণের অর্থ নিজেকে ও তার সব কিছুকেই সেই করুণাময়ের নিকট অর্পণ। তখন মানুষের আর কি থাকে? কিছু না—সে স্বয়ং কিংবা তার নিজস্ব বলতে কিছুই থাকে না। জন্ম ও মৃত্যুযুক্ত শরীরটা ঈশ্বরে সমর্পিত হলে মানুষের আর তার জন্য ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। তখন জন্ম ও মৃত্যু তাকে ভয় দেখাতে পারে না। ভয়ের কারণ শরীর, এটা আর এখন তার নয় সুতরাং এখন সে আর ভয় পাবে কেন? কিংবা ভয় পাওয়ার জন্য তার পৃথক ব্যক্তিসত্তা কোথায় যে ভয় পাবে?

এরূপে আত্মজ্ঞান ও আনন্দলাভ হয়। অতএব এটাই বিষয়-বস্তু—দুঃখমুক্তি ও আনন্দলাভ। এটাই চরম উৎকর্ষ। সমর্পণ আনন্দেরই সমার্থ। এটাই সম্বন্ধ।

ফল বিষয়বস্তুর মনন ও যা নিত্যসিদ্ধ নিত্যবর্তমান তার জ্ঞানলাভ। পদটি 'মৃত্যুঞ্জয়' শব্দে সমাপ্ত হয়েছে।

[৩] পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অর্থ সূক্ষ্ম ক্রিয়া (তন্মাত্রা), যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এদের অনুপাত ভেদে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। তিনগুণ অনুসারে তাদের এইরূপ ভেদ হয়—

তমঃ দ্বারা স্থূলতত্ত্ব
রজঃ দ্বারা বস্তুজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়
সত্ত্ব দ্বারা ইন্দ্রিয়গোচর বিবিধ জ্ঞান ; আর
তমঃ দ্বারা স্থূলবস্তু অর্থাৎ জগৎ
রজঃ দ্বারা প্রাণবায়ু ও কর্মেন্দ্রিয়
সত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়।

কর্মেন্দ্রিয় সকল গ্রহণ, চলন, বাক্যকথন, বিসর্জন ও সন্তান উৎপাদনের জন্য অঙ্গ বিশেষ।

এখন ঘণ্টা ধ্বনিটা বিবেচনা কর, শব্দ শ্রবণের সঙ্গে যুক্ত ; ঘণ্টাটা বস্তু তমোগুণের দ্বারা গঠিত। রাজসিক তন্মাত্রা শব্দের স্পন্দন আকারে ঘণ্টাটার চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে আকাশের মাধ্যমে কানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রবণরূপ ক্রিয়া হয়। একে ধ্বনি বলে অনুভব করাই সত্ব তন্মাত্রা।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়েও এইরূপ—স্পর্শ—বায়ু তন্মাত্রা : রূপ—তেজ তন্মাত্রা ; স্বাদ—অপ তন্মাত্রা ; গন্ধ—পৃথ্বী তন্মাত্রা।

তন্মাত্রাকে পদার্থের সূক্ষ্মতম পরমাণু বলে মনে করা ঠিক নয় কারণ এটা অসম্পূর্ণ। এরা জগতের সৃষ্টির কারণসরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সূক্ষ্মরূপ। এইরূপে জগতের সৃষ্টি হয়।

উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে এই ধারণাগুলো বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

[৪] এই পদে বলা হয়েছে যে সকলেই একটা বিষয়ে এক-মত। সেটা কি ? দ্বৈত ও অদ্বৈতের অতীত, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত, জীব ও ঈশ্বরের অতীত এক কথায় সকল ভেদের অতীত অবস্থা। এটা অহংকারশূন্য অবস্থা। "কি করে লাভ করা যায় ?" সেটাই প্রশ্ন। এটাতে বলা হয়েছে জগতকে ত্যাগ ক'রে। এখানে 'জগৎ' বলতে তার সম্বন্ধে চিন্তাগুলো বোঝাচ্ছে। যদি এরূপ চিন্তা না ওঠে, অহংকারও ওঠে না। সেখানে কোন জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় নেই। সে অবস্থাটা এইরূপ।

৫৬৮। শ্রীভি. জি. শাস্ত্রী শ্রীভগবানকে খবরের কাগজের একটা অংশ দেখালে। সেটাতে শ্রীরামতীর্থের একটা ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে ১৯৫০ সালের পূর্বে ভারত তার পূর্বতন গৌরব লাভ করবে।

শ্রীভগবান বললেন—ভারত যে এখন তার গৌরবের তুঙ্গে নেই সেটাই বা মনে করব কেন ? গৌরবটা তোমার চিন্তায়।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৬৯। শ্রীকে. এল. শর্মার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান 'দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র' সম্বন্ধে এরূপ বললেন।

আমি প্রথমে এর একটা ব্যাখ্যা লিখব ঠিক করেছিলাম। শ্রীরঙ্গনাথ আইয়ার স্তোত্রের আমার লেখা তামিল অনুবাদটা নিয়ে গিয়ে অপ্পলপ্পট্টু (পাঁপড়ের গীত)-এর সঙ্গে ছাপালে। পরে সে আমায় সেটা বিস্তার করতে বলে। আমার কাছে ভূমিকাটা লেখা ছিল। সে সেটা দেখে ছাপাবার জন্য নিয়ে গেল। আমি আর ব্যাখ্যাটা লিখলাম না। স্তোত্র সম্বন্ধে—

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চারজন মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। তারা সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনৎসুজাত। তারা সৃষ্টিকর্তাকে তাদের সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করলে। ব্রহ্মা বললেন, "আমাকে বিশ্বসৃষ্টি করতে হবে কিন্তু আমি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করতে চাই। তোমরা যাতে সৃষ্টি বিস্তার করতে পারো সেজন্য তোমাদের আনা হয়েছে। তার অর্থ সন্তান সৃষ্টি কর।" তাদের সেটা পছন্দ হল না। তারা ভাবলে তারাই বা কেন এ বিষয়ে জড়িত হবে। আপন উৎস খোঁজাই একজনের স্বভাব। অতএব তারা তাদের উৎস ফিরে পেতে ও আনন্দময় হতে চাইলে। সুতরাং তারা ব্রহ্মার আজ্ঞা না শুনে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেল আর আত্মজ্ঞানের জন্য উপদেশ লাভের বাসনা করলে। তারা আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত অধিকারী ছিল। কেবল শ্রেষ্ঠ গুরুই উপদেশ দিতে পারেন। এরূপ গুরু যোগিরাজ শিব ছাড়া আর কে হতে পারে? শিব পবিত্র অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে তাদের দর্শন দিলেন। যোগিরাজ হয়ে কি তিনি যোগ অভ্যাস করবেন? তিনি বসেই সমাধি মগ্ন হলেন। তিনি পূর্ণ শান্তিতে শোভমান হলেন। মৌন বিরাজ করতে লাগল। তারা তাঁকে দেখলে। তৎক্ষণাৎ ফল হল। তারাও সমাধিস্থ হয়ে গেল আর তাদের সকল সংশয় মিটে গেল।

মৌনই প্রকৃষ্ট উপদেশ। এটাই পরম উপদেশ। এটা সর্বোচ্চ অধিকারীর উপযুক্ত। অন্যেরা এ থেকে পূর্ণ প্রেরণা লাভ করতে পারে না। সুতরাং তাদের সত্য বোঝাবার জন্য বাক্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সত্য অনির্বচনীয়। এর জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সব থেকে বেশী যা করা যায় তা কেবলমাত্র সত্যের দিগ্‌দর্শন। সেটা কি করে করা যাবে?

মানুষ ভ্রমগ্রস্ত। যদি ভ্রমটা দূর করা যায় তবে তারা সত্য অনুভব করবে। তাদের ভ্রমের মিথ্যাত্ব বলতে হবে। তবেই তারা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। বৈরাগ্য লাভ হবে। তখন তারা সত্যের অনুসন্ধান করবে অর্থাৎ আত্মাকে খুঁজবে। সেটাই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করাবে। শ্রীশঙ্কর শিবের অবতার হওয়ায় তিনি পতিত লোকেদের প্রতি করুণাময় ছিলেন। তিনি চাইতেন যে সবাই তাদের আনন্দময় আত্মাকে জানুক। তিনি তাঁর মৌনের দ্বারা সবার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন নি। সুতরাং তিনি স্তুতিরূপে 'দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র' রচনা করলেন যাতে সেটি পাঠ করে লোকে সত্যকে অনুভব করতে পারে।

ভ্রমের স্বরূপ কি? সকলেই ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপ সম্ভোগে আসক্ত। এর কারণ একটা ভ্রম যে ভোগ্য বস্তুগুলো সত্য। অহংকার, জগৎ ও সৃষ্টিকর্তাই এই ভ্রমের মূল। যদি এগুলো আত্মার অতিরিক্ত নয় বলে জানা যায় তবে আর কোন ভ্রম থাকে না।

প্রথম চারটি শ্লোকে জগৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। দেখানো হয়েছে এটা সেই 'গুরু' যার আত্মা ও সাধকের আত্মা অভিন্ন, কিংবা সেই 'গুরু' যার কাছে সাধক আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় চারটি শ্লোকে ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয়েছে যার আত্মা ও গুরুর আত্মা এক। নবম শ্লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে আর দশম শ্লোকে সিদ্ধি বা আত্মজ্ঞানের বিষয় বলা হয়েছে।

এইরূপে স্তোত্রটি রচিত হয়।

এখানে দর্পণটা কি ? আমরা যাকে আর্শি বলে জানি সেটা একটা জড় বস্তু যা আলো প্রতিফলন করে। ব্যক্তির মধ্যে কোনটা আর্শির সমপর্যায় ? স্বপ্রকাশ আত্মার জ্যোতি মহত্তত্ত্বের ওপর প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত বোধই মনাকাশ বা শুদ্ধ মন। এটা ব্যক্তির বাসনাকে (সংস্কারকে) প্রকাশ করে, সেকারণে 'আমি' ও 'এই' বোধ জাগে।

আবার ওপর ওপর স্তোত্রটি পড়লে মনে হয় যে বন্ধন, মুক্তি ইত্যাদি সবই গুরু অর্থাৎ দক্ষিণামূর্তির সম্পর্কিত। এটা অসম্ভব। উদ্দেশ্য তাঁতে সমর্পণ করা।

৫৭০। একজন দর্শনার্থী শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—

নির্গুণ উপাসনা ক্লেশকর ও দুঃখদায়ক বলা হয়। সে গীতার 'অব্যক্তা হি' ইত্যাদি ১২।৫ শ্লোকটি উদ্ধৃত করলে।

ম—যা প্রকাশ তাকে অপ্রকাশ (অস্তিত্বহীন) বিবেচনা করে সংশয় উৎপন্ন করা হয়। আত্মার থেকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ কি আর কিছু হতে পারে ? এর থেকে কি আর কিছু বেশী স্পষ্ট ?

ভ—সগুণ উপাসনা সহজ মনে হয়।

ম—যা তোমার পক্ষে সহজ তাই কর।

৫৭১। জীবের নানাত্ব অনেকেরই তর্কের বিষয়বস্তু। জীব কেবল অহংকারের ওপর প্রতিফলিত একটা প্রকাশমাত্র। লোকে নিজেকে অহংকার বলে নির্ধারণ করে আর তর্ক করে যে তার মত আরও অনেক আছে। তাকে সহজে তার মনোভাবের অবাস্তবতা বোঝানো যায় না। একজন লোক যে স্বপ্নে বহু ব্যক্তি দেখে সে কি তাদের অনেক বলে বিশ্বাস ক'রে ধরে থাকে আর জেগে উঠে তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয় ?

তার্কিকের এই যুক্তি বোধগম্য হয় না।

আবার চাঁদ রয়েছে। একে যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে দেখো ; সে একই চাঁদ। সবাই এটা জানে। এখন মনে কর অনেকগুলো জলপাত্র রয়েছে তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে। এই প্রতিবিম্বগুলো পরস্পর পৃথক আর চাঁদ থেকেও পৃথক। যদি একটা পাত্র ভেঙ্গে যায় সেই প্রতিফলনটা অদৃশ্য হয়। এই অদৃশ্য হওয়ায় প্রকৃত চাঁদের বা অন্যান্য প্রতিবিম্বের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। একজনের মোক্ষলাভ করাও ঠিক সেইরূপ। সেই একমাত্র মোক্ষলাভ করে।

নানাত্ববাদীরা অদ্বৈতবাদীদের এই যুক্তিটা দেয়, "যদি আত্মা এক হয়, একজন যদি মুক্ত হয় তবে সবাই মুক্ত হয়ে গেছে বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না। অতএব অদ্বৈতবাদ ঠিক নয়।"

এই তর্কের দুর্বলতা এই যে আত্মার প্রতিফলিত জ্যোতিকেই আত্মার মূল জ্যোতি বলে ভুল করা হয়। অহংকার, জগৎ ও ব্যক্তিসত্তা একজনের বাসনার পরিণাম। এগুলো চলে গেলে সেই ব্যক্তির ভ্রমও চলে যায় অর্থাৎ একটা কলসী ভেঙ্গে গেলে তার আপেক্ষিক প্রতিফলনও শেষ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আত্মা কখনই বদ্ধ হয় না। অতএব এর মুক্তি বলে কিছু নেই। যত বিপদ কেবল অহংকারকে নিয়ে।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৮

একটা প্রশ্ন হল যে জীবের নানাত্ব নিরূপণে কি দোষ হয়। জীব নিশ্চয় বহু। কারণ জীব কেবল অহংকার ও আত্মারই প্রতিফলিত জ্যোতির দ্বারা গঠিত। আত্মার নানাত্ব ভুল কিন্তু জীবের নয়।

ম—জীবকে তাই বলা হয় কারণ সে জগৎ দেখে। একজন স্বপ্ন দর্শনকারী স্বপ্নে অনেক জীব দেখে কিন্তু তার সবগুলো সত্য নয়। একমাত্র স্বপ্ন দ্রষ্টাই আছে আর সে-ই সব দেখে। ব্যক্তি ও জগৎ

সম্বন্ধেও তাই। একাত্মবাদকে একজীববাদও বলা হয়। এই মতবাদ বলে যে জীব মাত্র একটি যে সমস্ত জগৎ ও তাতে নানা জীব দেখে।

ভ—সুতরাং এখানে 'জীব' শব্দে আত্মা বোঝায়।

ম—তাই হয়। কিন্তু আত্মা দ্রষ্টা নয়। এখানে কিন্তু বলা হয়, সে জগৎ দেখে। সুতরাং তাকে জীবরূপে পৃথক করা হয়।

৫৭২। ভ—যে মৃত্যুভয় সকলেরই আছে তার উপযোগিতা কি?

ম—সত্য, এটা সবার। এই ভয়ে কোনই লাভ হয় না কারণ মনের বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়ে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতে তাকে বৈরাগ্যের পথে নিয়ে যায় না আর সে বিচার করতেও সক্ষম হয় না।

ভ—তবে আপনি কোন পার্থক্য না করে সবাইকে একই উপদেশ কি করে দেন?

ম—আমি কি বলি? প্রত্যেকের অহংকারকে মরতে হবে। সে এটা বিচার করুক। এই অহংকারটা আছে কিংবা নেই? বার বার চিন্তা করতে করতে সে ক্রমশঃ উপযুক্ত হবে।

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৭৩। চৌদ্দ বছরের পুরাতন ভক্ত শ্রীরঙ্গনাথ আইয়ার এখানে দর্শনার্থে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—

একজনের মৃত্যুর কতদিন পরে পুনর্জন্ম হয়?

ম—এটা দীর্ঘ বা অল্পকাল পরে হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানীর এরূপ কোন পরিবর্তন হয় না; বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলে, সে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কেউ বলে যে যারা মৃত্যুর পর জ্যোতির্মার্গে যায় তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, অন্যপক্ষে যারা তমোমার্গ লাভ করে তারা সূক্ষ্ম শরীরে কর্মফল ভোগ ক'রে আবার জন্মগ্রহণ করে।

যদি তাদের পাপ ও পুণ্য সমান হয় তারা তৎক্ষণাৎ এখানে জন্মগ্রহণ করে। পুণ্য যদি পাপের থেকে বেশী হয় তবে সূক্ষ্ম শরীরে স্বর্গে যায় আর তারপর এখানে জন্মায় ; যদি পুণ্যের থেকে পাপ বেশী হয় তারা নরকে যায় আর পরে এখানে জন্মায়।

বলা হয় যে, একজন যোগভ্রষ্টও এই গতি লাভ করে। এসব শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। একজন কেবল যা আছে তাই হয়ে থাকে। এটাই একমাত্র সত্য।

৫৭৪। ভ—আসন কি ? এগুলো কি দরকারী ?

ম—যোগশাস্ত্রে অনেক আসনের কথা ও তাদের ফলাফল বলা হয়েছে। বসার আসন বাঘছাল, কুশ ইত্যাদি ; আসন 'পদ্মাসন', 'সুখাসন' ইত্যাদি। এগুলো কেন—কেবল নিজেকে জানার জন্য ? "আমি শরীর ; শরীরের বসার জন্য একটা স্থান চাই ; এটা পৃথিবী" এই ভেবে সে একটা আসন খোঁজে। কিন্তু ঘুমে কি সে তার অবস্থান বা শয্যার কথা—খাটের ওপর বিছানা, পৃথিবীর ওপর খাট রয়েছে ভাবে ? সেখানেও কি সে থাকে না ? তখন সে কিরূপে ছিল ?

প্রকৃত কথা—আত্মারূপ সত্তা থেকে অহংকারের উদয় হয়, সে নিজেকে শরীর বলে মনে করে, জগতকে সত্য বলে ধরে নেয়, বস্তুর পার্থক্য বোধ করে, অহমিকারূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়ে সে আবোল-তাবোল ভাবে আর আসন খোঁজে। সে বোঝে না যে সে-ই সব কিছুর কেন্দ্র আর এরূপে সকলের আধার।

প্রশ্ন করা হলে সে আসন ও পাদুকার উপযোগিতা সম্বন্ধে মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বক শক্তি ইত্যাদির কথা বলে। সে কল্পনা করে যে এগুলো না হলে তার তপস্যার শক্তি কমে যাবে।

এগুলো তাদের শক্তি কোথা থেকে পায় ? তারা ফলটা দেখে, কারণটা খোঁজে আর মনে করে যে এগুলো বুঝি আসন ও

পাদুকার শক্তি। একটা পাথর ছুঁড়ে দিলে ফিরে আসে কেন? সে বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য। বেশ, এগুলো কি তার চিন্তা থেকে পৃথক? ভেবে বলতো—এই পাথর, এই পৃথিবী ও মাধ্যাকর্ষণ কি তার চিন্তা ছাড়া পৃথক কিছু। এগুলো কেবল তার মনেই রয়েছে। সে নিজেই শক্তি ও তার নিয়ামক। সে নিজেই সব কিছুর কেন্দ্র ও তাদের আধার। সে নিজেই আসন।

আসনটা তার দৃঢ়রূপে বসার জন্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র নিজের প্রকৃত অবস্থা ছাড়া সে কোথায় ও কিরূপে দৃঢ়ভাবে বসতে পারে? এটাই আসন।

৫৭৫। ভ—কাম, ক্রোধ ইত্যাদি কিরূপে জয় করা যায়?

ম—কামনা বা কাম, ক্রোধ ইত্যাদি তাকে কষ্ট দেয়। কেন? অহমিকার জন্য; এই অহমিকা অজ্ঞানের জন্য; অজ্ঞান ভেদ-বুদ্ধির জন্য; ভেদবুদ্ধি জগতকে সত্য মনে করার জন্য, এটা আবার 'দেহাত্মবুদ্ধি'র জন্য হয়। শেষেরটা কেবল অহংকার জাগলেই হয়। অহংকার না জাগলে সমগ্র দুঃখপ্রদ শৃঙ্খল-পরম্পরার অবসান হয়।

একটা লোহার সিন্দুকে টাকা জমানো আছে। মানুষ বলে এটা তার নিজের, সিন্দুকটা এরূপ বলে না। স্বত্ব-অহমিকাটাই দাবী করার কারণ।

কিছুই আত্মা নিরপেক্ষ নয়, এমনকি অজ্ঞানও নয়—কারণ অজ্ঞানটাও আত্মার শক্তি, সেখানে থাকে কিন্তু তাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু এটা অহমিকাকে অর্থাৎ জীবকে প্রভাবিত করে। সুতরাং অজ্ঞানটা জীবের।

কিরূপে? মানুষ বলে, "আমি আমাকে জানি না।" সেখানে কি দু'টি আত্মা আছে—একটা বিষয়ী আর অন্যটা বিষয়? সে এটা স্বীকার করতে পারে না। তবে কি তার অজ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে? না। অহংকারের উদয়ই অজ্ঞান, আর কিছুই নয়।

৫৭৬। সূত্রভাষ্য।

সূত্রের উদ্দেশ্য শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা ও তার প্রতিষ্ঠা করা। ভাষ্যে বিরুদ্ধ মতের ব্যাখ্যা ক'রে তাকে খণ্ডন ক'রে তার বিস্তারিত আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্তে আসা হয়, একই মতবাদের মধ্যে আবার মতদ্বৈধ আছে, মণ্ডনকারী ও খণ্ডনকারী মতবাদও আছে। আবার একই শাস্ত্রকে বিভিন্ন মতবাদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় আর পরস্পর-বিরুদ্ধ ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসা হয়।

তবে আর সূত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ কি করে হয়?

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৭৭।

এসবই বেদান্তের পরিভাষা।
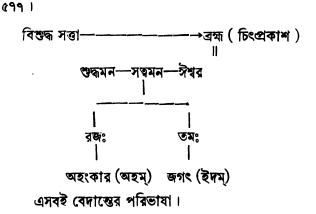
৫৭৮। এখানে এসে অনেকে নিজের কথা জিজ্ঞাসা করে না। তারা জানতে চায়, "জীবনমুক্ত জ্ঞানী কি জগৎ দেখেন? তিনি কি কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন? বিদেহমুক্তি কি? মুক্তি কি দেহ থাকা অবস্থায় কিংবা দেহত্যাগের পর হয়? জ্ঞানীদের দেহ কি জ্যোতিতে

মিলিয়ে যাবে কিংবা এরূপ কোন ভাবে অদৃশ্য হবে? জ্ঞানীর শরীর যদি মৃত হয়ে পড়ে থাকে তবে কি সে মুক্ত হতে পারে?"

তাদের প্রশ্নের আর শেষ নেই। এইসব ভেবে দুশ্চিন্তা করা কেন? এই সব জানা কি মুক্তি?

সেজন্য আমি তাদের বলি, "মুক্তির কথা থাক। বন্ধন কি আছে? এটা জানো। সবার আগে নিজেকে জানো।"

৫৭৯। আবরণ জীবকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে না। সে জানে যে সে 'আছে'; কেবল জানে না যে সে কে। সে জগৎ দেখে, কিন্তু এটা যে কেবল ব্রহ্ম তা দেখে না। এটা অন্ধকারে আলো (কিংবা অজ্ঞানে জ্ঞান)।

একটা সিনেমায় প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করা হয়, একটা কৃত্রিম আলো আনা হয়, কেবল সেই আলোতেই ছবিগুলো প্রক্ষেপ করা হয়।

এরূপ বৈচিত্র্যের জন্য একটা প্রতিফলিত আলো চাই। একজন নিদ্রিত লোকই স্বপ্ন দেখে, সে ঘুম ছাড়া নয়—কেবল ঘুমের অন্ধকারে বা অজ্ঞানেই সে তার কল্পিত স্বাপ্নিক বস্তু দেখে।

অনুরূপভাবে অজ্ঞানের অন্ধকারেই জগতরূপ জ্ঞানের উদয় হয়।

এই আবরণটা অবিদ্যার স্বভাব, এটা আত্মার নয়—এটা আত্মাকে কোনমতেই প্রভাবিত করে না; কেবল জীবকে আবৃত করে। অহংকারটা জড়—আত্মার প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হলে একে জীব বলে। কিন্তু অহংকার আর প্রকাশকে পরস্পর হতে পৃথক করা

যায় না, এরা সর্বদাই সংযুক্ত থাকে। এই মিশ্র বস্তুই জীব, যা সকল ভেদবুদ্ধির মূল। এসবই প্রশ্নকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বলা হয়।

সূক্ষ্ম শরীরের সংস্থান এরূপ। ইন্দ্রিয় ও অন্য করণগুলো পৃথক পৃথক কাজ করে; অন্যপক্ষে অন্তঃকরণ ও প্রাণবায়ু একযোগে কাজ করে। অতএব প্রথমোক্তগুলো ব্যষ্টি ও শেষোক্তগুলো সমষ্টি।
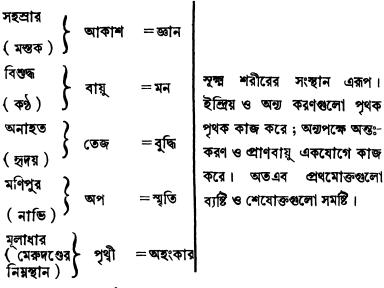
আবরণ দু'ভাবে আবৃত করে।
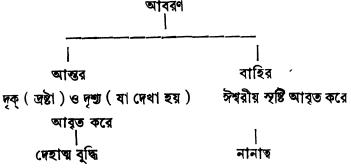
জীব ঈশ্বর থেকে কিংবা মায়া অবিদ্যা থেকে স্বতন্ত্র নয়। কেবল ঘুম থেকে জেগে উঠলেই মানুষ শরীর ও জগৎ দেখে, কিন্তু ঘুমে দেখে না। অতএব বর্তমান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে বোঝে যে সে সুষুপ্তিতেও ছিল। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে সুষুপ্তিতে জীব বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে যেখানে শরীর ও জগৎ দেখা যায় না।

ভ—জীব কি প্রতিফলিত চৈতন্য, 'আমি'-চিন্তা নয় ?

ম—সেও একজন জীব। পূর্ববর্তী অবস্থাতেও একজন জীব ; এরা একে অন্যের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধরূপে যুক্ত। সুষুপ্ত জীব ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র নয়। জাগ্রত হলে সে বলে 'আমি শরীর'। যদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে বিরাট হয়, শরীরটা সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিন্দু। এরূপে শরীরটা বিরাটের আর বিরাটেই রয়েছে। তবে জীবের আর কি রইল ? কেবল অহংকারই তাকে অন্যের নয় পরন্তু নিজের ব'লে শরীরটাকে দাবী করায়। সে বিরাট হতে স্বতন্ত্র হতে পারে না।

অনুরূপভাবে—

১	২	৩	৪	৫
ঈশ্বর	হিরণ্যগর্ভ	বিরাট	মায়া	ব্রহ্ম
কারণিক	কারণিক	কারণিক	কারণিক	(কারণ)
বিরাটসত্তা	সূক্ষ্মসত্তা	স্থূলসত্তা	অবিদ্যা ঈশ্বরের উপাধি	
|	|	|	|	|
প্রাজ্ঞ	তৈজস	বিশ্ব	জীবের	জীব
ব্যষ্টিসত্তা	ব্যষ্টিসত্তা	ব্যষ্টিসত্তা	উপাধি	(পরিণাম)
সুষুপ্তিতে	সূক্ষ্মশরীর	স্থূলশরীর	অবিদ্যা	

তারা বলে যে এই পাঁচটিকে এক করতে হবে। একে তারা পঞ্চীকরণ বলে। এসব কেবল বাদবিতণ্ডা !

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮০। রাজকোট থেকে বাসে করে একটি দল এসেছে। সেই দলে চারজন জায়গীরদার, সেবিকাসহ চারজন মহিলা ও একজন রক্ষী ছিল। তারা প্রায় সকাল ১১টার সময়ে পৌঁছাল। তাদের নিজেদের

ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পৌনে একটার সময়ে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনান্তে তারা দুপুর একটা বেজে পাঁচ মিনিটে বিদায় নিলে।

তাদের মধ্যে একজন বললে—

ইনি ঠাকুর সাহেবের মাতা। আমরা অনেক দূর থেকে শ্রীমহর্ষির দর্শনের জন্য এসেছি। তিনি কি কৃপা ক'রে আমাদের কিছু উপদেশ দেবেন?

শ্রীভগবান হাসলেন ও বললেন—

তারা যে দর্শনের জন্য এতদূর থেকে এসেছে, এ বেশ ভাল। এইটুকু বলাই যথেষ্ট। আমার আর কি বলার আছে? (আহারের ঘণ্টা)।

পৌনে একটার সময়ে—

ভ—একজন জ্ঞানী কি একজন যোগীর থেকে ভিন্ন? এদের মধ্যে কি পার্থক্য?

ম—শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলে জ্ঞানীই প্রকৃত যোগী আর সেই প্রকৃত ভক্ত। যোগ কেবল একটা সাধনা আর জ্ঞান সিদ্ধি।

ভ—যোগের কি প্রয়োজন আছে?

ম—এটা একটা সাধনা। জ্ঞান লাভ হলে এর প্রয়োজন নেই। সব সাধনাকেই যোগ বলে, যথা কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ, অষ্টাঙ্গযোগ ইত্যাদি। যোগ কি? যোগের অর্থ যুক্ত হওয়া। বিয়োগ থাকলেই যোগ হওয়া সম্ভব। একজনের এখন বিয়োগরূপ ভ্রম রয়েছে। এই ভ্রমটা কাটাতে হবে।. এটা দূর করার উপায়কে যোগ বলে।

ভ—কোনটি সব থেকে ভাল উপায়?

ম—এটা ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেকেই তার পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মায়। একটা উপায় হয়ত একজনের পক্ষে সহজ, অন্যটা অন্যের পক্ষে। এ বিষয়ে কোন সুনিশ্চয়তা নেই।

ভ—একজন কিভাবে ধ্যান করবে ?

ম—ধ্যান কি ? সাধারণতঃ এটা একটিমাত্র চিন্তায় মন স্থির করা বোঝায়। অন্য চিন্তাগুলো সে সময়ে দূরে থাকে। এই একটি চিন্তাকেও সময়ে লয় হতে হবে। চিন্তাশূন্য চেতনাই লক্ষ্য।

ভ—অহংকার কি করে দূর করা যায় ?

ম—অহংকারটা দূর করতে গেলে আগে তাকে ধরতে হবে। প্রথমে একে ধর আর বাকীটা সহজেই হবে ?

ভ—তাকে কিরূপে ধরা যাবে ?

ম—তুমি কি বলতে চাও একটা অহংকার আর একটা অহংকারকে ধরবে বা অন্যটাকে দূর করবে ? অহংকার কি দু'টি আছে ?

ভ—ঈশ্বরের কাছে কিরূপে প্রার্থনা করব ?

ম—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে সেখানে নিশ্চয় একটা 'আমি' আছে। 'আমি'টা নিশ্চয় ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ, অপরপক্ষে ঈশ্বরকে তা মনে হয় না। যেটা সব থেকে অন্তরঙ্গ তাকে খোঁজো তারপর অন্যটি নির্ণয় করা যাবে আর প্রয়োজন হলে প্রার্থনাও করা যাবে।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮১। একটি ছোটছেলের হাতে কিছু দিয়ে তাকে তার মা-বাবা শ্রীভগবানকে দেওয়ার জন্য এগিয়ে দিলে। ছেলেটিও খুশিমনে সেটা দিলে। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন "এটা দেখ! যখন ছোট ছেলে একটা জিনিস 'জেজা'কে (ঈশ্বর) দেয় তখন সেটা ত্যাগ। দেখো ছোট ছেলে-মেয়েদের ওপর 'জেজা'র কি প্রভাব! কিছু দেওয়ার অর্থ স্বার্থত্যাগ। এটাই নিষ্কাম কর্মের মূল বস্তু। এর অর্থ প্রকৃত বৈরাগ্য। এই দানের বৃত্তিকে অনুশীলন করলেই ত্যাগ হয়। যদি কোন কিছু স্বেচ্ছায় দেওয়া হয় তবে দাতা ও গ্রহীতা দু'জনেরই আনন্দ

হয়। যদি সেটা চুরি করা হয় তবে উভয়েরই দুঃখ। দান, ধর্ম, নিষ্কাম কর্ম সবই কেবল ত্যাগ। 'মমত্ব' ত্যাগ করলেই চিত্তশুদ্ধি। 'আমিত্ব' ত্যাগ করলেই জ্ঞান। যখন দানের প্রবৃত্তিকে বিকশিত করা হয় তখন তা জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

আবার একটু পরে একটি ছোট ছেলে মা-বাবার সঙ্গ ছাড়াই একলা এল। সে বাসে করে 'সেন্‌গাম' থেকে এসেছে। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন, "ছেলেটি এখানে আসার জন্য মা-বাবাকে ছেড়ে এসেছে। এটাও ত্যাগের একটা দৃষ্টান্ত।"

২১শে ও ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮২। একজন আন্ধ্র ভদ্রলোককে শ্রীভগবান বললেন—যদি একজন কেবল কামনা করে যায়, তার অভাব কখন পূর্ণ হয় না। অপরপক্ষে সে যদি কামনাশূন্য হয়ে থাকে তবে তার কিছু না কিছু জুটে যায়। আমরা স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, জীবিকা ইত্যাদিতে নেই ; কিন্তু তারাই আমাদের মধ্যে রয়েছে ; তারা একজনের প্রারব্ধ অনুসারে আসে আর যায়।

জগৎ দর্শন হোক বা না হোক মন স্থির হওয়াই সমাধি।

পরিবেশ, কাল ও বস্তু সবই আমাতে। সেগুলো কি করে আমার থেকে স্বতন্ত্র হয় ? তারা পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু আমি অপরিবর্তনীয়, সর্বদা একই থাকি। বিষয়বস্তুকে আকার ও নামের দ্বারা পৃথক করা হয়, অন্যপক্ষে প্রত্যেকেরই এক নাম আর সেটা হল 'আমি'। যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা কর সে বলবে 'আমি' আর নিজের সম্বন্ধে বলতেও বলবে 'আমি', এমনকি তিনি যদি ঈশ্বরও হন, তাহলেও। তাঁরও নাম কেবলমাত্র 'আমি'।

স্থানের সম্বন্ধেও তাই। যতক্ষণ আমি নিজেকে শরীর ভাবি

ততক্ষণই স্থানের পার্থক্য আছে ; নতুবা নেই। আমি কি শরীর ? শরীর কি নিজেকে 'আমি' বলে পরিচয় দেয় ?

স্পষ্টতঃই এসব আমাতে রয়েছে। এই সব কিছু মুছে ফেললে অবশিষ্ট শান্তিই 'আমি'। এই সমাধি, এই 'আমি'।

৫৮৩। শ্রীভি. গণপতি শাস্ত্রী—শ্রীভগবানকে স্পেনদেশীয় মহিলা মার্সিডিস্ ডি ওকোর্তার একটি চিঠি দেখালে যাতে লেখা ছিল যে সে আগামীকাল এখানে আসছে। শ্রীভগবান বললেন, "আমার এখানে থাকার জন্য কত লোকের কত কষ্ট, দেখো।"

স্মৃতিচারণ

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮৪। জনৈক দর্শনার্থী পাখা টানতে লাগল। শ্রীভগবান বললেন—"শীতের জন্য ওরা আমার পাশে আগুন রেখেছে। পাখা টানতে হবে কেন ?

তারপর তিনি বলে চললেন—"এক শীতের সকালে আমি বিরূপাক্ষগুহার বাইরে বসেছিলাম। বেশ শীত অনুভূত হচ্ছিল। লোকেরা আসত, আমায় দেখত আর চলে যেত। একদল অন্ধ্রপ্রদেশের দর্শনার্থী এসেছে। তারা কি করছিল আমি তা লক্ষ্য করিনি। তারা আমার পিছনে ছিল। হঠাৎ 'ঠক্' করে একটা শব্দ—আর আমার মাথার ওপর জল! আমি শীতে কেঁপে উঠলাম। ফিরে দেখলাম। তারা একটা নারিকেল ভেঙ্গে জলটা আমার মাথায় ঢেলেছে। তারা ভাবলে পূজা করা হল। তারা আমাকে একটা পাথরের মূর্তি ভেবেছিল।"

৫৮৫। শ্রীভগবান বললেন যে এই সহরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। রেলরাস্তা ছাড়া এখানে আসার ন'টি রাস্তা আছে ; নবদ্বারে পুরে দেহে (শরীরে—নবদ্বার বিশিষ্ট সহরে)।

৫৮৬। একজন আন্ধ্র দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—একজন কি ক'রে স্থির হয় ? এরূপ থাকা খুবই শক্ত। এর জন্য কি যোগ অভ্যাস করবো ? কিংবা আর কোন উপায় আছে ?

ম—যা কঠিন নয় তাকে কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষের ঝোঁকটা ঘুরে বেড়ানোর দিকে। তাকে স্থির হয়ে বাড়ীতে থাকতে বলা হলে তার এটা কঠিন মনে হয় কারণ সে ঘুরে বেড়াতে চায়।

ভ—কোন একটি বিশেষ উপাসনা কি অন্যগুলোর অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ ?

ম—সকল উপাসনাই সমান ফলপ্রদ। কিন্তু প্রত্যেকেই তার পূর্ববাসনার অনুকূলে কোন একটা বিশেষ উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮৭। স্পেনদেশীয় মহিলা তার বান্ধবীর সঙ্গে এসেছে। তারা জিজ্ঞাসা করলে—আপনি বলেন হৃদয় ডান দিকে। এটা কি করে হয় বলতে পারেন ?

শ্রীভগবান তাকে ফিলাডেলফিয়া-এর 'সাইকোলজিক্যাল রিভিউ'র উদ্ধৃতাংশটি পড়তে দিলেন। তিনি আরও যোগ করলেন। হৃদয় সেই স্থান যেখানে 'আমি'-চিন্তার উদয় হয়।

ভ—তার অর্থ আপনি বলতে চান এটা আধ্যাত্মিক হৃদয়, স্থূল হৃদ্‌যন্ত্র নয় ?

ম—হাঁ, এটা 'রমণগীতা'র পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভ—এমন একটা অবস্থা কি আসে যখন হৃদয় অনুভূত হয়?

ম—এটা সবার অনুভূতির বিষয়। প্রত্যেকেই 'আমি' বলার সময়ে বুকের ডান দিকে হাত দেয়।

মহিলারা একে একে শ্রীভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে। তারপর তারা কলম্বোর পথে পণ্ডীচেরীর দিকে রওনা হল।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮৮। একজন আন্ধ্র সাধককে শ্রীভগবান বললেন—একজন প্রকৃত অধিকারীর জন্য সন্ন্যাসের উল্লেখ করা হয়। এটা কেবল যে বস্তু ত্যাগ তা নয় উপরন্তু তাদের প্রতি আসক্তিও ত্যাগ। একজন বাড়ীতে থেকেও সন্ন্যাস অভ্যাস করতে পারে। কেবল তাকে উপযুক্ত হতে হবে। আবার—

কুটিচক—সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমে থাকে;
বহূদক—সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থযাত্রা করে;
হংস—উপাসক সন্ন্যাসী;
পরম হংস—জ্ঞানী সন্ন্যাসী।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৮

৫৮৯। পুরাতন ভক্ত সোমসুন্দরস্বামী জিজ্ঞাসা করলে—দর্পণে আকাশ আছে, তাতেই প্রতিবিম্বের প্রতিফলন হয়। দর্পণে এটা (আকাশটা) কি করে থাকে?

ম—বস্তু আকাশে রয়েছে। বস্তু ও আকাশ দর্পণে প্রতিফলিত হয়। আকাশে যেভাবে বস্তু রয়েছে দর্পণেও সেইভাবে

প্রতিফলিত হয়। দর্পণটা নিজেই পাতলা। তার মধ্যে এ সকল কি করে থাকতে পারে?

ভ—একটা ঘটের আকাশ সম্বন্ধে এটা কিরূপে খাটে?

ম—ঘটের আকাশে প্রতিফলন নেই। প্রতিফলনটা তার মধ্যের জলে হয়। একটা পুকুরে কয়েকটা জলভরা ঘট থাকলে পুকুরের জলে ও প্রত্যেক ঘটের জলে আকাশ সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে সমস্ত বিশ্ব প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তায় প্রতিফলিত হয়।

ভ—প্রত্যেক ঘটের মুখ পুকুরের জলের ওপরে থাকা চাই।

ম—হাঁ, সেটা হওয়া চাই। নতুবা যদি জলে ডুবে থাকে তবে ঘটগুলোকে কি করে চেনা যাবে?

ভ—সেখানে কি করে প্রতিফলন হয়?

ম—শুদ্ধ আকাশে কোন প্রাতফলন হয় না; কেবল জলের আকাশেই এটা হতে পারে। কাচ কোন প্রতিবিম্ব প্রকাশ করে না; কেবল কাচের পিছনে যদি কোন অস্বচ্ছ প্রলেপ থাকে তবেই তার সামনে প্রতিফলন হয়। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানে কোন বস্তু নেই বা কোন প্রতিফলন নেই। কেবল এটা মনরূপ উপাধিযুক্ত হলে জগতকে প্রতিফলিত করে।

সমাধি কিংবা সুষুপ্তিতে জগৎ থাকে না। উজ্জ্বল আলো কিংবা গাঢ় অন্ধকারে ভ্রম হয় না। কেবল স্তিমিত আলোয় রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ চৈতন্য কেবল জ্যোতির্ময়; এটাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। এর থেকে মনের উদয় হলেই বস্তুর পৃথক সত্তার ভ্রম হয়।

ভ—সুতরাং মনই দর্পণ।

ম—মন—মন কি? এটা চিৎ (বুদ্ধি) ও সঙ্কল্পের (চিন্তার) মিশ্রণ। অতএব এটাই—দর্পণ, বোধ, অন্ধকার ও প্রতিবিম্ব এইসব হয়।

ভ—কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ম—চিদাকাশ কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান। এটাই মনের উৎস। ঠিক ঘুম ভাঙ্গার সময়ে মন কেবলমাত্র বোধরূপে থাকে ; তারপরেই 'আমি এই' চিন্তাটা জাগে। এই 'আমি'-চিন্তাই জীব ও জগৎ।

প্রথম বোধ শুদ্ধ মন, মনাকাশ বা ঈশ্বর। এর বৃত্তিগুলোই বস্তুরূপে প্রকাশ হয়। যেহেতু সে এইসকল বস্তু নিজের মধ্যে ধারণ করে সেজন্য একে মনাকাশ বলা হয়। আকাশ কেন ? আকাশ যেমন বস্তুর আধার, এও তেমন চিন্তার আধার, অতএব একে মনাকাশ বলে।

আবার ভূতাকাশ যেমন স্থূল বস্তুর (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের) আধার হয়েও মনাকাশে থাকে ঠিক সেরূপ মনাকাশও চিদাকাশে থাকে। চিদাকাশ স্বয়ং চিৎ। এতে আর কিছু নেই। এটি কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান।

ভ—একে আকাশ বলা হয় কেন ? ভূতাকাশ চেতন নয়।

ম—আকাশ বলতে কেবল জড় ভূতাকাশই বোঝায় না পরন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানও বোঝায়। জ্ঞান কেবল বস্তুজ্ঞান নয়, এটা আপেক্ষিক জ্ঞান। জ্ঞান তার বিশুদ্ধ অবস্থায় একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বাতীত প্রকাশ !

ভ—তবে—আমরা কি ধ্যানের সময়ে এর কল্পনা করবো ?

ম—কল্পনা কেন ? আমরা তখনই অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি যখন তার থেকে স্বতন্ত্র হই, অপরপক্ষে এখানে আমরা এই বিশুদ্ধ জ্ঞান হতে স্বতন্ত্র নই। বস্তুতঃ 'এটা'ই আছে। তবে আর কি করে একে এইরূপ বা ঐরূপ কল্পনা করা যাবে ?

ভ—তবে কিভাবে আরম্ভ করবো ?

ম—কেবল অনাত্মাকে ত্যাগ কর।

ভ—এখন তো ঠিক মনে হচ্ছে ; পরে সব ভুল হয়ে যায়।

ম—তোমার বিস্মৃতির মধ্যেও জ্ঞান আছে কারণ তুমি জানো যে বিস্মৃত হয়েছ নতুবা কি করে বিস্মৃতির কথা বল ? সুতরাং বিস্মৃতিও কেবল চিদাকাশ।

ভ—তবে আমার কাছে স্পষ্ট হয় না কেন ?

ম—চিৎ শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র। এর থেকে মনের উদয় হয়, মন চিন্তাসমূহ দ্বারা গঠিত। অন্ধকার বা অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বিশুদ্ধ জ্ঞান বাস্তবিক যা, তার থেকে পৃথক মনে হয়; আর তাকেই কামনা, আসক্তি, বিরক্তি ইত্যাদিতে পূর্ণ 'আমি' ও জগতরূপে দেখা হয়। অতএব কামনা ইত্যাদিকেই সত্যের আবরণ বলা যায়।

ভ—চিন্তাসমূহ কি করে দূর করা যায়? যা 'আত্মবিদ্যা'তে বলা হয়েছে এটা কি সেই মনের চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি?

ম—সেখানে মন আকাশ, সৎ-এর সমপর্যায় আর চক্ষু জ্ঞানের; সৎ ও চিৎ উভয়ে মিলিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে।

ভ—একে কিরূপে দর্শন করা যায়?

ম—'আত্মবিদ্যা'তে যেভাবে নিরূপিত হয়েছে "মনের চক্ষুর চক্ষু হয়ে, মনাকাশের আকাশ হয়ে"···অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞানের পৃষ্ঠভূমিরূপ যে জ্ঞান, যাতে মনাকাশ রয়েছে সেই চিদাকাশই একমাত্র প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকে।

ভ—তবুও বুঝতে পারলাম না। কিরূপে উপলব্ধি করব?

ম—আরও বলা হয়েছে 'চিন্তাশূন্য হয়ে থাকো' এবং 'অন্তর্মুখীন মনেই কেবল একে উপলব্ধি করা যায়'। অতএব চিন্তাশূন্য ও হৃদয়লীন মনই স্বয়ং চিৎ।

ভ—এই আগে বলা মনাকাশ কি ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ?

ম—একটা কি অন্যটা থেকে স্বতন্ত্র। সেটাই ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভ।

ভ—দু'টির মধ্যে পার্থক্য কি?

ম—সগুণ সত্তাকেই ঈশ্বর বলে।

ভ—সগুণ সত্তা কি চিদাকাশ নয়?

ম—সগুণ বললেই মায়া যুক্ত। এটা মায়ার সহিত সত্তার জ্ঞান; এর থেকে সূক্ষ্ম অহমিকা হিরণ্যগর্ভ; হিরণ্যগর্ভ থেকে স্থূল অহমিকা—বিরাট নিঃসৃত হয়। চিদাত্মা কেবল বিশুদ্ধ সত্তা।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯০। দু'জন মহিলা, একজন সুইজারল্যাণ্ডের ও অন্যজন ফরাসী দেশের, মহর্ষিকে দর্শন করলে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সীজন অনেক প্রশ্ন করলে, তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি—"ব্রহ্ম ও জীব এক। যদি জীব মায়াগ্রস্ত হয় তবে বলতে হয় যে ব্রহ্মও মায়াগ্রস্ত। তা কি করে হয়?"

ম—ব্রহ্ম যদি মায়াগ্রস্ত হন ও মায়ামুক্ত হতে চান তবে তাঁকেই প্রশ্ন করতে দাও।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯১। ভ—যে মুমুক্ষুরা গুরুর সান্নিধ্যে থাকে তারা দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদির দ্বারা কৃপা লাভ করে। কিন্তু যদি দূরে থাকে তবে সে কিরূপে কৃপা পায়?

ম—যোগ-দৃষ্টির দ্বারা।

শ্রীচোপরা একজন পাঞ্জাবী, সিঙ্গাপুরে কাজ করেন, দর্শনার্থে এখানে এসেছেন আর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—

ভ—নামের উপযোগিতা কি?

শ্রীভগবান "দি ভিসন" থেকে উদ্ধৃতাংশটি পড়ে শোনালেন। এটা নামদেবের রচনার অনুবাদ।

ভ—আত্মোপলব্ধিতে নাম কিভাবে সাহায্য করে?

ম—আদি নাম সাধকের বিনা চেষ্টায় স্বতঃই জপ হয়ে চলেছে। সেই নাম—অহম্-'আমি'। কিন্তু যখন এই অহম্ ব্যক্ত হয় তখন এটা অহংকার রূপেই প্রকাশিত হয়। বাচিক নামজপ ক্রমশঃ মানস জপ ও অবশেষে নিত্যস্পন্দনরূপে প্রকাশিত হয়।

ভ—কিন্তু এগুলো হয় মানস কিংবা বাচিক।

ম—মন বা মুখ আত্মা ছাড়া কাজ করে না। মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মা তুকারাম সারাদিন সমাধিস্থ থাকতেন আর রাত্রিকালে সঙ্গী-সাথী নিয়ে ভজনকীর্তন করতেন। তিনি সর্বদা শ্রীরামনাম জপ করতেন। একবার তিনি শৌচে গিয়ে 'রাম' 'রাম' জপ করছেন। একজন নিষ্ঠাবান যাজক ব্রাহ্মণ তাঁকে অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয় আর তাঁকে নাম করা বন্ধ করে চুপ করে থাকতে বলে। তুকারাম বললেন, "ঠিক আছে!" আর নীরব রইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে নাম হতে লাগল। নামের উচ্চধ্বনিতে ব্রাহ্মণ ভীত হল। সে তখন হাত জোড় করে তুকারামকে বললে, "বিধি নিষেধ কেবল সাধারণ লোকেদের জন্য, আপনার মত মহাত্মার জন্য নয়।"

ভ—কথিত আছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালীমূর্তি পূজা করতেন তাঁকে জীবন্ত দেখেছিলেন। এটা কি সত্য হতে পারে?

ম—জীবন্ত দেখাটা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য, সবার জন্য নয়। শক্তিটা তাঁর নিজের। এটা তাঁর নিজেরই প্রাণশক্তি যা বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল আর তাঁকে অন্তরে আকর্ষণ করেছিল। মূর্তিটি যদি প্রাণবন্ত হত তবে অন্যেরা সবাই সেটা দেখতে পেত। কিন্তু সবই প্রাণবন্ত। এইটাই তথ্য। অনেক ভক্তই শ্রীরামকৃষ্ণের মত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

ভ—পাষাণে জীবন কি করে আসে? সেটা অচেতন!

ম—সমস্ত বিশ্ব প্রাণময়। তুমি বলছ পাষাণ অচেতন। এটা তোমার আত্মসচেতনা যা অচেতনার কথা বলছে। যখন একজন অন্ধকার ঘরে কোন বস্তু খুঁজতে যায় সে একটা আলো নিয়ে যায়। সেই বস্তুটা আছে কিনা দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। একটি বস্তু চেতন কি না দেখার জন্যও চেতনার প্রয়োজন। যদি একজন একটা অন্ধকার ঘরে থাকে তাকে খোঁজার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়

না। ডাকলে সে সাড়া দেয়। তারও নিজেকে জানার জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। চেতনা স্বপ্রকাশ।

এখন তুমি বলছ যে সুষুপ্তিতে তুমি অচেতন ছিলে আর জাগ্রতে সচেতন আছ। কোনটা সত্য? সত্যকে নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে। অচেতনা কিংবা বর্তমান আত্মসচেতনা কোনটাই সত্য নয়। কিন্তু তুমি সর্বদাই তোমার অস্তিত্ব স্বীকার কর। সেই শুদ্ধ সত্তাই সত্য। অন্যগুলো কেবলমাত্র সংযোজনা। সেই শুদ্ধ সত্তা চেতনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। নতুবা তুমি বলতে পার না যে তুমি আছ। অতএব চেতনাই সত্য। যখন এই চেতনা উপাধি-যুক্ত হয় তখন তুমি আত্মসচেতনা, অচেতনা, অবচেতনা, অতিচেতনা, মনুষ্যচেতনা, পশুচেতনা, বৃক্ষচেতনা ইত্যাদি বল। এ সকলের মধ্যে চেতনাই অপরিবর্তনীয় সামান্য তত্ত্ব।

অতএব তুমি সুষুপ্তিতে যেরূপ অচেতন একটি পাষাণও সেরূপ অচেতন। সেটা কি সম্পূর্ণ চেতনাহীনতা?

ভ—একটি কুকুরের চেতনা আমার চেতনা থেকে পৃথক। আমি একটি কুকুরেব কাছে বাইবেল পড়তে পারি না। একটা গাছ চলতে পারে না, অন্যপক্ষে আমি পারি।

ম—গাছকে একটি স্থাবর মানুষ আর মানুষকে একটি চলন্ত গাছ বলতে পারো।

একজন আমেরিকান ভদ্রলোকও এই কথাবার্তায় যোগ দিয়েছিল আর শ্রীভগবানকে কথাটা বুঝিয়ে বলার অবসর দিলে না সেজন্য এটা এখানেই থেমে গেল।

৫৯২। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্রচলিত বিশ্বাস 'ভ্রমর কীট ন্যায়' (একটা পোকার ভ্রমর হয়ে যাওয়া) যা গতকাল শ্রীভগবান ভদ্র-মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বলেছিলেন তার উল্লেখ করলে। শ্রীভগবান কতগুলো চমকপ্রদ পুরাতন স্মৃতিচারণ করলেন—

(১) "আমি আগে 'ভ্রমর কীট ন্যায়' শুনেছিলাম। তিরুভন্নমালাই আসার পর যখন আমি গুরুমূর্তমে ছিলাম তখন একদিন দেখলাম যে একটা লাল বোলতা একটা চাক তৈরী করলে আর তাতে পাঁচ ছ'টা শূককীট রেখে উড়ে গেল। আমার কৌতূহল হল আর আমি বহু প্রচলিত 'ন্যায়'টা পরীক্ষা করতে চাইলাম। আমি ক'দিন অপেক্ষা করলাম, বোধহয় দশদিন। তারপর চাকটা নাড়া দিলাম। সেটা ভেঙ্গে গেল আর আমি দেখলাম যে সব ক'টা শুককীট একসঙ্গে মিশে একটা বোলতার আকার নিয়েছে, কিন্তু সেটার রঙ সাদা ছিল।

(২) পরে যখন আমি বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম; আমি একটা লাল বোলতাকে চার পাঁচটা চাক করতে দেখলাম, সে প্রত্যেকটাতে পাঁচ ছ'টা শূককীট রেখে উড়ে গেল। প্রায় দশদিন পরে বোলতার থেকে ছোট একটা কালো গুবরে পোকা চাকগুলোর ওপর ভন ভন করলে আর সবগুলো একটু কালোমাটি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ে উড়ে গেল। আমি এই গুবরে পোকাটার বোলতার চাকে অনধিকার প্রবেশের কথা ভাবতে লাগলাম। আরও কদিন অপেক্ষা ক'রে আস্তে করে একটা চাক ভাঙ্গলাম। পাঁচ ছ'টা কালো কীট বেরিয়ে এল, প্রত্যেকটা এক একটা গুবরে পোকা। আমার খুব আশ্চর্য লাগল।

(৩) আবার যখন আমি পাচিয়াম্মান মন্দিরে ছিলাম তখন একটা লাল বোলতাকে মন্দিরের থামে পাঁচ ছ'টা চাক করতে দেখলাম। সে প্রত্যেক চাকে পাঁচ ছ'টা করে শূককীট রেখে উড়ে গেল। আমি কয়েকদিন লক্ষ্য করলাম। বোলতাটা আর ফিরল না। কোন কালো গুবরে পোকাও এল না। প্রায় পনের দিন পরে আমি একটা চাক খুললাম। সব শূককীটগুলো একটা সাদা বোলতার আকার নিয়েছে। সেটা পড়ে গেল আর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। কয়েক মিনিট পরে সেটা চলতে আরম্ভ করলে। তার রঙ ক্রমশঃ

বদলে গেল। একটু পরে তার দুপাশে দু'টি ফুটকি হল, দেখতে দেখতে সে দু'টি পাখা হয়ে গেল আর পূর্ণাঙ্গ বোলতাটা মাটি ছেড়ে উড়ে গেল।

(৪) যখন আমি আম্রবৃক্ষ গুহায় ছিলাম, একদিন দেখলাম যে একটা শুঁয়োপোকার মত কীট দেওয়ালে উঠছে। সেটা এক জায়গায় থামল; দু'টি বিন্দু ঠিক করে নিজের গায়ের রস দিয়ে সে দু'টি জুড়ে দিলে। সে মুখ দিয়ে সেই পাতলা পর্দাটা ধরে রইল আর ল্যাজটা দেওয়ালে রাখলে। এইভাবে সে কয়েকদিন রইল। আমি লক্ষ্য রাখছিলাম। সময়ে সেটা শুকিয়ে গেল। আমি তাতে প্রাণ আছে কিনা ভাবছিলাম। সুতরাং একটা সরু কাঠি দিয়ে একটু ছুঁয়ে দিলাম। কোন প্রাণ নেই। আমি আর কিছু করলাম না। কিন্তু আরও কয়েকদিন পরে দেখি কেবল একটা শুকনো খোসা রয়েছে, ভিতরের বস্তুটা উড়ে গেছে।

(৫) আমি আরও দেখেছি যে মাছিরা তাদের শূককীট পায়ে করে এনে আবর্জনার ওপর রেখে দেয়। এই কীটগুলো পরে মাছি হয়ে উড়ে যায়।"

ভ—ওগুলো বোধহয় মাছিদের ডিম।

ম—কিন্তু ওগুলো নড়াচড়া করে আর চেষ্টা ক'রে মাছির আকার নেয়।

৫৯৩। শ্রীভগবান আরও একটা মজার পূর্বস্মৃতি বললেন। "যখন ছোট ছিলাম দেখেছি যে জেলেরা জলটা প্রধান প্রণালী থেকে অন্য পথে চালিয়ে দিয়ে সেখানে একটা হাঁড়ি রেখে দেয়। এই কৃত্রিম পথটা তামাকের ডাঁটা দিয়ে ছেয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় যে সব বড় মাছ এই কৃত্রিম জলপথটা নেয় আর হাঁড়ীতে পড়ে। জেলেরা কেবল চুপ করে বসে হাঁড়ী থেকে মাছ তুলে তাদের ডালায় ফেলে। আমি তখন এটা দেখে আশ্চর্য হতাম। পরে যখন এখানে এলাম, একজনকে

তায়ুমানাবর পড়তে শুনে দেখলাম জেলেদের এই কৌশলের কথা সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে।”

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯৪। স্পেনীয় মহিলা মাদাম ডি ওকোর্তা শ্রীহেগ নামক যে আমেরিকান খনিজ ইঞ্জিনীয়ার এখানে গত দু'মাস অস্থায়ীভাবে বাস করছে তাকে একটা চিঠি দিয়েছে। সে তাতে কয়েকটা প্রশ্ন করেছে— “যদি ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তায় মিশেই যায় তবে আর মানব কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি করে হয়?” পাশ্চাত্যদেশের চিন্তকদের এটাই সাধারণ প্রশ্ন বলে মনে হয়।

শ্রীভগবান বললেন—তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’ বলে সমাপ্ত করে। যদি তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে তবে আদৌ প্রার্থনা করাই বা কেন? একথা সত্য যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সদাসর্বদা সর্বস্থানে পূর্ণ হয়। কোন লোক আপন ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার শক্তি দেখে নীরব থাকো। প্রত্যেককেই ঈশ্বর দেখছেন। তিনিই সব সৃষ্টি করেছেন। তুমি সেই ২০,০০০ লক্ষের একজন। তিনি যদি এত জনকে দেখতে পারেন তবে কি তোমাকে বাদ দেবেন? এমনকি সাধারণ জ্ঞানও বলে যে তাঁর ইচ্ছামত চলতে হবে।

আবার তোমার কি প্রয়োজন তাও তাঁকে জানাবার দরকার নেই। তিনি নিজেই সেটা জানেন ও তার ব্যবস্থা করবেন।

আরও, তুমি প্রার্থনা কর কেন? তুমি নিজে অসহায় আর তুমি চাও যে উচ্চশক্তি তোমাকে সাহায্য করুন। আচ্ছা, তোমার সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা কি তোমার দুর্বলতার কথা জানেন না? তোমার দুর্বলতা কি তোমায় প্রচার করতে হবে যাতে তিনি বুঝতে পারেন?

ভ—কিন্তু যারা নিজেদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন।

ম—নিশ্চয়। নিজেকে সাহায্য আর সেটাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় হয়। প্রত্যেক কাজ তাঁরই দ্বারা প্রেষিত হয়। আর অন্যের জন্য প্রার্থনা করা, এটা ওপর ওপর দেখলে খুব নিঃস্বার্থ মনে হয়। কিন্তু কারণটা বিচার কর দেখবে সেখানেও স্বার্থ আছে। তুমি অন্যের সুখ চাও যাতে তুমি সুখী হতে পারো। কিংবা তুমি যে অন্যের হয়ে কিছু করলে তার জন্য যশটা পেতে চাও। ঈশ্বরের কোন দালালের দরকার নেই। নিজের কাজে মন দাও সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভ—ঈশ্বর কি কোন বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন না?

ম—ঈশ্বর সবার মধ্যে আছেন ও সবার মধ্যেই কাজ করছেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি শুদ্ধ মনের মধ্যে বেশী প্রকাশ হয়। অশুদ্ধ মনের থেকে শুদ্ধ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কর্ম বেশী স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। অতএব লোকে বলে যে তারা তাঁর বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তি। কিন্তু সেই 'চিহ্নিত' ব্যক্তি নিজে তা বলে না। যদি সে মনে করে যে সে একজন মধ্যস্থ তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার ব্যক্তিসত্তা এখনও আছে আর তার সমর্পণ সম্পূর্ণ হয় নি।

ভ—ব্রাহ্মণদের কি ঈশ্বর ও অন্যদের মধ্যে পুরোহিত বা মধ্যস্থ বিবেচনা করা হয় না?

ম—হ্যাঁ। কিন্তু ব্রাহ্মণ কে? যে ব্রহ্মকে জেনেছে, সেই ব্রাহ্মণ। এরূপ লোকেদের কোন ব্যক্তিত্বের বোধ নেই। সে মধ্যস্থ হয়ে কাজ করছে মনে করতে পারে না।

আবার প্রার্থনার কথায়, একজন জ্ঞানী অন্যদের নিজের থেকে পৃথক মনে করে না। সে কি করে প্রার্থনা করবে, কাকেই বা করবে আর কিসের জন্যই বা করবে? তার বিদ্যমানতামাত্রেই সকলের পক্ষে আনন্দদায়ক। যতক্ষণ তুমি অন্যদের তোমার থেকে পৃথক মনে

কর ততক্ষণ তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা কর। কিন্তু এই ভেদভাবই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই আবার অসহায় বোধ হওয়ার কারণ। তুমি জান যে তুমি দুর্বল ও অসহায় তবে আর অন্যদের কি করে সাহায্য করবে? যদি তুমি বল "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে" ঈশ্বর তাঁর কি করণীয় তা জানেন আর অন্যদের জন্য তোমার মধ্যস্থতার প্রয়োজন-বোধ করেন না।

নিজেকে সাহায্য কর যাতে তুমি সবল হতে পারো। সেটা সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলে হয়। তার অর্থ নিজেকে তাঁর কাছে অর্পণ করা। সুতরাং তোমার সমর্পণের পর তোমার আর কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। তুমি তখন তাঁর ইচ্ছার অনুগামী হয়েই থাকো। এরূপে মৌনই সর্বোৎকৃষ্ট প্রাপ্তি।

মৌনই সেই সমুদ্র যেখানে ধর্মরূপী নদী সকল মিলিত হয়। তায়ুমানাবরও এরূপ বলে। সে আরও যোগ দেয় যে একমাত্র বৈদিক ধর্মেই দর্শন ও ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯৫। মহিলা দর্শনার্থিনীরা সকালে ফিরে এল ও অল্পবয়সীজন জিজ্ঞাসা করলে—

"পরম অবস্থার অনুভূতি কি সবার পক্ষে সমান? কিংবা এর মধ্যে পার্থক্য আছে?"

ম—পরম অবস্থা এক ও তার অনুভূতিও এক।

ভ—কিন্তু পরম অবস্থার ব্যাখ্যার পার্থক্য দেখতে পাই।

ম—ব্যাখ্যাটা মনের দ্বারা করা হয়। মনে পার্থক্য আছে, সেজন্য ব্যাখ্যা পৃথক হয়।

ভ—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে জ্ঞানীরা কি নিজেদের বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন?

ম—জিজ্ঞাসুর স্বভাব অনুসারে বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এগুলো তাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য করা হয়।

ভ—একজন খ্রীস্টমতে বলেন, অন্যজন ইসলাম মতে, তৃতীয়জন বৌদ্ধ মতে ইত্যাদি। এটা কি তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য হয়?

ম—তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা যাই হোক অনুভূতিটা এক। কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গী পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন হতে পারে।

৫৯৬। একজন দর্শনার্থী জিজ্ঞাসা করলে—গতরাত্রে শ্রীভগবান বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদের পরিচালনা করছেন। তবে আমাদের আর কোন চেষ্টা করার কি প্রয়োজন?

ম—কে তোমায় করতে বলছে? যদি ঈশ্বরে সেই বিশ্বাস থাকত তবে এই প্রশ্ন উঠত না।

ভ—ঈশ্বর আমাদের চালাচ্ছেন, এটা ঠিক। তবে আর লোকেদের উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন কি?

ম—এগুলো যারা উপদেশ চায় তাদের জন্য। তুমি যদি ঈশ্বরীয় পথ-নির্দেশনা সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাসে দৃঢ় হও তবে সেটাকেই ধরে থাকো। আর ধারে পাশে কি হচ্ছে সেদিকে মন দিও না। অধিকন্তু সুখ কিংবা দুঃখ আসতে পারে। দু'টির প্রতি সমান অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস ধরে থাকো। সেটা তখনই হতে পারে যখন ঈশ্বর আমাদের দেখছেন এই বিশ্বাস গভীর হয়।

শ্রীচোপরা জিজ্ঞাসা করলে—"এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস কি করে লাভ করব?"

ম—ঠিক তাই। এটা এরূপ লোকদের জন্য যারা উপদেশ চায়। এমন লোক আছে যারা দুঃখ থেকে মুক্তি চায়। তাদের বলা হয় ঈশ্বর সবাইকে চালাচ্ছেন আর যা হচ্ছে তার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। যদি তারা উচ্চ অধিকারী হয় তবে তারা তৎক্ষণাৎ এটা বিশ্বাস ক'রে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন ক'রে বসে থাকে।

কিন্তু অন্যেরা যারা এত সহজে এই সরল তথ্যের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না, তারা জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর কে? তাঁর স্বভাব কি? কোথায় থাকেন? কিভাবে তাঁকে জানা যাবে?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বুদ্ধিগত আলোচনার প্রয়োজন হয়। বক্তব্য বিষয় বলা হয়, তার সপক্ষ-বিপক্ষ আলোচনা করা হয় আর সত্যকে এরূপে বুদ্ধিগোচর করানো হয়।

যখন ব্যাপারটা বুদ্ধিগত ভাবে বোঝা যায় তখন উদ্যমী সাধক সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করে। যতক্ষণ না সে উচ্চশক্তির সঞ্চালনা বিষয়ে দৃঢ়-প্রত্যয়ী হয় ততক্ষণ সে প্রতিমুহূর্তে "এই চিন্তাগুলো কার? আমি কে?" ইত্যাদি বিচার করে। এটাই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। তখন তার সব সংশয় মিটে যায়, তার আর কোন উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

ভ—আমাদেরও ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে।

ম—যদি এটা দৃঢ় হত তবে কোন প্রশ্ন উঠত না। সেই লোক সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দে থাকে।

ভ—আত্মানুসন্ধান ও আগে বলা বিশ্বাস কি এক?

ম—আত্মানুসন্ধানের মধ্যেই সব, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ আর যা কিছু।

ভ—একজন লোক দেখে যে তার শরীর সময়ে সময়ে দৃঢ়ভাবে ধ্যানে বসতে দেয় না, সে কি শরীরকে অভ্যস্ত করার জন্য যোগ-অভ্যাস করবে?

ম—এটা একজনের সংস্কার অনুযায়ী হয়। কেউ হয়ত শরীরের রোগ দূর করার জন্য হঠযোগ অভ্যাস করে, আর একজন তাকে সুস্থ রাখার জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত স্বাস্থ্যের জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আর চতুর্থজন হয়ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। কিন্তু সকলেই ধ্যান অভ্যাসে রত থাকবে। আত্মার অনুসন্ধানই প্রধান তত্ত্ব আর সব তার সহযোগী মাত্র।

একজন লোক হয়ত বেদান্ত দর্শনে পারদর্শী] কিন্তু তার চিন্তাকে দমন করতে পারে না। তার পূর্ব সংস্কার থাকতে পারে যা তাকে হঠযোগের দিকে নিয়ে যায়। সে বিশ্বাস করে যে যোগের দ্বারা মন সংযত হয় সুতরাং সে সেটা অভ্যাস করে।

ভ—দৃঢ়-ধ্যানের জন্য কোন্ উপায় সব থেকে উপযুক্ত?

ম—এটা একজনের সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। একজন হয়ত হঠযোগ আর দ্বিতীয়জন নামজপ আর অন্যেরা অন্য কিছু উপযুক্ত মনে করে। মূল কথা আত্মবিচার—আত্মার অনুসন্ধান।

ভ—আমি যদি সকালে কিছুক্ষণ আর সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ আত্মবিচার করি তবে কি যথেষ্ট হবে? কিংবা আমায় সব সময়ে যথা লেখাপড়া বা চলাফেরা করার সময়েও এটা করতে হবে?

ম—এখন, তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি? সেটা কি লেখাপড়া বা চলাফেরা করা কিংবা অস্তিত্ব? একমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্য হ'ল 'সত্তা'। যতক্ষণ না সেই শুদ্ধ সত্তার অবস্থাটা অনুভূত হচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে বিচার চালিয়ে যেতে হবে। যখন তুমি দৃঢ়ভাবে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর কোন চিন্তা নেই।

চিন্তা না উঠলে কেউ আর চিন্তার উৎসের খোঁজ করবে না। যতক্ষণ তুমি 'আমি চলছি' 'আমি লিখছি' চিন্তা করছ ততক্ষণ খোঁজো কে করছে।

যখন একজন দৃঢ়রূপে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই কাজগুলো ঠিকই হয়ে যাবে। একজন মানুষ কি জীবনের প্রতি মুহূর্তে বলে 'আমি মানুষ' 'আমি মানুষ' 'আমি মানুষ?' সে এরূপ বলে না তা সত্ত্বেও তার কাজ ঠিকই হয়ে যাচ্ছে।

ভ—সত্যের সম্বন্ধে বৌদ্ধিক জ্ঞানেরও কি প্রয়োজন আছে?

ম—হাঁা। নতুবা একজন তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর বা আত্মাকে অনুভব করে না কেন অর্থাৎ ঈশ্বর বা আত্মাই সব বলা মাত্র তার জ্ঞান হয় না কেন? তার অর্থ তার মধ্যে একটা সংশয় আছে। তার

বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার আগে অবধি তাকে নিজের সঙ্গে তর্ক করতে হবে আর ক্রমশঃ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা নিজেকে 'সত্যে'র প্রতি আস্থাবান করতে হবে।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯৫। একজন সুইস্ ভদ্রমহিলা শ্রীমতী জে. সি. এস. হিকরিডিং জিজ্ঞাসা করলে—"আত্মজ্ঞান বলতে কি অলৌকিক শক্তিও বোঝায়?"

ম—আত্মা একান্ত অন্তরঙ্গ আর নিত্য সত্তা অপরপক্ষে অলৌকিক শক্তিগুলো বিজাতীয়। একটা লাভের চেষ্টা করতে হয় আর অন্যটার জন্য হয় না।

মনই শক্তিগুলো খোঁজে যার জন্য তাকে সতর্ক থাকতে হয়, অন্যপক্ষে মন নাশ হয়ে গেলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অহংকার থাকলেই শক্তির প্রকাশ হয়। অহংকার থাকলেই অন্য কিছুর বোধ থাকে আর তার অভাবে অন্য কিছু দেখা যায় না। আত্মা অহংকারের অতীত আর অহংকার নাশ হয়ে গেলেই উপলব্ধ হয়। অহংকার নাশে অন্য বোধেরও অভাব হয়। আত্মজ্ঞানীর পক্ষে অন্যের প্রশ্ন কি করে ওঠে আর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগই বা কি করে হয়?

আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক শক্তি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের পূর্বে এই শক্তি লাভ করতে চেয়ে থাকে, সে জ্ঞান লাভের পর এটা পেতে পারে। এমনও আছে যারা এরূপ শক্তি চায়নি কেবল আত্মজ্ঞানই চেয়েছে। তাদের এরূপ শক্তির প্রকাশ হয় না।

এরূপ শক্তি আত্মজ্ঞানের পরও চাওয়া যেতে পারে আর লাভও হয়। কিন্তু তখন সেটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন অন্যের উপকারার্থে, যা চূড়ালার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

শিখিধ্বজ একজন পুণ্যবান রাজা ছিল। তার স্ত্রী চূড়ালা।

তারা একজন ঋষির কাছে উপদেশ লাভ করেছিল। রাজা রাজ্য পরিচালনায় ব্যস্ত থাকায় সেগুলো অভ্যাস করতে পারলে না। অন্য-পক্ষে চূড়ালা সেগুলো অভ্যাস করে আত্মজ্ঞান লাভ করলে। তার ফলে সে পূর্বের থেকে আরও লাবণ্যবতী হল। রাজা তার রূপলাবণ্য দেখে অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। সে বললে যে সব লাবণ্যই আত্মার আর রাজা তার মধ্যে আত্মজ্ঞানেরই সৌন্দর্য দেখছে। রাজা বললে যে সে বাজে কথা বলছে। বড় বড় তপস্বী বহুদিন ধরে তপস্যা করে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না ; একজন অবোধ স্ত্রীলোক যে সংসারে রয়েছে আর সাংসারিক জীবন যাপন করছে তার আর কি কথা ? যা হোক চূড়ালা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় এ কথায় ক্ষুণ্ণ হল না আর তার স্বামীও আত্মজ্ঞান লাভ করে আনন্দময় হোক কেবল এটাই চেয়েছিল। সে ভাবলে যে কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে তার গুরুত্ব না বোঝাতে পারলে রাজার বিশ্বাস হবে না। সেজন্য সে চেষ্টা করে শক্তিলাভ করলে। কিন্তু সে সেটা তখনই দেখালে না। তার সঙ্গে অনবরত সঙ্গ হওয়ার ফলে রাজার বৈরাগ্যের উদয় হল। তার সাংসারিক জীবন আর ভাল লাগল না, সে বনে গিয়ে তপস্যা করার ইচ্ছা করলে। সুতরাং সে তার স্ত্রীকে বললে যে সে সংসার ছেড়ে বনে যেতে চায়। চূড়ালা এটা শুনে খুশি হলেও তার এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে খুবই দুঃখ পাওয়ার ভান করলে। রাজাও স্ত্রীর কথা ভেবে ইতস্ততঃ করতে লাগল। ইতিমধ্যে তার বৈরাগ্য আরও তীব্র হল আর সে স্ত্রীকে না জানিয়ে বনে যাওয়া মনস্থ করলে।

একদিন রাত্রে রানী যখন ঘুমাচ্ছে তখন রাজা হঠাৎ চুপি চুপি প্রাসাদ ত্যাগ করে একাকী বনে চলে গেল। সে তপস্যা করার জন্য একটা নির্জন স্থান খুঁজে নিলে। রানী ঘুম থেকে উঠে রাজাকে দেখতে পেলে না আর তৎক্ষণাৎ তার অলৌকিক শক্তির বলে কি হয়েছে জানতে পারলে। সে রাজার সঙ্কল্পের জন্য আনন্দিত হল। মন্ত্রীদের ডেকে বললে যে রাজা একটা বিশেষ কাজে গেছেন আর

রাজ্য পরিচালনা যেন বেশ সুষ্ঠুভাবে করা হয়। রাজার অভাবে সে নিজেই রাজ্য শাসন করতে লাগল।

আঠারো বছর কেটে গেল। সে বুঝলে যে রাজা এবার আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়েছে। তখন সে রাজার কাছে কুম্ভের ছদ্মবেশে উপস্থিত হল ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজাও আত্মজ্ঞান লাভ করে ফিরে এসে রানীর সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে লাগল।

এখানে দেখানো হয়েছে যে জ্ঞানীরাও অন্যের উপকারের জন্য অলৌকিক শক্তি চাইতে পারে আর লাভও করে। কিন্তু জ্ঞানীরা এই অলৌকিক শক্তিলাভের দ্বারা ভ্রান্ত হয় না।

ভ—জ্ঞানী কি অন্যদের জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই শক্তি ব্যবহার করে কিংবা কেবল আত্মজ্ঞানই এর জন্য যথেষ্ট হয়?

ম—তাব আত্মজ্ঞানের শক্তি অন্যান্য সব শক্তি থেকে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী।

তার অহংকার না থাকার জন্য তার কাছে অন্য বলে কেউ নেই। একজনের সব থেকে বেশী কী উপকার করা যেতে পারে? সেটা আনন্দদান। আনন্দ শান্তি থেকে উৎপন্ন হয়। শান্তি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে চঞ্চলতা নেই। চঞ্চলতা চিন্তার জন্য হয় যা মনে উদয় হয়। যেখানে মন নিজেই অনুপস্থিত সেখানে পরিপূর্ণ শান্তি থাকবে। যতক্ষণ না একজন তার মনকে নাশ করছে ততক্ষণ তার শান্তি হতে পারে না আর আনন্দও হয় না। সে যদি নিজেই আনন্দ না পায় তবে অন্যকেও দিতে পারে না।

যখন কোন মন নেই সে অন্যদের সম্বন্ধেও সচেতন নয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান স্বতঃই অন্যদের আনন্দিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

ভ—সমাধি কি আসে আর যায়?

ম—সমাধি কি? সমাধি একজনের প্রকৃত স্বরূপ তবে আর এটা যাবে আসবে কি করে?

তুমি যদি তোমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না কর, তোমার

দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবোরোধটা কি? এটা খোঁজো আর নিবারণ কর। সুতরাং একজনের চেষ্টা কেবল অবরোধটাকে যা প্রকৃত দৃষ্টিকে আড়াল করে তাকে দূর করা। প্রকৃত স্বরূপ একই থাকে। যখন একবার এটা জানা যায়, এটা স্থায়ী হয়।

ভ—কিন্তু শ্রীব্রাণ্টন বলেছেন যে তাঁর এক ঘণ্টা সমাধি হয়েছিল। সেজন্যই প্রশ্ন করছি।

ম—অভ্যাসী মনে শান্তি পায় আর আনন্দ লাভ করে। এই শান্তিটা তার চেষ্টার ফল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা চেষ্টাশূন্য (সহজ) হতে হবে। সহজ সমাধিই প্রকৃত সমাধি আর পূর্ণ অবস্থা। এটা নিত্য। চেষ্টাগুলো থেমে থেমে হয়, সেজন্য তার ফলও সেরূপ।

যখন প্রকৃত, সহজ, নিত্য সুখময় অবস্থা লাভ করা যায় তখন দেখা যাবে যে সেটা সাধারণ জীবন যাত্রার পরিপন্থী নয়। চেষ্টা করে যে সমাধি লাভ হয় সেটা বাহ্যকর্ম বিরতির মত দেখায়। একজন লোক এরূপ বিরত থাকতে পারে কিংবা যা তার প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মা সেই শান্তি ও আনন্দ না হারিয়ে সহজভাবে লোকেদের সঙ্গে বাস করতে পারে।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৫৯৮। শ্রীভগবান মাঝে মাঝে তাঁর রসিক স্বভাবের পরিচয় দেন। তিনি 'উপমন্যু ভক্তবিলাস'-এর এক অংশ পড়ে শোনালেন, সেখানে বলা হয়েছে যে অরুণাচলেশ্বর তাঁর ডাকাত বেশধারী 'ভূতগণ'-এর দ্বারা তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর ও তার সাথীদের সর্বস্ব অপহরণ করিয়েছিলেন। শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন, 'তিরুবডুন্দ উৎসবে' শিব নিজেই লুণ্ঠিত হয়েছিলেন আর সেই কৌশলটা তিনি তাঁর ভক্তের ওপর প্রয়োগ করলেন। এটা কি হতে পারে?"

৫৯৯। 'তাও-তে-সিং' থেকে লাউৎসের একটি বাণী হলঘরে পড়া হল—"জ্ঞানী নিজের অকর্মের দ্বারা সবাইকে পরিচালিত করেন।"

শ্রীভগবান বললেন—অকর্মই সততকর্ম। নিত্য ও তীব্র কর্মপরতাই জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিশ্চলতা একটা আবর্তমান লাট্টুর (জাইরস্কোপ) আপাত-নিশ্চলতার মত। তার তীব্র গতি চোখে দেখা যায় না তাই তাকে স্থির বলে বোধ হয়। তবুও সেটা ঘুরছে। জ্ঞানীর আপাত নৈষ্কর্ম্যও তাই। এটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার অন্যথা লোকে সাধারণতঃ তাঁর স্থৈর্যকে নিষ্ক্রিয়তা ভাবে। বস্তুতঃ এটা তা নয়।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৬০০। ভাঙ্গা ভাঙ্গা তামিলে একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে—আত্মজ্ঞান লাভ হতে কত দেরী হবে?

ম—আগে আত্মা ও আত্মজ্ঞান কি জানো; তারপর আর সব জানতে পারবে।

ভ—মনকে হৃদয়ে অনুভব করতে হবে।

ম—তাই হোক। মন কি?

ভ—মন, হৃদয় সবই পেরুমলের [বৈষ্ণব মতানুসারে ঈশ্বরের অবতারের (বিষ্ণুর) নাম] অবতার।

ম—তা যদি হয়, আমাদের আর কি চিন্তা করার দরকার?

ভ—এই ধারণার ওপর জ্ঞান কি করে হয়?

ম—মনকে পেরুমলে (ঈশ্বরে) সমর্পণ কর। তাঁর অবতার কখন স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। তাঁর জিনিস তাঁকে দিয়ে আনন্দে থাকো।

ভ—কি করে এটা করা হয়?

ম—মনকে আমরা কিরূপে জানি? তার কাজ চিন্তার দ্বারা। যখনই চিন্তা উঠবে তখনই মনে করবে যে এগুলো সবই পেরুমলের

বৃত্তি, তারা এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ; এই যথেষ্ট ; এটাই মনের সমর্পণ। পেরুমল ছাড়া আর কি কিছু আছে ? সবই একমাত্র পেরুমল। তিনিই সবার মধ্যে কাজ করছেন। আমাদের আর চিন্তা কি ?

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

৬০১। একজন আন্ধ্র ভক্ত জি. ভি. স্থব্বারামিয়া 'কাল' সম্বন্ধে কিছু বললে।

ম—'কাল' কি ? এতে একটা অবস্থা, তার স্বীকৃতি আর তার জন্য যে পরিবর্তন হয় এটা মেনে নেওয়া হয়। ছ'টি অবস্থার অন্তর্বর্তী অবস্থাকে 'কাল' বলে। মন একটা অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এটা থাকতে পারে না। আত্মাই মনকে ধরে থাকে। যদি মনের ব্যবহার না হয় তবে কালের ধারণা হয় না। দেশ ও কাল মনে থাকে কিন্তু একজনের প্রকৃত অবস্থা মনের অতীত। যে নিজের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তির পক্ষে কালের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না।

শ্রীনারায়ণ আইয়ার—শ্রীভগবানের বাক্যগুলো এত মধুর কিন্তু তাদের তাৎপর্য আমাদের ধারণার অতীত। তারা এতই গভীর যে আমরা যে সেগুলো গ্রহণ করতে পারব তা আশাও করতে পারি না।

জি. ভি. এস—আমাদের ধারণাটা কেবল বুদ্ধিগত। শ্রীভগবান যদি কৃপা ক'রে কিছু উপদেশ দেন তবে আমাদের মঙ্গল হয়।

ম—যে ব্যক্তি আগ্রহী সাধককে 'এটা কর' 'ওটা কর' ব'লে উপদেশ দেয় সে প্রকৃত গুরু নয়। সাধক এমনিতেই তার কাজের জন্য ক্লিষ্ট, তার প্রয়োজন 'শান্তি' ও 'স্বস্তি'। । অন্যভাবে তার আবশ্যক কর্ম হতে বিশ্রাম। তা না করে তার কাজের ওপর কিংবা তার

পরিবর্তে তাকে আরও কিছু করতে বলা হয়। এটা কি সাধকের পক্ষে সাহায্য হল?

কর্মই সৃষ্টি ; কর্ম থেকে নিজের অন্তর্নিহিত আনন্দের নাশ হয়। যদি কর্মের পরামর্শ দেওয়া হয় তবে সেই পরামর্শদাতা গুরু নয়, হত্যাকারী। ব্রহ্মা কিংবা যম গুরুর ছদ্মবেশে এসেছে, বলা যায়। সে কখনও মুমুক্ষুদের মুক্ত করতে পারে না পরন্তু তার বন্ধন আরও দৃঢ় করে।

ভ—যখন কর্ম ত্যাগ করার চেষ্টা করি সেই চেষ্টাটাও একটা কর্ম। সুতরাং কর্ম অপরিহার্য মনে হয়।

ম—সত্য। তায়ুমানাবরও সেরূপ ইঙ্গিত করেছে। একজন ডাক্তার একটি রোগীকে একটা শর্তে ওষুধ খেতে পরামর্শ দিলে। শর্তটা এই যে সে যখন ওষুধ খাবে তখন বাঁদরের কথা চিন্তা করতে পারবে না। তবে কি আর সে রোগীর ওষুধ খাওয়া হয়? যখনই সে চিন্তা করবো না ভাববে তখনই কি সে সেই বাঁদরের কথা চিন্তা করবে না?

সেরূপ যখনই লোকে চিন্তা ত্যাগ করার চেষ্টা করে তাদের উদ্দেশ্য তাদের চেষ্টার জন্য ব্যর্থ হয়।

ভ—তবে অবস্থাটা কি করে লাভ হয়?

ম—কি লাভ করার আছে? যদি সেটা না পাওয়া থাকে তবেই না লাভ হয়। এখানে তার সত্তাই 'সেই' বস্তু।

কোন একজন—তবে আমরা একে জানি না কেন?

আন্নামালাই স্বামী—আমি সব সময়ে 'সোঽহম্' (আমি সেই) ভাববার চেষ্টা করবো।

ম—একজন 'আমি সেই' ভাববে কেন? সে তো 'সেই' হয়েই আছে। একজন মানুষ কি 'সে মানুষ' ভাবতে থাকে?

শ্রীঅনন্তচারী—'আমি মানুষ' বিশ্বাসটা এত দৃঢ় যে আমরা না ভেবে পারি না।

ম—'আমি মানুষ' ভাববে কেন? তোমায় কেউ সংপ্রশ্ন করলে তুমি বলতে পারো 'আমি মানুষ'। অতএব 'আমি মানুষ' চিন্তাটা তখনই ওঠে যখন 'আমি জন্তু'রূপ অন্য একটা চিন্তার উৎপত্তি হয়। অনুরূপভাবে যতক্ষণ 'আমি মানুষ'রূপ অন্য চিন্তা রয়েছে ততক্ষণই 'আমি সেই' চিন্তার দরকার।

ভ—'আমি মানুষ'বোধ এত দৃঢ় যে এটাকে ছাড়া যায় না।

ম—নিজের প্রকৃত স্বরূপে থাকো, 'আমি মানুষ' চিন্তা করবে কেন?

ভ—'আমি মানুষ' চিন্তাটা খুব স্বাভাবিক।

ম—তা নয়। অন্যপক্ষে 'আমি আছি'টাই স্বাভাবিক। এটাকে 'মানুষ' উপাধি-যুক্ত করছ কেন?

ভ—'আমি মানুষ' খুব স্পষ্ট, অন্যপক্ষে 'আমি সেই' আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ম—তুমি এটা নও, ওটাও নও। সত্য হল 'আমি আছি'। বাইবেলের মতে 'আমি আছি যা আমি আছি'। কেবল 'অস্তিত্বই (আছিই) স্বাভাবিক। তাকে 'মানুষরূপ' উপাধি-যুক্ত করা অবাঞ্ছিত।

ভ—(পরিহাস করে) যদি ভোট নেওয়া যায় তবে আমার দলেই বেশী হবে (হাস্য)।

ম—আমিও তোমার পক্ষে ভোট দিচ্ছি (হাস্য)। আমিও বলি আমি একজন মানুষ—কিন্তু এই শরীরেই সীমিত নই; সেটা 'আমাতে' আছে। এই যা পার্থক্য।

কোন একজন—মানুষ-উপাধি ত্যাগ করা যায় না।

ম—সুষুপ্তিতে কিরূপে থাকো? সেখানে কোন মানুষের অস্তিত্বের চিন্তা ছিল না।

অন্য একজন—সুতরাং এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও সুষুপ্তির অবস্থা আনতে হবে।

ম—হাঁ। এটা জাগ্রত সুষুপ্তি।

শ্রীভগবান বলে চললেন—অনেকে এও বলে যে যখন তারা সুপ্ত তখন তারা এই শরীরের ভিতর কোথাও থাকে। তারা ভুলে যায় যে এই ধারণাটা সুষুপ্তিতে থাকে না, কেবল ঘুম থেকে উঠলেই উদয় হয়। তারা তাদের জাগ্রত অবস্থাকে সুষুপ্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে।

আলো নিভে গেল আর সবাই বিদায় নিলে।

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬০২। কোডাইক্যানালের সেম্বাগানুরস্থিত সেক্রেড হার্ট কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ এমিল গাদিয়ার এস. জে. বললে—

"আপনি কৃপা করে আপনার উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারটি আমায় বলুন?"

ম—সেগুলো ছোট পুস্তিকাতে বিশেষতঃ 'আমি কে?' বইটাতে পাওয়া যাবে।

ভ—আমি সেগুলো পড়ব। আপনার উপদেশের মূল বস্তুটা কি আপনার মুখ থেকে পেতে পারি?

ম—মূলটাই সেই বস্তু।

ভ—স্পষ্ট হল না।

ম—মূলটাকে খোঁজো।

ভ—আমি ঈশ্বর থেকে এসেছি। ঈশ্বর কি আমার থেকে পৃথক নন?

ম—কে এই প্রশ্নটা করছে? ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন না। তুমি জিজ্ঞাসা করো। সুতরাং তুমি কে খুঁজে দেখো। তারপর ঈশ্বর তোমার থেকে পৃথক কিনা দেখো!

ভ—কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ আর আমি অপূর্ণ। আমি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে কি করে জানতে পারবো?

ম—ঈশ্বর সে কথা বলেন না। প্রশ্নটা তোমার। আগে তুমি কে জেনে ঈশ্বর কি দেখতে পারো।

ভ—কিন্তু আপনি আপনার আত্মাকে পেয়েছেন। কৃপা করে ঈশ্বর আপনার থেকে পৃথক কি না আমাদের বলুন।

ম—এটা একটা অনুভূতির বিষয়। প্রত্যেককেই নিজে অনুভব করতে হবে।

ভ—ও! বুঝেছি। কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত আর আমি সীমিত। আমার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেটা কোনমতেই ঈশ্বরে মিলিয়ে যেতে পারে না। তাই না?

ম—অনন্ত ও পূর্ণতে কোন খণ্ডতা নেই। যদি অনন্ত থেকে সান্ত সত্তার উৎপত্তি হয় তবে অনন্তের পূর্ণতার হানি হয়। এরূপে তোমার বাক্যের পদ ও অর্থের অসঙ্গতি হয়।

ভ—না, ঈশ্বর ও জগৎ উভয়কে দেখুন।

ম—তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব কি করে জানো?

ভ—আমার একটা আত্মা আছে। তার কর্ম থেকে একে জানি।

ম—তোমার সুষুপ্তিতে কি তুমি একে জানতে?

ভ—সুষুপ্তিতে কর্ম থেমে যায়।

ম—কিন্তু সুষুপ্তিতে তুমি থাকো। এখনও তুমি আছো। এ দু'টির মধ্যে কোনটা তোমার প্রকৃত স্বরূপ?

ভ—নিদ্রা ও জাগরণ কেবল আকস্মিক। আমি এই আকস্মিকগুলোর পিছনে সারবস্তু।

(সে ঘড়ির দিকে চাইলে আর বললে যে তার ট্রেন ধরার সময় হয়ে গেছে। সে শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলে। সুতরাং কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গেল।)

৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬০৩। লেডি বেটম্যান তার মেয়ের সঙ্গে শ্রীভগবানকে দর্শন করার জন্য এসেছে। সে ভার্সাই থেকে প্যাসকালিন মৈলার্তের একটি চিঠি নিয়ে এসেছে। সেটা এরূপ—

"আপনার আশ্রমের দ্বারদেশে শেষবার প্রবেশ করার পর আরও দু'টি বৎসর এল আর চলে গেল, তবুও অন্তরে আমি সর্বদাই সেখানে রয়েছি।

"আপনার সান্নিধ্যের দিব্য মৌন দ্বারা অপাবৃত সত্যের প্রকাশকে ভ্রম এখনও মাঝে মাঝে আবৃত করে।

"যদিও আত্মবোধের রজতরেখা চঞ্চল আলো ও আঁধারে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যায় তথাপি আত্মজ্ঞানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে আর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও তীব্রতর হচ্ছে কারণ কৃপা ও অনুসন্ধান এক সাথে চলে।

"কোন কোন সময়ে, কোন বিরল মুহূর্তে, অহেতুক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আমি' চেতনার উদয় হয় আর তার দিব্যসংবেদনে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে যায়। চেষ্টাহীন একাগ্রতা এই অবস্থায় চলতে থাকে আর যতক্ষণ না আবার আবরণ এসে আবৃত করে আর ভ্রম সত্যের প্রকাশকে অস্পষ্ট করে ততক্ষণ সকল কামনা পরিপূর্ণ শান্তিতে লয় হয়ে যায়।

"তথাপি হৃদয় যা অনুভব করেছে ও বার বার যাকে সত্য বলে জেনেছে তাকে কখনই অস্বীকার করা বা বিস্মৃত হওয়া যাবে না, আর 'যা আছে' সেই-ই ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দেয়।

"আমার আত্মার স্বরূপ আপনার কাছে আমি জ্ঞান ও পথ-নির্দেশনা যা সর্বদাই রয়েছে বলে জানি তার জন্য প্রার্থনা করছি; আর আপনার শ্রীচরণে আমার একান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।"

(স্বা) প্যাসকালিন

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৮ ১১, রু ডি রিসার্ভ, ভার্সাই

১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬০৪। জনৈকা মহিলা একটি ভক্তিমূলক গান গাইলে। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটাও ছিল—

"তুমি মোর পিতা
তুমি মোর মাতা
তুমিই স্বজন বান্ধব
তুমি মোর সর্বস্ব ধন।" ইত্যাদি।

শ্রীভগবান মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন—"হাঁ, হাঁ, তুমি এই, ওই আর সব কিছু কেবল 'আমি' ছাড়া। 'আমিই তুমি' বলে শেষ করে দাও না কেন?"

৬০৫। জনৈক আন্ধ্র ভদ্রলোক একটা কাগজে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে শ্রীভগবানকে দিলে ও সেগুলোর উত্তর চাইলে। শ্রীভগবান সেটা নিজের হাতে নিলেন, প্রশ্নগুলো দেখলেন আর বললেন—

"এসব প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন প্রশ্ন করার জন্য একজন থাকে। যদি প্রশ্নকারীকে খোঁজা যায় আর পাওয়া যায় তবে প্রশ্নগুলো আপনা হতে সমাপ্ত হয়ে যায়।"

উত্তরে লোকটি বললে—অনেক লোকই এই প্রশ্নগুলো করে তাদের কি উত্তর দিতে হয় জানি না। সেজন্য বিষয়টা জানতে চাই।

ম—যদি বিষয়ীকে (বিষয়ের আধারকে) জানা যায় তবে বিষয়ও স্পষ্ট হয়।

৬০৬। একজন উকিলভক্ত বেঙ্কটকৃষ্ণয়া শ্রীভগবানকে দশ বছর আগে দর্শন করেছিল আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে নিজের উন্নতি কি করে করবে। শ্রীভগবান তাকে গায়ত্রী জপ করতে বলেন। যুবকটি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়। সে কয়েক বছর পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে—

আমি যদি গায়ত্রীর অর্থের ওপর ধ্যান করি তবে আমার মন চঞ্চল হয়। কি করব ?

ম—তোমায় কি মন্ত্রের ওপর কিংবা তার অর্থের ওপর ধ্যান করতে বলা হয়েছে ? যে মন্ত্র জপ করছে তোমায় তাকে 'চিন্তা করতে হবে।

আবার সেই লোকটি কোন একজন বিখ্যাত মহাত্মার কাছে যায় তিনি তাকে কেবল "ওঁ" এর পরিবর্তে 'ওঁ নমঃ' জপ করতে বলেন কারণ 'ওঁকার' সন্ন্যাসীদের জন্য আর 'ওঁ নমঃ' যে কেউ বলতে পারে। যখন সে এখানে এল সে শ্রীভগবানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে। শ্রীভগবান হাল্কাভাবে উত্তর দিলেন—

সন্ন্যাসীরা ছাড়া অন্যেরা বুঝি আত্মানুসন্ধান করতে ও সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না ?

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬০৭। শ্রীভগবান লেডি বেটম্যানকে বললেন—একটা স্থায়ী অবস্থা আছে ; সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থাগুলো তার ওপর সঞ্চরমান অবস্থা। সেগুলো যেন সিনেমার পর্দায় চলন্ত ছবি।

সবাই পর্দাটা ও তার সঙ্গে ছবিগুলো দেখে কিন্তু পর্দাকে অগ্রাহ্য ক'রে কেবল ছবিগুলোকেই নেয়। জ্ঞানী কিন্তু কেবল পর্দাই দেখে, ছবি দেখে না। ছবিগুলো অবশ্যই পর্দার ওপর চলে কিন্তু তাকে প্রভাবিত করে না। পর্দা নিজে চলে না, স্থির হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে, একজন লোক রেল গাড়ীতে চড়ে মনে করে সে চলছে। বাস্তবিকপক্ষে সে বসে থাকে ও আরাম করে আর রেলগাড়ীটাই কেবল ছুটে চলে। সে কিন্তু গাড়ীর গতিটা নিজের ওপর আরোপ করে কারণ সে নিজেকে শরীর বলে মনে করেছে। সে বলে, "আমি একটা স্টেশান পার হলাম—এখন একটা—আবার একটা

ইত্যাদি।" একটু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে সে নিশ্চল হয়ে বসে আছে আর স্টেশানগুলোই চলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তার একথা বলতে বাধে না যে সে এতটা পথ এসেছে, যেন সে সমস্ত রাস্তাটা কষ্ট করে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে।

তার সত্তার প্রকৃত অবস্থা যে সুদৃঢ় ও স্থির আর সব কর্ম তার চারিপাশে হয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে জ্ঞানী পূর্ণ সচেতন। তার স্বরূপ পরিবর্তিত হয় না আর তার অবস্থাও বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না। সে সব কিছু উদাসীনের মত দেখে আর নিজে আনন্দময় হয়ে থাকে।

তার অবস্থাটাই প্রকৃত এবং সত্তার আদি ও সহজ অবস্থা। মানুষ একবার তাতে পৌঁছালে সেখানে স্থির হয়ে যায়। একদা স্থিতিই অনন্ত স্থিতি। অতএব যে অবস্থা পাতাল লিঙ্গ ভূগর্ভগৃহে ছিল সেটাই নিরবচ্ছিন্নভাবে রয়েছে, কেবল পার্থক্য এই যে তখন শরীরটাও নিশ্চল ছিল এখন এটা ক্রিয়াশীল হয়েছে।

একজন জ্ঞানী ও একজন অজ্ঞানীর আচরণে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা কেবল তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে। অজ্ঞানী নিজেকে অহংকাররূপে নির্ধারণ করে আর তার ক্রিয়াগুলো আত্মার মনে করে, অপরপক্ষে জ্ঞানীর অহংকার নষ্ট হয়ে গেছে আর সে নিজেকে এই কিংবা ওই শরীরে, এই বা ওই ঘটনা ইত্যাদিতে সীমিত মনে করে না। আপাত-কর্মে অকর্ম ও আপাত-অকর্মে কর্ম হয় যেমন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে—

(১) একটি ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ানো হয়। পরের দিন সকালে উঠে সে খাওয়ার কথা অস্বীকার করে। এখানে আপাত-কর্মে অকর্ম কারণ যদিও মা দেখলে যে সে খেলো তথাপি ছেলেটি কিন্তু তা জানে না।

(২) একজন চালক গাড়ীতে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু গাড়ীটা রাত্রে পথ চ'লে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেল আর চালক গাড়ী চালিয়ে এসেছে বললে। এখানে আপাত-অকর্মে কর্ম।

(৩) একজন লোক মনে হচ্ছে যে গল্প শুনছে, ঘাড় নাড়ছে কিন্তু তার মন অন্য কোথাও ব্যস্ত আর সে প্রকৃত পক্ষে গল্পটা শুনছে না।

(৪) দু'জন বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে ঘুমাচ্ছে। একজন স্বপ্ন দেখলে যে তারা দু'জনে পৃথিবী ঘুরে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করলে। জেগে উঠে যে স্বপ্ন দেখেছিল সে অন্যজনকে বললে যে তারা দু'জনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। অন্যবন্ধুটি গল্পটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলে।

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলে যে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তার ভাল লাগে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সে যদি সুষুপ্তিকে পছন্দ না করে তবে সে বিছানা সম্বন্ধে মনোযোগ দেয় কেন?

সে বললে সেটা ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য, এটা একরূপ স্বমত্ততা (অটো-ইনটক্‌সিকেশান্)। "ঘুমের অবস্থা নূতনত্ব-বর্জিত অন্যপক্ষে জাগ্রত অবস্থা বিচিত্র ও আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ।"

ম—যাকে তুমি সুন্দর ও রোচক বস্তু ভরা মনে কর সেটা একটা এক ঘেয়ে অজ্ঞান ঘুমের অবস্থা—জ্ঞানীদের মতে।

যা নিশা সর্বভূতানাম্ তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। গী-২।৬৯

অন্যের কাছে যা অন্ধকার সেখানে জ্ঞানী জেগে থাকে। তোমায় এখন যে ঘুমে ঘিরে আছে তা থেকে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে।

১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬০৮। শ্রীমতী হিকরিডিং দু'টি প্রশ্ন লিখে একটা কাগজ শ্রীভগবানকে দিলে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে যে তার ব্যাখ্যা ঠিক কিনা।

ম—আত্মা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত। এটা পূর্ণ। আত্মা শুদ্ধ চেতনা, সেখানে কোন অজ্ঞান অন্ধকার না থাকায় এই সংশয় সেখানে ওঠে না।

ভ—আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ওঠে।

ম—যার উঠছে তাকে দেখো। এদের মূলে যাও। মূলে পৌঁছে গেলে আর সেটা ধরে থাকলে দেখো সংশয় ওঠে কিনা।

ভ—কিন্তু বর্তমান অবস্থায়…।

ম—এরূপ আলোচনা বুদ্ধিগত আর তার শেষ নেই। একজনকে বাস্তববাদী হতে হবে আর যে উপায় বলা হয়েছে তার দ্বারা নিজেকেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রণালীটা আগেই দেখানো হয়েছে। খুঁজে দেখো প্রশ্নগুলো কার উঠছে। তারা স্বতঃই বিলীন হবে।

৬০৯। লেডি বেটম্যান ও অন্যেরা প্রায় সাড়ে তিনটার সময়ে হলঘরে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে লিখে প্রশ্ন করলে যে একজন জাগ্রত অবস্থার থেকে সুষুপ্তিতে শুদ্ধ চৈতন্যের বেশী নিকটে থাকে কি না।

ম—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থাগুলো কেবল আত্মার ওপর প্রতীয়মান ব্যাপার মাত্র, আত্মা স্বয়ং স্থির ও সহজ বোধের অবস্থা। কেউ কি এক মুহূর্তের জন্য আত্মা ছাড়া থাকে? যদি সেটা সম্ভব হয় তবেই প্রশ্নটা উঠতে পারে।

ভ—প্রায়ই কি এটা বলা হয় না যে একজন জাগ্রত অবস্থার থেকে সুষুপ্তিতে শুদ্ধ চেতনার বেশী নিকটে থাকে?

ম—প্রশ্নটা এভাবে বললেও হয়—আমি কি জাগ্রত অবস্থার থেকে সুষুপ্তিতে আমার বেশী নিকটে?

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। কেউ তার কাছ থেকে কখনই দূরে যায় না। এ প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন দ্বৈতবোধ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থায় কোন দ্বৈতবোধ নেই।

একই লোক ঘুমায়, স্বপ্ন দেখে আর জেগে ওঠে। জাগ্রত অবস্থাকে সুন্দর ও রোচক বিষয়ে ভরা মনে হয়। এরূপ অভিজ্ঞতার

অভাবে একজন বলে যে ঘুমটা অরুচিকর। আরও আলোচনার আগে আমাদের এই বিষয়টা বোঝা যাক। তুমি কি সুষুপ্তিতে তোমার অস্তিত্ব স্বীকার কর না?

ভ—হ্যাঁ, করি।

ম—এখন যে জেগে আছে তখনও সেই একই লোক থাকে, তাই নয় কি?

ভ—হ্যাঁ।

ম—তবে সুষুপ্তি আর জাগ্রতে একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই সাতত্যটা কি? এটা কেবল বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অবস্থা।

এই দু'টি অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি? জাগৃতিতে শরীর, জগৎ ও বিষয় অনুভূত হয় আর সুষুপ্তিতে সেগুলো অদৃশ্য হয়।

ভ—কিন্তু আমি সুষুপ্তিতে সচেতন থাকি না।

ম—সত্য, শরীর ও জগতবোধ থাকে না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় সুষুপ্তিতে থাকো নতুবা এখন কি করে বল 'আমি ঘুমে সচেতন থাকি না'। এটা এখন কে বলে? জাগ্রত লোকটি বলে। সুষুপ্ত লোকটি বলতে পারে না। তার অর্থ, যে লোকটি এখন নিজেকে শরীর বলে মনে করছে সে বলছে যে, তার সুষুপ্তিতে সেরূপ কোন চেতনা ছিল না।

যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর মনে কর সেজন্য তুমি তোমার চারি-পাশে জগৎ দেখো আর বল যে জাগৃতি চমৎকার আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। নিদ্রিত অবস্থা বিরক্তিকর কারণ সেখানে তুমি তোমার ব্যক্তিসত্তারূপে থাকো না আর সেজন্য বিষয়গুলোও থাকে না। কিন্তু তথ্যটা কি? তিনটি অবস্থার মধ্যে অস্তিত্বের সাতত্য আছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও বিষয়ের নিরবচ্ছিন্নতা নেই।

ভ—হ্যাঁ।

ম—যা সতত-বর্তমান তাই স্থায়ী অর্থাৎ নিত্য। যা বিচ্ছিন্ন তা ক্ষণস্থায়ী।

ভ—হাঁ।

ম—অতএব অস্তিত্বের অবস্থা স্থায়ী আর শরীর ও জগৎ তা নয়। তারা নিত্যস্থির সৎ-চিৎরূপ পর্দার ওপর কতগুলো চলন্ত ব্যাপার।

ভ—আপেক্ষিক ভাবে বললে সুষুপ্তি অবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ চৈতন্যের বেশী নিকটবর্তী?

ম—হাঁ, এইভাবে। যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠা হয় তখন 'আমি'-চিন্তাটা শুরু হয়; মনের খেলা আরম্ভ হয়; চিন্তার উদয় হয়; আর তারপর শরীরের ক্রিয়া-কলাপগুলো সক্রিয় হয়; এইসব মিলিয়ে আমরা বলি জেগে উঠেছি। এই সব বিবর্তনের অভাবই সুষুপ্তির স্বভাব, অতএব এটা জাগ্রতির তুলনায় বিশুদ্ধ চৈতন্যের নিকটবর্তী।

কিন্তু তা বলে একজন যেন অবিরত ঘুমের ইচ্ছা না করে। প্রথমতঃ এটা অসম্ভব কারণ এটা স্বতঃই পর্যায় ক্রমে আবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানী যে পরমানন্দময় অবস্থায় থাকে এটা তা হতে পারে না, কারণ জ্ঞানীর অবস্থা নিত্য, তাতে কোন পর্যায় নেই। তাছাড়া লোকে সুষুপ্তি অবস্থাকে চেতন অবস্থা বলে অনুভব করে না; কিন্তু জ্ঞানী সর্বদা সচেতন থাকে। এরূপে জ্ঞানী যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সেটা সুষুপ্তি অবস্থা থেকে পৃথক।

অধিকন্তু সুষুপ্তি অবস্থা চিন্তাশূন্য আর এ অবস্থায় ব্যক্তির ওপর চিন্তার প্রভাব থাকে না। একে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না কারণ সে অবস্থায় চেষ্টা অসম্ভব। যদিও এটা বিশুদ্ধ চেতনার নিকটবর্তী তবুও এটা আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

আত্মোপলব্ধির আগ্রহ কেবল জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে আর তার জন্য চেষ্টাও কেবল জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে। আমরা দেখি যে জাগ্রত অবস্থার চিন্তাগুলোই সুষুপ্তির শান্ত অবস্থা লাভের বাধা সৃষ্টি করে। "শান্ত হও আর 'আমি আছিকেই ঈশ্বর' বলে জানো।"

সুতরাং শান্ত অবস্থাই সাধকের লক্ষ্য। একটিমাত্র চিন্তাকে এক মুহূর্তের জন্য থামাবার চেষ্টা করলেও সেটা শান্ত অবস্থায় পৌঁছাবার দিকে অনেক দূর নিয়ে যায়। চেষ্টার প্রয়োজন আর সেটা কেবল জাগ্রত অবস্থাতেই হওয়া সম্ভব। এখানে চেষ্টা আছে—সচেতনতাও আছে, চিন্তা থেমে গেছে সুতরাং সুষুপ্তির শান্তি লাভ হয়। এটাই জ্ঞানীর অবস্থা। এটা না সুষুপ্তি না জাগৃতি কিন্তু দু'টির অন্তর্বর্তী অবস্থা। এখানে জাগৃতির সচেতনতা আছে এবং সুষুপ্তির শান্তি আছে। একে 'জাগ্রত-সুষুপ্তি' বলে। একে 'জাগ্রত-সুষুপ্তি' বা 'সুষুপ্ত-জাগৃতি' বা সুষুপ্তিহীন-জাগৃতি' বা জাগরণশূন্য-সুষুপ্তি' যা বল। এটা সুষুপ্তি বা জাগরণ কোনটাই নয়। এটা অতিজাগ্রত বা অতি-সুষুপ্তি। এটাই পূর্ণ চেতনা ও পূর্ণ শান্তির সম্মিলিত অবস্থা। এটা জাগৃতি ও সুষুপ্তির অন্তর্বর্তী অবস্থা ; দু'টি চিন্তার অন্তর্বর্তী অবস্থা। এই সেই মূল যা থেকে চিন্তার উদয় হয় যেটা আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠলে দেখি। অন্যভাবে বললে, সুষুপ্তির শান্ত অবস্থাই চিন্তার মূল। চিন্তাই সুষুপ্তির শান্ত অবস্থা ও জাগ্রতের বিক্ষুব্ধ অবস্থার পার্থক্য সৃষ্টি করে। চিন্তার মূলে যাও তবেই সুষুপ্তির শান্ত অবস্থা পাবে। কিন্তু তোমায় পূর্ণ অনুসন্ধানের শক্তিতে অর্থাৎ পূর্ণসচেতনায় যেতে হবে।

এটাই সেই জাগ্রত-সুষুপ্তি যা আগে বলা হয়েছে। এটা নিরানন্দ নয় কিন্তু পরমানন্দময় অবস্থা। এটা ক্ষণস্থায়ী নয় পরন্তু নিত্য। এর থেকে চিন্তা শুরু হয়। আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো চিন্তা ছাড়া আর কি? সুখ ও দুঃখ কেবল চিন্তামাত্র। এগুলো আমাদের মধ্যেই রয়েছে। যদি তুমি চিন্তাশূন্য অথচ সচেতন থাকতে পারো তবে 'তুমিই সেই পূর্ণ সত্তা'।

লেডি বেটম্যান আলোচনার প্রশংসা করলে আর শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিলে। পরে বললে যে সে আগামী কাল চলে যাচ্ছে।

শ্রীভগবান হেসে বললেন—

তুমি এক স্থান ছেড়ে অন্যস্থানে যাও না। তুমি নিত্যস্থির। দৃশ্যগুলো কেবল সরে যায়। এমনকি সাধারণভাবে দেখলেও তুমি তোমার কেবিনে বসে থাকো আর জাহাজটা চলে, কিন্তু তুমি চল না। আমরা একটা ছবিতে দেখি যে একজন কয়েক মাইল দৌড়ে আমাদের দিকে আসছে, কিন্তু পর্দাটা চলে না। ছবিটা কেবল এল আর চলে গেল।

ভ—হাঁ, তাই। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের পরই এটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো।

ম—আত্মা সর্বদাই অনুভূত। উপলব্ধি যদি এমন কিছু হত যা পরে পাওয়া যায় তবে সেটা হারাবার সম্ভাবনাও থাকে। এরূপে সেটা ক্ষণস্থায়ী হবে। ক্ষণিক আনন্দ দুঃখেরই নামান্তর। এটা শাশ্বত মুক্তি হতে পারে না।

এটা যদি সত্য হয় যে তুমি পরে উপলব্ধি করবে তবে তুমি এখন উপলব্ধি করছ না। বর্তমান উপলব্ধির অভাব-অবস্থা ভবিষ্যতেও যে কোন মুহূর্তে হতে পারে কারণ কাল অনন্ত। তবে এরূপ উপলব্ধিও অস্থায়ী। কিন্তু এটা সত্য নয়। উপলব্ধি অস্থায়ী ভাবা ভুল। এটাই প্রকৃত নিত্য অবস্থা যার পরিবর্তন হয় না।

ভ—হাঁ, আমি সময়ে এটা বুঝতে পারবো।

ম—তুমি এইক্ষণেও 'তাই'। কাল ও দেশ আত্মাকে প্রভাবিত করে না। সেগুলো তোমাতে রয়েছে; আর যা কিছু তুমি তোমার চারপাশে দেখছ তারাও তোমাতেই রয়েছে। এটা বোঝাবার জন্য একটা গল্প আছে। একজন মহিলার গলায় একটা মূল্যবান গহনা ছিল। একদিন সে উত্তেজনাবশে সেটা ভুলে গেল আর ভাবলে যে সেটা হারিয়ে গেছে। সে খুব উদ্বিগ্ন হল, বাড়ীতে খুঁজলে, পেলে না। সে তার বন্ধু-বান্ধবী, পাড়া-প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করলে যে কেউ তার হারের কথা জানে কিনা। তারা জানে না। শেষে তার একজন দয়াবতী বান্ধবী তাকে তার গলাটা হাত দিয়ে দেখতে

বললে। সে দেখলে যে হারটা সব সময়েই তার গলায় রয়েছে আর সে খুশি হল! পরে যখন অন্যেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে যে সে তার হারানো হারটা পেয়েছে কিনা, সে বললে 'হাঁ, পেয়েছি'। সে তখনও ভাবছে যে সে তার হারানো গহনা ফিরে পেয়েছে।

এখন, সে কি এটা আদৌ হারিয়েছিল। এটা সব সময়ে তার গলায় ছিল। কিন্তু তার অনুভূতিটা বিবেচনা কর। সে খুশি হল যেন সে হারানো গহনা ফিরে পেল। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ, আমরা মনে করি যে, কোন সময়ে উপলব্ধি করবো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কখনই আত্মা ছাড়া আর কিছু নই।

ভ—আমার মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী ছেড়ে আমায় অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শ্রীভগবান চিঠিপত্র দেখতে দেখতে এটা শুনতে পেয়ে হেসে বললেন—

এই স্বর্গরাজ্য। বাইবেলের বলা স্বর্গরাজ্য আর জগৎ কিছু ছ'টি পৃথক স্থান নয়। বাইবেল বলে 'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।' এটা তাই। আত্মজ্ঞানী একেই 'স্বর্গরাজ্য' দেখে অন্যপক্ষে অন্যেরা একে 'এই জগৎ' দেখে। পার্থক্যটা কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর।

ভ—আমরা কি করে জগৎ ও তার লোকেদের অস্বীকার করতে পারি? আমি একটা সঙ্গীত শুনছি। এটা সুমিষ্ট ও অপূর্ব। আমি এটা ভাগ্‌নারের বলে বুঝতে পারলাম। আমি একে আমার রচিত বলতে পারি না।

ম—ভাগ্‌নার বা তার সঙ্গীত কি তোমায় ছাড়া থাকে? যদি তুমি সেখানে এটা ভাগ্‌নারের বলার জন্য না থাকো তবে কি তুমি এর সম্বন্ধে সচেতন হও? তার সম্বন্ধে বোধ না থাকলে কি সেটা আছে বলা যায়? আরও স্পষ্টভাবে বললে—সুষুপ্তিতে কি তুমি ভাগ্‌নারের সঙ্গীত বুঝতে পারো? তথাপি তুমি সুষুপ্তিতে থাকো, স্বীকার করো। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ভাগ্‌নার ও সঙ্গীত কেবল তোমার চিন্তায় রয়েছে। তারা তোমাতেই আর তুমি ছাড়া নয়।

ভ—চমৎকার !

[সংগ্রহীতার মন্তব্য :—

প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে বিভ্রান্ত হয়। যদিও সত্য শোনা ও বোঝা হয়, তথাপি কালে বিস্মরণ হয়ে যায়। আর তথ্যের সম্মুখীন হলেও ভ্রান্তি হয়। জ্ঞানের স্থানে অজ্ঞান আসে আর তার ফলে প্রমাদ হয়। একমাত্র জ্ঞানীই আমাদের চিন্তাধারাকে মাঝে মাঝে সন্মার্গাভিমুখী করতে পারেন। এটাই সৎসঙ্গের অর্থাৎ জ্ঞানীর সঙ্গের উপযোগিতা।]

৬১০। একজন ভক্ত এই প্রশ্নগুলো করলে—

(১) জীবাত্মা ও ব্রহ্ম এক হলে এই সৃষ্টির কারণ কি?

(২) ব্রহ্মজ্ঞানীর কি শরীরের কষ্ট থাকে ও পুনর্জন্ম হয়? সে কি নিজের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ বা হ্রস্ব করতে পারে?

ম—সৃষ্টির উদ্দেশ্য তোমার ব্যক্তিত্বের ভ্রম দূর করা। প্রশ্ন থেকেই মনে হচ্ছে যে তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর আর সেজন্য নিজেকে ও চারিপাশের জগৎ দেখো। তুমি মনে কর যে তুমি শরীর। এই ভুল নির্ধারণের কারণ তোমার মন ও বুদ্ধি।

তুমি কি তোমার সুষুপ্তিতে থাকো?

ভ—হাঁ, থাক।

ম—সেটাই এখন জাগ্রতে রয়েছে ও এই প্রশ্ন করছে। তাই নয় কি?

ভ—হাঁ।

ম—এই প্রশ্নগুলো তোমার সুষুপ্তিতে ওঠে না। উঠেছিল কি?

ভ—না।

ম—কেন নয়? কারণ তুমি তখন শরীর দেখনি আর কোন চিন্তাও ওঠে নি। তখন তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে করোনি। সেজন্যই এসব প্রশ্ন ওঠে নি।

তারা এখন ওঠে কারণ তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর। তাই না?

ভ—হ্যাঁ।

ম—এখন দেখ, তোমার প্রকৃত স্বরূপ কোন্‌টা? সেটা কি চিন্তাশূন্য অবস্থা কিংবা চিন্তাকুল অবস্থা?

অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন। চিন্তাগুলো বিচ্ছিন্ন। সুতরাং কোনটা নিত্য?

ভ—অস্তিত্ব।

ম—ঠিক তাই। একে অনুভব কর। সেটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। তোমার স্বরূপ সকল চিন্তাশূন্য কেবল অস্তিতামাত্র।

যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর মনে কর সেজন্য তুমি সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে চাও। জগৎ ও তোমার শরীর সমেত সকল বিষয়বস্তু জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় কিন্তু সুষুপ্তিতে অদৃশ্য হয়। তুমি কিন্তু সবগুলো অবস্থার মধ্যে থাকো। তবে কোন্ বস্তুটা এই সব অবস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে? তাকে খোঁজো। সেটাই তোমার আত্মা।

ভ—মনে করুন পাওয়া গেল, তখন কি হবে?

ম—তাকে খোঁজো আর দেখো কি হয়? প্রকল্পিত প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

ভ—তখন কি আমি ব্রহ্মের সঙ্গে এক?

ম—ব্রহ্মের কথা এখন থাক। তুমি কে খোঁজো। ব্রহ্ম নিজের ব্যবস্থা করতে পারেন।

তুমি যদি নিজেকে শরীর ব'লে নির্ধারণ করা ত্যাগ কর তবে সৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি কোন প্রশ্ন উঠবে না। এগুলো তোমার ঘুমের মধ্যে ওঠে না। অনুরূপভাবে তারা তোমার প্রকৃত অবস্থাতেও উঠবে না।

এরূপে সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে তুমি এখন তোমাকে যেখানে

দেখছ সেখান থেকে এগিয়ে যাবে আর নিজের প্রকৃত 'সত্তা'কে উপলব্ধি করবে।

তুমি তোমার সুষুপ্তিতে কোন প্রশ্ন তুলতে পার না কারণ তখন কোন সৃষ্টি নেই। তুমি এখন প্রশ্ন করছ কারণ তোমার চিন্তা এসেছে আর সৃষ্টিও রয়েছে। এরূপে সৃষ্টি কেবল তোমার মনের চিন্তা।

তুমি তোমার ব্যবস্থা কর আর ব্রহ্মজ্ঞানীও তার নিজের ব্যবস্থা করবে। তুমি যদি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানো তবে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থাও জানবে, এখন সেটা বর্ণনা করা বৃথা। যেহেতু তুমি মনে করছ যে তুমি একজন জ্ঞানীকে তোমার সামনে দেখছ আর যেমন তুমি নিজের বেলায় করেছ সেরূপ তাকেও তুমি একটা শরীর বলে নির্ধারণ করছ, সেজন্য ভাবছ যে সেও তোমার মত সুখ ও দুঃখ অনুভব করে।

ভ—কিন্তু আমায় জানতে হবে যে সে জ্ঞানী কিনা তবেই না আমি তার কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করবো।

ম—হ্যাঁ। সেই-ই বলছে; সে অনুপ্রাণিত করে। সে যা বলছে করো। তুমি শিখতে চাও, পরীক্ষা করতে চাও না তো!

যাতে মুমুক্ষু অনুপ্রাণনা লাভ ক'রে দুঃখ থেকে মুক্তি ও আনন্দ লাভ করে সেজন্য শাস্ত্রে 'জ্ঞান লক্ষণ' বলা হয়েছে। পদ্ধতিও দেওয়া হয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করলে সেই লক্ষণযুক্ত জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয়। সেগুলো অন্যদের পরীক্ষা করার জন্য নয়।

৬১১। ভ—আমার মনে হয় জীবাত্মা আন্তর জ্যোতি। যদি মৃত্যুর পর সেটা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায় তবে জীবাত্মার জন্মান্তর হয় কি করে?

ম—কার অন্তরে? কে মারা যায়?

ভ—তবে প্রশ্নটা অন্যভাবে বলি।

ম—তর্কের প্রয়োজন নেই। উত্তরটা বিবেচনা কর আর দেখো।

ভ—কিরূপে ?

ম—এখন যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর মনে কর সেজন্য তুমি বলছ যে জীবাত্মা আন্তর জ্যোতি। তুমি বলতে চাও শরীরের মধ্যে জ্যোতি আছে।

একটু ভাবো আর বল দেখি শরীরটা কোন প্রশ্ন করতে পারে কিনা। এটা জড় আর 'আমি' বলতে পারে না। আর একটা কিছু 'আমি' বলে। সেটা কি ? সেটা কি আত্মা ? আত্মা শুদ্ধ আর সে অন্য ব'লে কিছুর সম্বন্ধে সচেতন নয় যার জন্য 'আমি' বলবে। তবে 'আমি'টা কে বলে ? এটা শুদ্ধ চিৎ ও জড়ের (শরীরের) মধ্যে সংযোজক কিছু। সেটাই অহংকার। এখন তুমি কে ? যা জন্মেছে সেটা কি ? আত্মা নিত্য, তার জন্ম হয় না। শরীরটা আসে যায় আর তাকেই 'তুমি' বলে নির্ধারণ করার ফলে তুমি জন্ম ও মৃত্যুর কথা বল। 'আমি'র প্রকৃত তাৎপর্য কখন জন্ম নিতে পারে কি না দেখো। জন্মান্তরটা কার ?

ভ—মহারাজ! আমরা এখানে সংশয় নিবারণের জন্য এসেছি।

ম—নিশ্চয়ই।

ভ—আমাদের সংশয় প্রশ্নের দ্বারাই নিরসন হয়।

ম—হাঁ। প্রশ্ন করাতে কেউ আপত্তি করছে না।

ভ—বলা হয় 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (বার বার প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা)। সুতরাং আমরা প্রশ্ন করবো আর গুরু কৃপা করে আমাদের সংশয় নিরসন করবেন।

ম—উদ্ধৃতিটা শেষ কর 'উপদেক্ষ্যন্তি তত্ত্বম্' (তত্ত্বের উপদেশ করেন)।

ভ—হাঁ। কিন্তু আমাদের সংশয় দূর হওয়া চাই।

ম—অর্জুনের তাই হয়েছিল। কারণ সে শেষে বলেছে 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (মোহ নষ্ট হয়েছে ; স্মৃতি লাভ করেছি)।

ভ—এটা সর্বশেষে। তার আগে সে কত প্রশ্ন করেছে।

ম—সত্যটা প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হয়েছিল। কারণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের প্রথম শ্লোকটিই শুরু হল "জন্ম নেই ; মৃত্যু নেই ; পরিবর্তন নেই ইত্যাদি" দিয়ে।

ভ—শ্রীকৃষ্ণ এও বলেছেন, "আমাদের অনেক জন্ম হয়েছে। আমি সেগুলো জানি ; কিন্তু তুমি জানো না।"

ম—সেটা কেবল যখন প্রশ্ন উঠল যে শ্রীকৃষ্ণ কি করে আদিত্যকে এই সনাতন সত্যের কথা বলেছেন বলে দাবী করছেন। সত্যটা আরম্ভেই বলা হয়েছিল। অর্জুন বুঝতে পারলে না। জ্ঞানীর অবস্থা ও জ্ঞানলাভের প্রণালী পরে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে সত্য সনাতন আর তিনি তা প্রথমে আদিত্যকে বলেছিলেন। অর্জুন ক্রমাগত নিজেকে শরীর বলে মনে করছে আর সেহেতু শ্রীকৃষ্ণকেও তার সামনে একটি শরীর বলে ভাবছে। অতএব সে জিজ্ঞাসা করলে, "সে কি করে হয়? আপনি এই কিছুদিন পূর্বে দেবকীর গর্ভে জন্মেছেন। যারা সৃষ্টি আরম্ভ করেছে আদিত্য তাদের একজন। আপনি এই সত্য আদিত্যকে কি করে বললেন?"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর সেই ভাবেই দিলেন, "আমাদের বহু জন্ম হয়েছে। আমি তাদের জানি ; কিন্তু তুমি জানো না ইত্যাদি।"

ভ—আমাদেরও সত্য জানা উচিত।

ম—সত্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দেখো তুমি কে। এটাই সম্পূর্ণ উপদেশ।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬১২। শ্রীমতী হিকরিডিং লিখিতভাবে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—"ভগবান যখন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুকটাক্ষ বা গুরুদর্শন সম্বন্ধে লেখেন, তখন তার অভিপ্রায় কি?"

ম—গুরু কে? সাধক কে?

ভ—আত্মা।

ম—আত্মা গুরু আর আত্মাই যদি সাধক হয়, তবে আর প্রশ্ন ওঠে কি করে?

ভ—সেটাই তো আমার সমস্যা। আমাকে অন্তরে আত্মাকে খুঁজতে হবে। উপরিউক্ত বাক্যের আর প্রয়োজন কি? এটা বিরুদ্ধ মনে হয়।

ম—তা নয়। কথাটা ঠিকমত বোঝা হয় নি।

যদি সাধক গুরুকেই আত্মা বলে জানে তবে আর অন্য কোথাও দ্বৈতভাব জাগে না অতএব সে আনন্দে থাকে; সেখানে তার আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

কিন্তু সাধক বাক্যের সত্যকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে না। এটা তার অজ্ঞানের জন্য হয়। কিন্তু অজ্ঞানটা মিথ্যা। সাধকের অজ্ঞান ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য গুরুর প্রয়োজন হয়, সেজন্য তিনি সত্যকে অন্যের কাছে স্পষ্ট করার জন্য এই কথাগুলো ব্যবহার করেন।

একমাত্র তত্ত্ব এই যে তুমি আত্মদর্শন কর। এটা তুমি যেখানেই থাকো, করা যায়। আত্মাকে অন্তরে খুঁজতে হবে। অনুসন্ধান দৃঢ়ভাবে হওয়া চাই। যদি সেটা হয় তবে গুরুর সমীপে সাক্ষাৎভাবে থাকার দরকার নেই।

লোকে যেখানে আছে সেখানে থেকে আত্মা লাভ করতে পারে না বলেই তাদের ঐরূপ 'বাক্য' বলা হয়।

শ্রীওয়ার্ড জ্যাকসন—ভদ্রমহিলার অসুবিধাটা সত্য, আমি

তার প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি। সে বলছে, "আমরা যদি আমাদের আত্মাকে নিজেরাই দেখতে পেতাম তবে এত দূর থেকে তাঁকে দেখার জন্য আসব কেন? আমরা তাঁর কথা এতদিন ধরে চিন্তা করেছি, তাই আমাদের এখানে আসাটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তবে কি এটা করা নিরর্থক হয়েছে।

ম—তোমরা এসে ভালই করেছো। 'ঈশ্বরোগুরুরাত্মেতি' (আত্মাই ঈশ্বর ও গুরু)। একজন লোক আনন্দ চায় আর শোনে যে একমাত্র ঈশ্বর তাকে আনন্দ দিতে পারেন। সে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে আর তাঁর উপাসনা করে। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শোনেন আর ভক্তের ভাষায় কথা ব'লে তাকে সত্যের উপদেশ দেওয়ার জন্য মানুষের রূপ ধারণ ক'রে তার কাছে প্রকট হয়ে তার প্রার্থনা পূরণ করেন। গুরু এরূপে মানবরূপে অবতরিত ঈশ্বর। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যাতে সাধক তা লাভ করতে পারে। তাঁর অভিজ্ঞতা, আত্মারূপে স্থিতি। আত্মা অন্তরে। অতএব ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। তোমার বই পড়ে সংশয় হয়েছে। তুমি সেগুলো মেটাবার জন্য এসেছ। এটা করা ঠিকই হয়েছে।

শ্রীমতী এইচ. আর—আমি বুঝেছি যে আত্মাই গুরু আর তাঁকে অন্তরে খুঁজতে হবে। সুতরাং আমি যেখানে থাকি এটা করতে পারি।

ম—জানাটা সিদ্ধান্তগত হয়েছে। একে বাস্তবে পরিণত করতে গেলে অসুবিধা ও সংশয় জাগে। তুমি যেখানে আছ সেখানে যদি গুরুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারো তবেই তোমার সংশয়গুলো সহজে মেটে কারণ সাধকের সংশয় মেটানোই গুরুর ভূমিকা।

যদি এরপর আর সংশয় না ওঠে আর যদি তুমি আত্মানুসন্ধানে নিজেকে দৃঢ়ভাবে লাগিয়ে রাখতে পারো তবেই তোমার এখানে আসা সার্থক হয়।

ভ—এবার আমি সব বুঝেছি।

ম—ভাল আপত্তিটা তোমার সিদ্ধান্তের ওপর নয়, সংশয়ের ওপর।

শ্রীডবলিউ. জে—আমরা যা কিছু পড়ি সেটা বুদ্ধিগত। কিন্তু সবই দুরধিগম্য মনে হয়। যখন আপনাকে সাক্ষাতে দেখি তখন আমরা সত্যের সমীপে উপস্থিত হই আর এটা আমাদের জানাকে বাস্তবে পরিণত করতে উৎসাহিত করে।

পশ্চিমদেশে কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভ করে ও তার আচরণ করে, তাকে উন্মাদাশ্রমে বন্ধ করবে। (হাস্য)

ম—তুমি নিজেকেই বন্ধ করবে। যেহেতু জগতটা বিক্ষিপ্ত সেজন্য তোমাকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করে। আপন অন্তর ছাড়া উন্মাদাশ্রম আর কোথায়? তুমি তাতে থাকবে না কিন্তু সেটা তোমাতে থাকবে। (হাস্য)

আত্মজ্ঞান না হওয়া অবধি এই অনিশ্চয়তা, সংশয় ও ভয় সবার পক্ষে স্বাভাবিক। সেগুলো অহংকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বস্তুতঃ তারাই অহংকার।

ভ—সেগুলো যাবে কি করে?

ম—তারাই অহংকার। অহংকার গেলে এরাও তার সঙ্গে যাবে। অহংকারটা নিজেই অসৎ। অহংকারটা কি? খোঁজো। শরীরটা জড়, সে 'আমি' বলতে পারে না। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, অদ্বৈত। সেও 'আমি' বলে না। কেউ সুষুপ্তিতে 'আমি' বলে না। তবে অহংকারটা কি? এটা জড় শরীর ও আত্মার অন্তর্বর্তী একটা কিছু। এর দাঁড়াবার কোন স্থান নেই। যদি একে খোঁজা যায় এটা ভূতের মত পালিয়ে যায়। দেখ, একজন অন্ধকারে মনে করে তার পাশে কিছু আছে হয়ত কোন কালো রঙ-এর একটা বস্তু। সে যদি ভাল করে দেখে তবে ভূতটাকে আর দেখা যায় না, কিন্তু সেটা কালো রঙ-এর একটা কিছু যেটাকে সে একটা গাছ বা থাম বলে চিনতে পারে। যদি ভালভাবে না দেখে তবে ভূতের ভয় ধরে যায়। যা করতে হবে

সেটা হল ভাল করে দেখা তবেই ভূতটা পালাবে। ভূত কোন সময়ে ছিল না। অহংকার সম্বন্ধেও তাই। এটা শরীর ও বিশুদ্ধ চেতনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সংযোজক। এটা সত্য নয়। যতক্ষণ লোকে একে ভাল করে না দেখে ততক্ষণ এটা কষ্ট দেয়। কিন্তু যখন লোকে খুঁজতে যায় তখন দেখা যায় যে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

আবার, হিন্দু বিবাহ উৎসবে ভোজটা চারপাঁচ দিন চলে। একজন অপরিচিত লোককে কন্যাপক্ষের লোকেরা বরযাত্রী বলে ভুল ক'রে বিশেষ খাতির-যত্ন করলে। তার কন্যাপক্ষের খাতির-যত্ন দেখে বরযাত্রীরা ভাবলে যে ইনি হয়ত কন্যাপক্ষের কেউ বিশেষ ব্যক্তি সুতরাং তারাও বিশেষ সম্মান করলে। অপরিচিত লোকটি বেশ আনন্দে রইল। সে কিন্তু বরাবর নিজের অবস্থাটা জানে। একবার বরযাত্রীরা তাকে কোন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সে বিপদের গন্ধ পেয়ে বিদায় নিলে। অহংকারের এই দশা। যদি খোঁজা যায়, সে পালায়। তা যদি না হয় এ ভোগায়।

কি করে একে খোঁজা যায় সেটা যারা আগেই এটা করেছে তাদের কাছে জানা যায়। এজন্যই গুরুর সমীপে উপস্থিত হতে হয়।

ভ—যদি অনুসন্ধানটা অন্তরেই করতে হয় তবে গুরুর সাক্ষাৎ সমীপে থাকার কি প্রয়োজন ?

ম—সমস্ত সংশয় নিরসন না হওয়া অবধি এর প্রয়োজন আছে।

ভ—যদি অহংকার অসৎ ও ক্লেশকর তবে আমরা একে বিকাশ করার জন্য কষ্ট স্বীকার করি কেন ?

ম—এর বৃদ্ধি জনিত ক্লেশের জন্যই তোমায় এর কারণ খোঁজার প্রেরণা দেয়। এর বিকাশই এর ধ্বংসের কারণ।

ভ—বলা হয় না কি যে একজনকে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে শিশুর মত হতে হবে ?

ম—হ্যাঁ, কারণ শিশুর অহংকার বিকশিত হয় নি।

ভ—আমিও সেই কথা বলতে চাই। আমরা অহংকারকে বিকশিত না করে শিশুর মত থাকতে পারতাম।

ম—শিশুর ভাব বলাই অভিপ্রায়। কেউ শিশুর কাছে আত্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করতে পারে না। গুরুর ভাব যেন শিশুর মত। দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। শিশুর অহংকার সুপ্ত অপরপক্ষে জ্ঞানীর অহংকার বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভ—হ্যাঁ, ঠিক, এখন বুঝেছি।

ম—সত্যই একমাত্র আছে ও শাশ্বত। এটা বুঝলেই যথেষ্ট। কিন্তু পূর্বের অজ্ঞান যেন না ফিরে আসে। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে বর্তমান জ্ঞান পরে নষ্ট না হয়।

একজন শিষ্য তার গুরুকে দীর্ঘদিন সেবা করে আত্মজ্ঞান লাভ করলে। সে আনন্দময় হল আর গুরুকে দক্ষিণা দিতে চাইলে। সে আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হয়ে গদগদ কণ্ঠে বললে, "কি আশ্চর্য, আমি আমার আত্মাকে এত বছর জানি নি? আমি কত কষ্ট পেয়েছি আর আপনি কৃপা করে আমার আত্মজ্ঞান দান করলেন। আপনার ঋণ আমি কিরূপে শোধ করব? এটা আমার সাধ্যাতীত!" গুরু বললেন, "বেশ, বেশ। তোমার দক্ষিণা আবার অজ্ঞানাচ্ছন্ন না হওয়া ও নিজের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা।"

[সংগ্রহীতার মন্তব্য—

আত্মাই গুরু আর সব কিছু। আত্মজ্ঞানের অর্থ আত্মসমর্পণ বা গুরুতে লীন হওয়া। এর বেশী একজন আর কি করতে পারে? সেটাই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ।]

২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬১৩। একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে—"চিন্তাগুলো কি জড় পদার্থ?"

ম—তার অর্থ কি? জড় বলতে কি যা চারিপাশে দেখ্‌ছ তাই বোঝ?

ভ—হ্যাঁ—স্থূল।

ম—এই প্রশ্ন কে করছে? চিন্তক কে?

ভ—চিন্তক জীবাত্মা।

ম—তবে কি বলতে চাও যে জীবাত্মা থেকে জড় সৃষ্টি হয়?

ভ—আমি জানতে চাই।

ম—তুমি জড় ও জীবাত্মার মধ্যে কি করে পার্থক্য কর?

ভ—জীবাত্মা সচেতন আর অন্যটা তা নয়।

ম—সচেতন কি অচেতন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে কিংবা আলো কি অন্ধকার সৃষ্টি করে?

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬১৪। ঘরে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁদের আসার কিছুক্ষণ পরে শ্রীভগবান তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। অতীত স্মরণ করা ও ভবিষ্যৎ জানায় কি লাভ? যেটা জানা দরকার সেটা কেবল বর্তমান। এটার ব্যবস্থা কর তাহলে অন্যগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভ—কোন কিছু চাওয়া কি অন্যায়?

একজন কামনাপূর্তিতে আহ্লাদিত ও বিফলতায় হতাশ না হলেই হল। কামনার পূর্ণতায় আনন্দিত হওয়া বড়ই ছলনাময়। একটা পাওয়া নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে হারিয়ে যায়। সুতরাং আহ্লাদ ভবিষ্যতে দুঃখে পরিণত হবে। একজনের সুখ ও দুঃখ যাই

আসুক তাতে বিহ্বল না হলেই হল। ঘটনাতে মানুষের কি এসে যায়? কিছু পেলে তোমার বৃদ্ধি হয় না, কিছু গেলেও তুমি হ্রাস পাও না। তুমি যা আছ তাই থাকো।

ভ—আমরা সাংসারিক লোকেরা কামনা দমন করতে পারি না।

ম—কামনা করতে পারো কিন্তু যাই হোক না কেন তার জন্য প্রস্তুত থাকো। চেষ্টা কর কিন্তু ফলে মেতে যেও না। যাই হোক সমতার সঙ্গে গ্রহণ কর। কারণ সুখ ও দুঃখ মনের বৃত্তি। বাস্তব সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

ভ—কিরূপে।

দক্ষিণ ভারতের একটা গ্রামে দু'জন যুবক বন্ধু ছিল। তারা বিদ্বান ছিল আর অর্থোপার্জন করে নিজেদের সংসারকে সাহায্য করার ইচ্ছা করলে। তারা বাবা-মার কাছে বিদায় নিয়ে বারাণসী তীর্থ যাত্রা করলে। পথে একজন মারা গেল। অন্যজন রইল। সে কিছুদিন ঘুরে বেড়ালে আর অল্পদিনের মধ্যে বেশ নাম ও অর্থ উপার্জন করলে। সে বাড়ী ফিরে যাওয়ার পূর্বে আরও কিছু অর্থোপার্জন করার ইচ্ছা করলে। ইতিমধ্যে একজন যাত্রীর সঙ্গে তার দেখা হল যে তার গ্রাম হয়ে দক্ষিণে যাচ্ছিল। সে সেই নব পরিচিত লোকটিকে বললে যে সে যেন তার বাবা-মাকে বলে যে, সে কয়েক মাসের মধ্যে কিছু টাকা নিয়ে দেশে ফিরবে আর তার সঙ্গীটি মারা গেছে। লোকটি গ্রামে এল আর তার বাবা-মাকে খুঁজে বার করলে। সে তাদের খবরটাও দিলে কিন্তু নাম দু'টি অদল-বদল করে ফেললে। তার ফলে জীবিত লোকটির পিতামাতা তাদের ছেলে মৃত মনে করে শোকাহত হল আর মৃত ব্যক্তির পিতামাতা তাদের ছেলে জীবিত আছে আর টাকা-পয়সা আনবে ভেবে আনন্দিত হল।

তবেই দেখছ সুখ ও দুঃখ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়, কেবল মনের বৃত্তি।

৬১৫। সেই দলের আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—অহংকার কি করে নষ্ট হয়?

ম—অহংকারকে আগে ধরো তারপর কি করে নাশ করা যায় জিজ্ঞাসা কর। কে এই প্রশ্ন করছে? অহংকারই করছে। অহংকার কি কখন নিজেকে নাশ করতে রাজী হতে পারে? এই প্রশ্নটা তাকে আরও বাড়িয়ে দেবে, নাশ করবে না। যদি অহংকারকে খোঁজো তবে দেখবে তার অস্তিত্ব নেই। এটাই তার নাশ হওয়ার উপায়।

এই প্রসঙ্গে প্রায়ই আমার একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সেটা যখন আমি মাদুরায়ে পশ্চিম চিত্রাই স্ট্রীটে থাকতাম তখন হয়েছিল। পাশের বাড়ীর একজন প্রতিবেশী তার বাড়ীতে চোর আসবে আন্দাজ করলে। সে তাকে ধরার ব্যবস্থা করলে। রাস্তার দু'মুখে ও বাড়ীর সামনে-পিছনের দরজায় সাদা পোষাক পরা পুলিস রাখলে। যেমন আন্দাজ করা গিয়েছিল, চোর এল আর লোকেরাও তাকে ধরার জন্য ছুটলো। সে চট্ করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে, "ধর, ধর। ঐ পালাচ্ছে—ঐ যে—ঐ যে" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চম্পট দিলে।

অহংকার সম্বন্ধেও সেরূপ। একে খুঁজলেই আর পাওয়া যাবে না। এটা ত্যাগ করার একটাই উপায়।

২৩শে থেকে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৯

৬১৬। ভ—জীবনাড়ী কি সত্যই আছে কিংবা এটা একটা কল্পনা?

ম—যোগীরা বলে যে জীবনাড়ী, আত্মানাড়ী বা পরানাড়ী নামে একটা নাড়ী আছে। উপনিষদ একটা কেন্দ্রের কথা বলে যেখান থেকে হাজার হাজার নাড়ী উৎপন্ন হয়। কেউ মস্তিষ্ক আর অন্যেরা অন্য চক্রে এরূপ কেন্দ্র আছে বলে। গর্ভোপনিষদে মাতৃগর্ভে

ভ্রূণের সংস্থান ও তার বৃদ্ধির ক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয় যে সপ্তম মাসে জীব ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ভ্রূণের শরীরে প্রবেশ করে। তার প্রমাণসরূপ বলা হয় যে শিশুর ব্রহ্মরন্ধ্র কোমল থাকে ও স্পন্দিত হতে দেখা যায়। এটি অস্থিযুক্ত হতে আরও কয়েক মাস লাগে। এরূপে জীব ওপর থেকে আসে, ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে আর সমস্ত শরীর বিস্তৃত সহস্র নাড়ীর দ্বারা কাজ করে। অতএব সাধক তার মূলে পৌঁছাবার জন্য সহস্রারে অর্থাৎ মস্তিষ্কে মন একাগ্র করবে। বলা হয় প্রাণায়াম যোগীর কুণ্ডলিনী শক্তি যা মণিপুর চক্রে (নাভিতে) কুণ্ডলিত হয়ে আছে তাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ও মস্তিষ্ক অবধি বিস্তৃত একটি সুষুম্না নামে নাড়ীর মধ্য দিয়ে শক্তি জাগ্রত হয়।

সহস্রারে মন স্থির করলে সমাধির আনন্দ নিশ্চয় লাভ করা যায়। তবুও বাসনা বা সুপ্ত সংস্কার ক্ষয় হয় না। অতএব যোগীকে সমাধি থেকে উত্থিত হতে হয় কারণ তার তখনও বন্ধনের মুক্তি হয়নি। তাকে এরপরেও বাসনা ক্ষয়ের প্রচেষ্টা করতে হয় যাতে সংস্কারগুলো সমাধির আনন্দ আর না ভঙ্গ করে। সুতরাং সে সহস্রার থেকে জীবনাড়ী পথে হৃদয়ে নেমে আসে ; এটা সুষুম্নারই একটা অংশ। এরূপে সুষুম্না একটি বক্র রেখা। এটা মণিপুর চক্র হতে শুরু হয়ে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে যায় আর সেখান থেকে বেঁকে নীচে হৃদয়ে সমাপ্ত হয়। যোগী যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন সমাধি স্থায়ী হয়। এরূপে আমরা দেখছি যে হৃদয়ই অন্তিম কেন্দ্র।

কোন কোন উপনিষদ একশত এক নাড়ীর কথা বলে যা হৃদয় থেকে প্রসারিত হয়, তার মধ্যে একটা প্রধান নাড়ী আছে। যদি জীব ওপর থেকে আসে আর মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়, যা যোগীরা দাবী করে, তবে প্রতিফলনের জন্য কোন একটা স্থান আছে। আর সেটাই অসীম চৈতন্যকে দেহরূপ সসীমতায় পর্যবসিত করার ক্ষমতা ধরে। এক কথায় বিরাট সত্তা সীমিত জীব হয়। ব্যক্তির বাসনাসমূহই এরূপ

প্রতিফলনের মাধ্যম হয়। এটা যেন পাত্রস্থিত জলের মত যাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। যদি পাত্রটা জলশূন্য করা যায় তবে কোন প্রতিবিম্ব নেই। বস্তু প্রতিবিম্বিত না হয়েই থাকে। এখানে বস্তুটি সার্বিক সৎ-চিৎ যা সর্বব্যাপী, অতএব সর্বান্তর্গত। একে আর প্রতিবিম্বরূপে দেখার দরকার নেই ; এটা তখন স্বপ্রকাশ। অতএব সাধকের লক্ষ্য হৃদয় থেকে বাসনা দূর করা যার ফলে শাশ্বত চৈতন্যের জ্যোতি আর কোন মাধ্যমের বাধা না পায়। অহংকারের মূল অনুসন্ধান ক'রে আর হৃদয়ে নিমজ্জিত হয়েই এটা করা হয়। এটাই আত্মোপলব্ধির প্রত্যক্ষ (সোজা) পথ। যারা এই পথ গ্রহণ করে তাদের নাড়ী, মস্তিষ্ক, সুষুম্না, পরানাড়ী, কুণ্ডলিনী, প্রাণায়াম বা ষট্‌চক্র সম্বন্ধে ভাবতে হয় না।

আত্মা অন্য কোথাও থেকে আসে না আর মাথার মধ্যবিন্দু দিয়ে শরীরে প্রবেশও করে না। এটা যা আছে তাই, নিত্যজ্যোতি, নিত্যস্থির, নিশ্চল, নির্বিকার। পরিবর্তন যা দেখা যায় তা আত্মার নয়, সে হৃদয়ে থাকে ও সূর্যের মত স্বভাস্বর। পরিবর্তন যা দেখা যায় সেটা তার জ্যোতির। আত্মার শরীর বা মনের সঙ্গে সম্বন্ধকে একটা নির্মল স্ফটিক ও তার পটভূমির সঙ্গে তুলনা করা হয়। স্ফটিক যদি লাল ফুলের সামনে রাখা হয় সেটা লাল দেখায়, যদি একটা সবুজ পাতার সামনে রাখা হয় সেটা সবুজ দেখায় ইত্যাদি। একজন নিজেকে পরিবর্তনশীল শরীর বা মনে সীমিত করে। এই শরীর ও মন সেই অপরিবর্তনীয় আত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। একমাত্র যা করণীয় সেটা এই ভুল নির্ধারণ ত্যাগ করা। সেটা হলেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে এক অদ্বিতীয় সত্য বলে দেখা যাবে।

বলা হয় চৈতন্যের প্রতিফলন সূক্ষ্ম শরীরে হয়, সেটা মস্তিষ্ক ও তা থেকে বিস্তৃত বিশেষরূপে মেরুদণ্ড ও নাভিচক্র হতে উৎপন্ন সমস্ত শরীর ব্যাপী নাড়ীসমূহ দ্বারা গঠিত।

যখন আমি পাহাড়ে ছিলাম, নয়না (কাব্যকণ্ঠ গণপতি

মুনি) একবার তর্ক করেছিল যে মস্তিষ্কই বাসনার স্থান কারণ মস্তিষ্কে অনেক কোষ আছে, তাতেই বাসনাগুলো সঞ্চিত থাকে আর তা হৃদয়স্থিত আত্মার প্রক্ষিপ্ত জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় যার ফলে মানুষ কাজ বা চিন্তা করে।

কিন্তু আমি বললাম, "তা কি করে হয়? বাসনা একজনের আত্মারই সঙ্গে থাকে আর সেগুলো আত্মা থেকে দূরে নয়। যদি তোমার কথন অনুসারে এটা মস্তিষ্ক হয় আর আত্মার স্থান হৃদয়ে হয় তবে যার শিরশ্ছেদ করা হয় তার সব বাসনা ত্যাগ হয়ে যাওয়ার কথা আর পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা। তুমি স্বীকার করবে যে এটা অসম্ভব। এখন তুমি কি বলবে যে আত্মা ও বাসনা মস্তিষ্কে থাকে? তা যদি হয় তবে একজন ঘুমালে তার মাথা নুয়ে পড়ে কেন? উপরন্তু একজন মাথায় হাত দিয়ে 'আমি' বলে না। অতএব এ থেকে প্রমাণ হয় যে আত্মা হৃদয়ে থাকে আর বাসনাগুলোও অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় সেখানেই থাকে।

"যখন বাসনাগুলো হৃদয় থেকে অভিক্ষিপ্ত হয় তখন তাদের সঙ্গে আত্মার জ্যোতিও সংযুক্ত থাকে আর তখন বলা হয় লোকটি ভাবছে। যে বাসনাগুলো অণুপরিমাণে সুপ্ত থাকে তারাই হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে যাওয়ার পথে আকারে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্ক যেন একটা পর্দা যেখানে বাসনার ছবিগুলো প্রক্ষিপ্ত হয়। আর এটা তাদের বৃত্তিরূপে বিস্তৃত হওয়ার কেন্দ্রও বটে। মস্তিষ্ক মনের স্থান আর মন তারই মাধ্যমে কাজ করে।"

সুতরাং ঘটনাক্রম এই যে, যখন একটা বাসনা মুক্ত হয়ে সক্রিয় হয় তখন তার সঙ্গে আত্মজ্যোতির সম্বন্ধ হয়। এটা হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে যায়, পথে তার আকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সেটা একলাই সমস্ত ক্ষেত্রটা ছেয়ে ফেলে আর অন্যান্য বাসনাগুলো তৎকালে স্তিমিত হয়ে যায়। যখন চিন্তা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় সেটা পর্দার ওপর একটা প্রতিচ্ছায়ার মত প্রকাশিত হয়। তখন বলা হয় যে

মানুষের সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হল। সে একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল বা আবিষ্কারক হয়। মৌলিক বলে বহু প্রশংসিত চিন্তা বা বস্তু বা দেশ যা নূতন আবিষ্কার করা হল বলা হয় সেগুলো কোনটাই মৌলিক বা নূতন নয়। সেটা যদি পূর্বেই মনে না থাকত তবে প্রকাশ হতে পারত না। সেটা অবশ্য অতি সূক্ষ্মাকারে ছিল বলেই অনুভূতি-গোচর হয়নি কারণ অন্যান্য প্রবল ও অদম্য বাসনা তাকে অবদমন করে রেখে ছিল। সেগুলো ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় এই বাসনার উদয় হল আর একাগ্রতার দ্বারা আত্মার জ্যোতি একে সুস্পষ্ট করলে, সুতরাং এটি মহান, মৌলিক ও ক্রান্তিকারীরূপে বিবেচিত হল। বস্তুতঃ এটা সর্বদাই অন্তরে বিদ্যমান ছিল।

এই একাগ্রতাকে যোগশাস্ত্রে 'সংযমন' বলে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোকে কামনা পূর্ণ করে আর একে একটা সিদ্ধি বলে। এইভাবে তথাকথিত নূতন আবিষ্কারগুলো করা হয়। এমনকি এভাবে নূতন জগতও সৃষ্টি করা যেতে পারে। সংযমন থেকেই অন্যান্য সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু অহংকার না যাওয়া অবধি সেগুলো প্রকাশ পায় না। যোগশাস্ত্রানুসারে একাগ্রতার শেষ পরিণাম অনুভাবক (অহংকার), অনুভূতি ও জগতের লয় সাধন আর তারপর কালে প্রাক্তন বাসনাগুলোও পূর্ণ হয়ে যায়। এই একাগ্রতা একজনকে এমন কি নূতন জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও দেয়। যোগবাশিষ্ঠে 'ঐন্দব উপাখ্যানে' ও ত্রিপুরা রহস্যের 'গণ্ডশৈল লোকে' এর উদাহরণ আছে।

যারা এই শক্তি লাভ করে নি তাদের কাছে এগুলো চমৎকার মনে হলেও এরা ক্ষণস্থায়ী। যা ক্ষণস্থায়ী তার আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা। সকল চমৎকারিত্ব একমাত্র অপরিবর্তনীয় আত্মাতেই রয়েছে। এরূপে জগতটা অন্তরে, বাহিরে নয়। 'শ্রীরমণ গীতার' পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ ও ১২ শ্লোকে এটা বলা হয়েছে। "সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জীভূত হয়ে শরীরে আর সমস্ত শরীর হৃদয়ে। এরূপে হৃদয়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র।" অতএব সংযমনের অন্তর্গত বিভিন্ন সিদ্ধির জন্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

একাগ্রতার বিধান আছে। বিশ্ব বা বিরাটও বলা হয় ব্রহ্মাণ্ডকে দেহের সীমার মধ্যে সীমিত করেছে। আবার "জগৎ মন ছাড়া কিছু নয় আর মনও হৃদয়ের অতিরিক্ত কিছু নয়, এটাই সমগ্র সত্য।" সুতরাং হৃদয়ে সবকিছু সমাহিত আছে। এটাই শ্বেতকেতুকে বটবীজের উদাহরণ দিয়ে শেখানো হয়েছিল। উৎসটা একটা পরিমাপ বিহীন বিন্দু। এটা একদিকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে আর অন্যদিকে অসীম আনন্দরূপে প্রসারিত। সেই বিন্দুই ধুরী (পিভট্)। এর থেকে একটিমাত্র বাসনা উদয় হয়ে, বিভাজিত হয়ে, অনুভাবক 'আমি', অনুভূতি ও জগতরূপে পরিণত হয়। অনুভাবক ও তার উৎসকে মন্ত্রে 'একই প্রকার দু'টি পাখী এক সঙ্গে ওঠে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি যখন স্কন্দাশ্রমে ছিলাম তখন কখন কখন বাইরে পাথরের ওপর বসতাম। একবার এরূপ অবসরে আমার সঙ্গে রঙ্গনাথ আইয়ার সমেত আর দু'তিনজন ছিল। হঠাৎ আমরা দেখলাম যে একটা পাথরের ফাটল থেকে ছোট রাত্রিচর প্রজাপতির মত অজস্র কীট সোজা হাউই-এর মত ওপরে উঠছে। চক্ষের নিমিষে লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি একটা মেঘের মত আকাশ ছেয়ে ফেললে। আমরা অবাক হয়ে যে জায়গা থেকে উঠছিল সেটা দেখলাম। দেখলাম সেটা একটা ছুঁচের মত ছোট গর্ত আর সেখান থেকে এত পোকা কিছুতেই এত অল্প সময়ের মধ্যে উঠতে পারে না।

এই রকম ভাবেই অহংকার একটা রকেটের মত উৎক্ষিপ্ত হয় আর নিমিষের মধ্যে জগতরূপে বিস্তৃত হয়।

অতএব হৃদয়ই কেন্দ্র। একজন কখনই এর থেকে দূরে যেতে পারে না। যদি যায় তবে তাকে মৃত মনে করতে হবে। যদিও উপনিষদ বলে যে জীব বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন চক্রে সক্রিয় হয়, তথাপি সে হৃদয় ত্যাগ করতে পারে না। চক্রগুলো কেবলমাত্র কর্মস্থান (বিবেক চূড়ামণি দ্রঃ)। একটি গরু যেরূপ খোঁটায় বাঁধা

থাকে সেরূপ আত্মাও হৃদয়ে বাঁধা থাকে। তার বিচলন দড়ির দীর্ঘতার ওপর নির্ভর করে। তার সকল সঞ্চলন ঐ খোঁটাকে কেন্দ্র করে।

একটি শুঁয়াপোকা একটি ঘাসের ওপর চলছে, যখন সে পাতার প্রান্তভাগে এসে যায় সে আর একটা কিছু ধরতে চায়। এটা করার সময়ে সে তার পিছনের পা দিয়ে ঘাসটা ধ'রে সমস্ত শরীরটা উঠিয়ে যতক্ষণ না আর একটা ঘাস ধরতে পারে ততক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরায়। আত্মার পক্ষেও তাই। সে হৃদয়ে থাকে আর অবস্থা বিশেষে অন্যান্য চক্রকে ধরে। কিন্তু তার সমগ্র ক্রিয়াপরতা সর্বদাই হৃদয়কে ঘিরে।

৬১৭। ব্যক্তির পক্ষে পাঁচটি অবস্থা। সেগুলা (১) জাগ্রতি, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি, (৪) তুরীয়, (৫) তুরীয়াতীত। তার মধ্যে জাগ্রতি জাগরূক অবস্থা।

জাগ্রতিতে জীব বিশ্বরূপে ও পরমেশ্বর বিরাটরূপে একসঙ্গে হৃদয় পদ্মের অষ্টদলে (পাপড়িতে) বিরাজ করে, চক্ষু দ্বারা ক্রিয়া করে আর ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন বস্তু হতে নব নব আনন্দ উপভোগ করে। সর্ব্বব্যাপী পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, চার অন্তঃকরণ, চব্বিশ তত্ত্ব দ্বারা স্থূল শরীর গঠিত হয়। জাগ্রত অবস্থা সত্ত্বগুণাত্মক, 'অ' অক্ষর দ্বারা নির্দেশিত হয়, অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু। স্বপ্নাবস্থায় জীব তৈজসরূপে ও পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপে একসঙ্গে হৃদ্‌পদ্মের কর্ণিকায় বিরাজ করে, কণ্ঠে ক্রিয়া করে আর জাগ্রত অবস্থায় অনুভূত বিষয়-সমষ্টিকে মনের দ্বারা উপভোগ করে। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও চিত্ত এই সতেরটি তত্ত্ব নিয়ে স্বপ্নের সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়, এটি রজোগুণসম্পন্ন, 'উ' অক্ষর প্রতীক আর দেবতা ব্রহ্মা—বিদ্বানেরা এরূপ বলেন।

সুষুপ্তি গভীর ঘুমের অবস্থা এখানে জীব প্রাজ্ঞরূপে আর পরমেশ্বর ঈশ্বররূপে একসঙ্গে হৃদ্‌পদ্মের কেশরে বিরাজ করে, সূক্ষ্ম

অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। যেমন একটি কুক্কটী সারাদিন চরে বেড়াবার পর সন্ধ্যাকালে শাবকদের নিজের কাছে ডাকে ও তাদের আপন পক্ষাচ্ছাদিত করে রাত্রির মত বিশ্রাম করে সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর সাময়িকভাবে জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা ভোগ ক'রে সেই অবস্থা-গুলোর অনুভূতি সংগ্রহ ক'রে অবিদ্যাময় কারণিক শরীরে প্রবেশ করে, এটি তমোগুণাত্মক, 'ম' অক্ষর প্রতীক আর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্র।

সুষুপ্তি শুদ্ধ সত্তার অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনটি অবস্থা বিভিন্ন নামে কথিত হয়, যেমন তিনটি লোক, তিনটি দুর্গ, তিনটি দেবতা ইত্যাদি। সত্তা সব সময়ে হৃদয়ে বিরাজ করে সেটা আগেই বলা হয়েছে। যদি জাগ্রত অবস্থায় হৃদয়কে ত্যাগ না করা হয় তবে মনের ক্রিয়া থেমে যায়, একমাত্র ব্রহ্মের ধ্যান হয়, এই অবস্থাকে তুরীয় বলে। আবার যখন ব্যক্তিসত্তা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় তাকে তুরীয়াতীত বলে। উদ্ভিদ্ জগৎ সর্বদা সুষুপ্তিতে থাকে ; প্রাণী জগতের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি উভয়ই আছে ; দেবতারা সদা জাগ্রত ; মানুষের তিনটি অবস্থা ; নির্মল দৃষ্টিসম্পন্ন যোগী কেবল তুরীয় অবস্থায় থাকে আর শ্রেষ্ঠ যোগী একমাত্র তুরীয়াতীত অবস্থায় থাকেন।

সাধারণ মানুষের তিনটি অবস্থা পর্যায়ক্রমে অনৈচ্ছিক ভাবে আসা যাওয়া করে। শেষের দু'টি (তুরীয় ও তুরীয়াতীত) কিন্তু সাধনার সুপরিণাম আর প্রত্যক্ষ মোক্ষসাধক। অন্য তিনটি অবস্থা (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) প্রত্যেকটি অন্য দু'টি অবস্থারহিত এবং দেশ ও কাল দ্বারা সীমিত। অতএব তারা অসৎ।

আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার অনুভূতি থেকেই প্রমাণ হয় যে আত্মারূপী চৈতন্য পাঁচটি অবস্থার আধার, সতত পূর্ণরূপে থাকে আর তাদের সাক্ষী। কিন্তু যখন সুষুপ্তিগত অনুরূপ চেতনার কথা হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায় যে 'আমি কিছু জানতাম না ; আমি গভীর ঘুমে আনন্দে ছিলাম।' এই বাক্য থেকে দু'টি তথ্য পাওয়া যায় (কোন কিছুর বোধ না থাকা আর গভীর ঘুমের আনন্দে

থাকা)। যদি সুষুপ্তিতে এ দু'টি না থাকত আর অনুভূত না হত তবে একজন জাগ্রত অবস্থায় এটা বলত না। অনুমানের দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত হয়। চোখ যেরূপ সমস্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে থাকা অন্ধকারকে দেখে সেরূপ আত্মা সমস্ত দৃশ্যমান জগতকে পরিব্যাপ্ত করে থাকা অবিদ্যাকেও দেখে।

এই অন্ধকার তখনই অনুভূত হয় যখন বায়ু সঞ্চালিত পত্র-গুচ্ছের অন্তরালে চন্দ্রের কিরণ দেখার মত আত্মা বিন্দু বিন্দু পরমানন্দ-রূপে অনুভূতিগোচর হয় ও একক্ষণের জন্য প্রকাশিত হ'য়ে অতি সূক্ষ্মভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। যাইহোক এই অনুভূতি কিন্তু কোন কিছুর (ইন্দ্রিয় বা মনের) মাধ্যমে হয় না, এটা এই তথ্যই প্রমাণ করে যে সুষুপ্তিতে চেতনা থাকে। বোধ না থাকার কারণ আপেক্ষিক জ্ঞানের অভাব আর আনন্দের হেতু (উত্তাল) চিন্তার অভাব।

যদি সুষুপ্তিতে পরমানন্দের অনুভূতি বাস্তবিক হয় তবে সমগ্র মানবের মধ্যে একজনও কেন সেটা মনে রাখতে পারে না ? একজন ডুবুরি যে জলের তলায় তার অভীষ্ট বস্তু পায় সে জল থেকে না ওঠা পর্যন্ত তীরে অপেক্ষমান উৎসুক দর্শকবৃন্দকে তার আবিষ্কারের কথা বলতে পারে না। অনুরূপভাবে নিদ্রিত ব্যক্তি তার বাসনার দ্বারা সময়ে জাগ্রত না হলে তার অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে পারে না কারণ সে অবস্থায় অভিব্যক্তির মাধ্যমরূপ ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। অতএব এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে আত্মাই সৎ-চিৎ-আনন্দের বোধ।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুভাবককে ক্রমান্বয়ে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। একই ব্যক্তি এগুলোর আধার। অতএব এই অবস্থাগুলো প্রকৃত সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মার স্বরূপ নয়। সুষুপ্তির অনুভূতিকে ব্রহ্মের পরমানন্দ বলা হয়। চিন্তারাহিত্যের ফলে লাভ হওয়ায় এটা সেই আনন্দের কেবল নঞর্থকরূপ। উপরন্তু এটা

ক্ষণস্থায়ী ! এরূপ আনন্দ কেবলমাত্র আভাস, এটা নকল পরমানন্দ। এটা ইন্দ্রিয় সুখজনিত আনন্দানুভূতি হতে পৃথক নয়। সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত বলা হয়। সুতরাং সুষুপ্তিতে ব্যক্তিসত্তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

আত্মাই সকল অনুভূতির আধার। এটা সবকিছুর সাক্ষী ও অধিষ্ঠান। এরূপে এই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা থেকে সত্য পৃথক।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬১৮। হরিদ্বারের একজন ভদ্রলোক—আমি যখন আত্মবিচার ক'রে বুদ্ধির অতীত হয়ে যাই, সেখানে কোন আনন্দবোধ নেই।

ম—বুদ্ধি আত্মার একটা যন্ত্রমাত্র। এটা তোমাকে তার ঊর্ধ্বে কি আছে জানতে সাহায্য করতে পারে না।

ভ—আমি এটা বুঝেছি। কিন্তু বুদ্ধির পরে আনন্দ নেই।

ম—বুদ্ধিটা অজানা জিনিস জানার যন্ত্র মাত্র। যে নিজেই জ্ঞান সেই আত্মা হওয়ায় তুমি কিন্তু নিজের কাছে অজানা নও সুতরাং তুমি একটা জ্ঞাতব্য বিষয় হতে পারো না। বুদ্ধি তোমাকে বাইরের বস্তু দেখায় কিন্তু যা তার মূল তাকে দেখাতে পারে না।

ভ—আবার সেই প্রশ্ন করছি।

ম—এই অবধিই বুদ্ধির উপযোগিতা, এ তোমাকে বিচার করতে সাহায্য করে, তার বেশী নয়। এরপর একে অহংকারে লীন হয়ে যেতে হবে আর অহংকারের মূল খুঁজতে হবে। যদি এটা করা যায় তবে অহংকার অদৃশ্য হয়। সেই উৎস হয়ে থাকো আর তখন অহংকার উঠবে না।

ভ—সে অবস্থায় কোন আনন্দ নেই।

ম—'কোন আনন্দ নেই' এটাও একটা চিন্তা। আত্মা শুদ্ধ,

সহজ ও আনন্দময়। তুমিই আত্মা। সুতরাং তুমি পরমানন্দ ছাড়া আর কিছু নও, তাই হয়ে তুমি বলতে পারো না যে আনন্দ নেই। এটা অনাত্মা আর যাতে আত্মার পরমানন্দ অনুভূত হয় সেজন্য এটাকে দূর করতে হবে।

ভ—কি করে করা যাবে?

ম—দেখো কোথা থেকে চিন্তার উদয় হয়। এটা মন। দেখ কার জন্য মন ও বুদ্ধি ক্রিয়া করে। অহংকারের জন্য। বুদ্ধিকে অহংকারে লয় কর আর অহংকারের মূল খোঁজো। অহংকার অদৃশ্য হবে। 'আমি জানি' ও 'আমি জানি না' বাক্যে বিষয় ও বিষয়ী সূচিত হয়। এগুলো দ্বৈতবোধের জন্য হয়। আত্মা শুদ্ধ ও পূর্ণ, এক ও অদ্বিতীয়। দু'টি আত্মা নেই যে একজন অন্যকে জানবে। সেখানে দ্বৈতবোধ কোথায়? এটা যা এক ও অদ্বিতীয় সেই আত্মা হতে পারে না। এটা তবে অনাত্মা। দ্বৈতবোধ অহংকারের বিশেষত্ব। যখন অহংকারের উদয় হয় তখন দ্বৈতবোধ আছে; একে অহংকার বলে জানো আর তার মূল খোঁজো।

চিন্তারাহিত্যের মাত্রাই তোমার আত্মোপলব্ধির পথে উন্নতির পরিমাপ। কিন্তু আত্মোপলব্ধিতে কোন উন্নতি বলে কিছু নেই। এটা সর্বদাই এক। আত্মা সর্বদাই অনুভূত বস্তু। বাধা চিন্তাগুলো। আত্মা সর্বদাই অনুভূত, এই জ্ঞানের বাধা অপসরণের মাত্রার দ্বারা উন্নতির মাত্রা নিরূপিত হয়। সুতরাং চিন্তাগুলো কার উঠছে অনুসন্ধানের দ্বারা তাদের নিরুদ্ধ করা দরকার। অতএব তুমি তার মূলে যাও, সেখানে তারা আর উঠবে না।

ভ—সংশয় সর্বদাই উঠছে। সেজন্যই আমার প্রশ্ন।

ম—একটা সংশয় উঠছে সেটা নিরাকৃত হল; আর একটা উঠছে সেটা নিবারিত হল, অন্য একটা ওঠার উপক্রম হল; আর এরূপে চলতে থাকে। সুতরাং সমস্ত সংশয় দূর করার সম্ভাবনা নেই। দেখ সংশয়টা 'কার' উঠছে। তাদের মূলে যাও আর সেখানে থাকো।

তবেই তারা আর উঠতে পারবে না। এইভাবেই সংশয় দূর হয়। "আত্মসংস্থম্ মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"।

ভ—একমাত্র কৃপাই আমায় সাহায্য করতে পারে।

ম—কৃপা বাইরে নয়। বস্তুতঃ তোমার কৃপার আকাঙ্ক্ষাও তোমার অন্তরস্থিত কৃপার জন্যই হয়।

৬১৯। একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক 'বিবেক-চূড়ামণি'র একটি শ্লোক পড়লে যাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের অনুরূপ ভাবনা আছে, আর সেখানে উক্ত 'আত্মা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে।

ম—আত্মাই।

ভ—প্রেম কি অন্য বস্তুর প্রতি হয় না?

ম—'সুখ প্রেমই' (আনন্দের আকাঙ্ক্ষাই) আত্মার নিত্য-সিদ্ধ আনন্দের প্রমাণ। নতুবা তার জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা কি করে হয়? যদি মাথা ধরাটাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা হত তবে সেটা দূর করার কেউ চেষ্টা করত না। কিন্তু যারই মাথা ধরে সে সেটা দূর করার চেষ্টা করে কারণ সে একটা সময়ের কথা জানে যখন তার মাথা ধরা ছিল না। সে তার পক্ষে যা স্বাভাবিক কেবল তারই আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং সেও আনন্দ কামনা করে কারণ আনন্দ তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিকের অর্থ সেটা চেষ্টালব্ধ নয়। মানুষের চেষ্টা কেবল দুঃখ নিবৃত্তির জন্য হতে পারে। সেটা হলেই নিতসিদ্ধ পরমানন্দ অনুভূত হয়। মৌলিক আনন্দ অনাত্মা দিয়ে আবৃত হয়েছে যা নিরানন্দ বা দুঃখেরই নামান্তর। দুঃখ নাশ = সুখ প্রাপ্তি। দুঃখ মিশ্রিত আনন্দ দুঃখই। যখন দুঃখ নাশ হয় তখন সুখপ্রাপ্তি হল বলা হয়। যে আনন্দ দুঃখে পরিণত হয় সেটা দুঃখ। মানুষ এরূপ আনন্দ পরিহার করতে চায়। আনন্দ—প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ। যখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা পাওয়ার সম্ভাবনা হয় তখন প্রিয়—যখন সেটা পাওয়া যায় সেটা মোদ—যখন সেটা উপভোগ করা হয়েছে তখন প্রমোদ। এই

অবস্থাগুলোর আনন্দময়তার কারণ এই যে 'একটা চিন্তা অন্য সকল চিন্তাকে দূর করে আর তারপর সেই এক চিন্তাও আত্মায় লীন হয়।' এ অবস্থাটা কেবল আনন্দময়কোষে উপভোগ হয়। সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থায় বিজ্ঞানময়কোষের আধিপত্য হয়। সুষুপ্তিতে সমস্ত চিন্তা অদৃশ্য হয় আর একটা বৈশিষ্টহীন আনন্দময় অবস্থা থাকে—সেটাই আনন্দময়কোষ। এগুলো আবরণ, কেন্দ্র নয়, সেটা এসবের অন্তস্থ থাকে। সেটা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত। এটাই সত্য আর প্রকৃত পরমানন্দ (নিজানন্দ)।

ভ—আত্মানুসন্ধানের জন্য হঠযোগের কি প্রয়োজন নেই ?

ম—প্রত্যেকে পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী কোন একটা পদ্ধতিকে তার উপযুক্ত মনে করে।

ভ—আমার বয়সে কি হঠযোগ সিদ্ধ হতে পারে ?

ম—এসব কথা আদৌ চিন্তা কর কেন ? তুমি এটাকে তোমার বাইরে মনে কর আর আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা কর। কিন্তু তুমি কি সব সময়ে থাকো না ? তুমি নিজেকে ছেড়ে বাইরে কিছুর জন্য যাচ্ছ কেন ?

ভ—'অপরোক্ষ অনুভূতিতে' বলা হয়েছে যে আত্মানুসন্ধানের জন্য হঠযোগ একটা অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

ম—যাতে অবাধে আত্মবিচার চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য হঠযোগীরা শরীরটা সুস্থ রাখতে চায়। তারা আরও বলে যে আত্ম-বিচার যাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সেজন্য দীর্ঘজীবী হতে হবে। অধিকন্তু আরও অনেকে এই উদ্দেশ্যে কায়কল্পের ঔষধ ব্যবহার করে। তাদের প্রিয় দৃষ্টান্ত—ছবি আঁকা শুরু করার পূর্বে পটটি সুন্দর হওয়া চাই। বেশ, কিন্তু কোন্‌টা চিত্র আর কোন্‌টাই বা তার পট ? তাদের মতে শরীরটা পট আর আত্মবিচার ছবি। কিন্তু দেহটাই কি আত্মার ওপর একটা ছবি নয় ?

ভ—কিন্তু হঠযোগের উপকারিতার খুব প্রশংসা করা হয়।

ম—হাঁ। এমনকি বেদান্তে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও এটা অভ্যাস করে। না হলে তাদের মন স্থির হয় না। সুতরাং তুমি বলতে পারো যে যারা অন্য উপায়ে মন শান্ত করতে পারে না তাদের পক্ষে এটা উপকারী।

ভ—বলা হয় সগুণ উপাসনা অপূর্ণ। আর এও বলা হয়েছে যে নির্গুণ উপাসনা কঠিন ও ক্লেশকর। আমি কেবল প্রথমটা করার উপযুক্ত। কি করণীয়?

ম—সগুণ অবশেষে নির্গুণে লয় হয়ে যায়। সগুণ মন শুদ্ধ করে আর অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছায়। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী সকলেই ঈশ্বরের প্রিয়। 'কিন্তু জ্ঞানী ঈশ্বরের আত্মা।'

৬২০। ভ—'নেতি'—'নেতি'। সাধককে এটা শিক্ষা দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় আত্মাই ব্রহ্ম। একে কি করে লাভ করা যায়?

ম—আত্মাকে শ্রোতা, মন্তা, জ্ঞাতা ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু এটাই সব নয়। একে আরও 'শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন' ইত্যাদি, 'যার দ্বারা জ্ঞাতাকে জানা যায়' বলা হয়।

ভ—কিন্তু এতে আত্মা কি বলা হচ্ছে না।

ম—'নেতি'—'নেতি'।

ভ—এটা কেবল নেতিবাচক।

ম—(নীরব)।

ভক্ত অভিযোগ করলে যে আত্মাকে দেখানো হয় না।

ম—একজন লোক জানতে চায় যে, সে কি। সে তার চারপাশে জন্তু জানোয়ার ও বিষয়বস্তু দেখে। তাকে বলা হয় 'তুমি একটা গরু নও, তুমি একটা ঘোড়া নও, একটা গাছ নও, এটা নও, ওটা নও ইত্যাদি'। তার পরেও সেই লোকটি যদি 'তুমি তো আমি কি বললে না' বলে, উত্তর হবে 'এটা তো বলা হয় নি যে তুমি মানুষ

নও।' সে যে মানুষ এটা তাকেই খুঁজে বার করতে হবে। সুতরাং তুমি নিজেই খুঁজে বার কর, তুমি কি।

তোমাকে বলা হয়েছে 'তুমি এই শরীর নও, মন নও, বুদ্ধি নও, অহংকার নও কিংবা যা কিছু তুমি চিন্তা করতে পারো তাও নও ; এখন খুঁজে দেখো প্রকৃত তুমি কি।' মৌন (উত্তর না পাওয়া) এটাই ইঙ্গিত করে যে প্রশ্নকর্তা নিজেই সেই আত্মা যাকে খুঁজে পেতে হবে। একটা সয়ম্বর সভায় রাজকন্যা প্রত্যেককেই 'না' বলে যায় কিন্তু যখন তার মনোনীতের নিকটে আসে তখন সে নিম্নমুখে নীরবে থাকে।

৬২১। শ্রীরাজকৃষ্ণ বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে শ্রীভগবানকে পাহাড়ে একলা পেলে আর প্রার্থনা করলে—আমি দশ বছর বয়স থেকে সত্যের দর্শন পাওয়ার জন্য উৎসুক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে শ্রীভগবানের মত মহর্ষিই আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং আমি আপনার কৃপা প্রার্থনা করি।

শ্রীভগবান তার দিকে কয়েক মিনিট চাইলেন। ভক্ত তাঁকে বাধা দিয়ে বললে—আমি যদি এ জন্মে উপলব্ধি না করতে পারি অন্ততঃ আমার মৃত্যুশয্যায় যেন এটা স্মরণ থাকে—একটি বারের জন্য অন্ততঃ মৃত্যুকালে যেন দর্শন হয় যার ফলে ভবিষ্যতে আমার শুভ হবে।

ম—ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মৃত্যুকালে যে কামনা থাকে সেটাই তার পরবর্তী জীবন নির্ধারণ করে। মৃত্যুসময়ে উপলব্ধি করার জন্য সত্যকে জীবনেই অনুভব করতে হবে। এই মুহূর্তটা কি শেষমুহূর্ত থেকে কিছু পৃথক, সেটা দেখো আর সেই কাম্য অবস্থায় থাকতে চেষ্টা কর।

ভ—আমার অক্ষমতা আছে। আমি সময়ে পুরুষকার প্রয়োগ করতে পারি না। কৃপা আমাকে সেটা দিতে পারে, যা আমি নিজে পারি না।

ম—সত্য কথা, কৃপা না হলে এই ইচ্ছাটাও জাগে না।

তাঁরা দু'জনে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে চলছিলেন। ভক্ত বললে—লাহোরে একটি এগারো বছরের মেয়ে আছে। আশ্চর্য মেয়ে। সে বলে যে, সে যদি কৃষ্ণকে দু'বার চিন্তা করে তবে সচেতন থাকে কিন্তু তৃতীয় বার করলে অচেতন হয়ে যায় আর দশ ঘণ্টা একভাবে সমাধিতে থাকে।

ম—যতক্ষণ তুমি কৃষ্ণকে নিজের থেকে পৃথক মনে কর ততক্ষণ তুমি তাঁকে ডাকো। ভাবসমাধি সমাধির ক্ষণস্থায়ীত্ব প্রকাশ করে। তুমি সর্বদাই সমাধিতে আছ; 'এটাই যা উপলব্ধি করতে হবে।'

ভ—ঈশ্বর দর্শন চমৎকার।

ম—আত্মাকে নিজের বিশ্বাস অনুসারে বাস্তবায়িত করাই ঈশ্বর দর্শন। আত্মাকে জানো।

৬২২। শ্রীভগবানের আঙ্গুলে একটা পট্টি বাঁধা রয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে "ওটা কি?" ভগবান উত্তর দিলেন, "আঙ্গুলটা ছুরিতে গিয়ে পড়েছিল।" (ছুরিটা জড়, সে তুলনায় আঙ্গুলটা চেতন বস্তু।)

৬২৩। শ্রীভগবান আর একজন ভক্তকে বলেছিলেন যে পাঁচটি অবস্থা আছে।

(১) নিদ্রা, (২) ঠিক জেগে ওঠার পূর্বে একটা চিন্তা-শূন্য অবস্থা, (৩) চিন্তারাহিত্যের জন্য আনন্দভাব (রসাস্বাদ), (৪) বাসনার আভ্যন্তরিক বিকাশ (কাষায়) ও (৫) বিক্ষেপসহ পূর্ণ জাগরণ। এর মধ্যে দ্বিতীয়টাকে স্থায়ী করতে হবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬২৪। একজন ভক্ত শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আসে আর যায়। এরূপে যখন জ্ঞাতা অদৃশ্য হয় তখন কি 'আমি'টাও অদৃশ্য হয় না? তা যদি হয় তবে 'আমি'র আর বিচার কি করে হবে?

ম—জ্ঞাতা একটা মনের বৃত্তি। যদিও বৃত্তিটা চলে যায় তথাপি তার পিছনের সত্যটা শেষ হয়ে যায় না। বৃত্তির পৃষ্ঠভূমি 'আমি', তারই ওপর মনের বৃত্তির উদয় ও লয় হয়।

ভ—আত্মাকে একবার শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি বলার পর আবার অশ্রোতা, অমন্তা, অবিজ্ঞাতা বলা হয়। তাই কি?

ম—ঠিক তাই। একজন সাধারণ লোক বুদ্ধিবৃত্তির (বিজ্ঞানময় কোষের) দ্বারা নিজের বিষয়ে সচেতন হয়। এই বৃত্তিগুলো ক্ষণস্থায়ী; তারা ওঠে আর লয় হয়। সেজন্য বিজ্ঞানময়কে (বুদ্ধিকে) একটা কোষ বলা হয়। যখন কেবল শুদ্ধ চেতনা অবশিষ্ট থাকে তখন সেটা নিজেই চিৎ বা ব্রহ্ম। প্রসমিত চিন্তা হয়ে নিজের স্বরূপে অবস্থানই পরমানন্দ, যদি আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী হয়, ওঠে ও লয় হয় তবে সেটা আনন্দময় কোষ, শুদ্ধ আত্মা নয়। যা করণীয় তা হল চিন্তা প্রসমিত হলে শুদ্ধ 'আমি'তে মন স্থির করা আর তাকে পরিত্যাগ না করা। এটা একটা খুব সূক্ষ্ম চিন্তারূপে বর্ণনা করতে হয় নতুবা তার কথা আদৌ বলা যায় না; কারণ এটা প্রকৃত আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়। এর কথা কে, কাকে এবং কিরূপে বলবে?

এটা 'কৈবল্য' ও 'বিবেক চূড়ামণি'তে বেশ ভালভাবে বর্ণনা করা আছে। এরূপে সুষুপ্তিতে আত্মার চেতনা যদিও হারায় না তথাপি জীবের অজ্ঞান তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই অজ্ঞান দূর করার জন্য মনের সূক্ষ্ম অবস্থার (বৃত্তিজ্ঞানের) প্রয়োজন; সূর্যের আলোয় কাপাস তূলা পোড়ে না, কিন্তু একটা আতসী কাঁচের নীচে তূলা রাখলে

সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা সূর্যের কিরণে সেটা আগুন ধরে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে আত্মার চেতনা যদিও সব সময়ে আছে তথাপি এটা অজ্ঞানের বিরোধী নয়। যদি ধ্যানের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম অবস্থাকে লাভ করা যায় তবেই অজ্ঞান নষ্ট হয়। বিবেক চূড়ামণি আরও বলে 'অতীব সূক্ষ্মম্ পরমাত্মতত্ত্বম্ ন স্থূল দৃষ্ট্যা' (পরমাত্মা তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় না) এবং 'এষ স্বয়ং জ্যোতিরশেষ সাক্ষী' (এ স্বয়ংপ্রকাশ ও সকলের সাক্ষী)।

যাকে মনের বৃত্তি বলা হয়, এই সূক্ষ্ম মানসতা তা নয়। কারণ মনের দু'টি বিভাব। একটা স্বরূপ আর অন্যটা যেটা বস্তুর আকার নেয়। প্রথমটাই সত্য আর অন্যটা কর্তৃতন্ত্র (কর্তাসাপেক্ষ)। যখন শেষেরটা "জলে কতক রেণুবৎ" (জল পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া 'কতক' (নির্মলী) ফলের গুঁড়ার মত যা জলেই মিলিয়ে যায়) নষ্ট হয়ে যায় তখন প্রথমটাই অবশিষ্ট থাকে।

এই অবস্থা লাভের উপায় ধ্যান। যদিও এটা ত্রিপুটি সমন্বিত কিন্তু পরিশেষে এটা জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। ধ্যানে প্রয়াস আছে—জ্ঞান অনায়াস। ধ্যান করা যায় আবার নাও করা যায় কিংবা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, জ্ঞান সেরূপ নয়। ধ্যানকে কর্তৃতন্ত্র (কর্তাসাপেক্ষ) আর জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র (ব্রহ্মসাপেক্ষ) রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬২৫। ইংরাজ মহিলা দর্শনার্থিনী কুমারী মার্স্টন—'আমি কে?' বইটা আমি পড়েছি। 'আমি'কে অনুসন্ধান করার সময়ে আমি একে বেশীক্ষণ ধরে থাকতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ পরিবেশ সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ নেই কিন্তু তবু আশা আছে যে জীবনে কোন সরসতা আসবে।

ম—কোন আকর্ষণ না থাকলে ভালই। (দোভাষী দেখালে প্রশ্নকারিণী আশা করে যে জীবনে কিছু রুচি পাবে।)

ম—তার অর্থ এরূপ বাসনা আছে। একজন একটা স্বপ্ন দেখে। সে স্বাপ্নিক জগতে সুখদুঃখ ইত্যাদি দেখে। কিন্তু সে জেগে ওঠে আর তখন স্বপ্নময় জগৎ সম্বন্ধে কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। জাগ্রত জগৎ সম্বন্ধেও তাই। যেমন স্বাপ্নিক জগতটা তোমার অংশ আর তোমার অতিরিক্ত নয় বলে তোমায় আকর্ষণ করে না সেরূপ তুমি যদি জাগ্রত-স্বপ্ন (সংসার) থেকে জেগে ওঠ আর একেও তোমার অংশ ও বাস্তবিক সত্য নয় বলে জানো তবে অনুরূপ ভাবে এও তোমায় আকর্ষণ করবে না। যেহেতু তুমি মনে কর যে তুমি তোমার চতুর্দিকের বস্তুসমূহ থেকে পৃথক সেজন্য তুমি বস্তুকামনা কর। যদি তুমি বোঝো যে বস্তুগুলো কেবলমাত্র মনের বৃত্তি তবে তুমি আর তাদের কামনা করবে না।

সব কিছু জলের বুদ্‌বুদের মত। তুমিই জল আর বস্তুগুলো বুদ্‌বুদ্। তারা জল ছাড়া থাকে না কিন্তু তারা ঠিক জলও নয়।

ভ—আমার মনে হয় আমি যেন ফেনা।

ম—অসতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ভাবা ত্যাগ কর আর নিজের প্রকৃত পরিচয় জানো। তবেই তুমি স্থিতি লাভ করবে আর কোন সংশয় উঠতে পারবে না।

ভ—কিন্তু আমিই ফেনা।

ম—যেহেতু তুমি এরূপ ভাবো সেজন্য দুশ্চিন্তা রয়েছে। এটা একটা ভুল কল্পনা। সত্যের সঙ্গে নিজের প্রকৃত একত্ব স্বীকার করে নাও। ফেনা নয় জল হয়ে যাও। গভীরে তলিয়ে গেলে এটা হয়।

ভ—আমি যদি ডুবে যাই, আমি পাব…।

ম—এমনকি না ডুবলেও 'তুমি সেই'। যতক্ষণ তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় স্বীকার না কর ততক্ষণই এই অন্তর ও বাহির ধারণা থাকে।

ভ—কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে এই ধারণাটা পেয়েছিলাম যে আপনি আমায় ডুবে যেতে বলেন।

ম—হাঁা, সেটা অবশ্য ঠিক। যেহেতু নিজেকে জল না ভেবে ফেনা ভাবছো সেজন্য এটা বলা হয়েছিল। তোমার মনোযোগকে এই ভ্রমের দিকে আকর্ষণ করার জন্য আর সেটা প্রাঞ্জলভাবে বোঝাবার জন্য এই উত্তর দেওয়া হয়েছিল। আত্মা অনন্ত আর যা কিছু দেখছ সবই তার অন্তর্গত, এটা বলাই অভিপ্রায়। কিছুই তার অতীত বা তার অতিরিক্ত নয়। এটা জানলে তুমি আর কিছু কামনা করবে না, কামনা না হলে তুমি সন্তোষ লাভ করবে।

আত্মা সর্বদাই অনুভূত হচ্ছে। যা—সর্বদাই—অনুভূত হয়ে রয়েছে তাকে খুঁজে অনুভব করার কিছু নেই। কারণ তুমি তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারো না। সেই অস্তিত্বটাই চেতনা—আত্মা।

তোমার অস্তিত্ব না থাকলে তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারো না। সুতরাং তোমার অস্তিত্ব তোমায় স্বীকার করতে হবে। এই অস্তিত্বই আত্মা। এটা এইক্ষণেও অনুভূত হচ্ছে। অতএব তোমার উপলব্ধির চেষ্টার ফল কেবল বর্তমান ভ্রমটা জানা যে তুমি উপলব্ধি করছো না। নূতন কিছু অনুভূতি নেই। আত্মা অপাবৃত।

ভ—সেটা হতে কয়েক বছর লাগবে।

ম—বছর কেন? কালের ধারণা তোমার মনে। এটা আত্মাতে নেই। আত্মার পক্ষে কোন কাল নেই। অহংকারের উদয় হলে কালরূপ একটা ধারণার উদয় হয়। কিন্তু তুমি দেশ ও কালের অতীত আত্মা; তুমি দেশ ও কালের অভাবেও থাকো।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬২৬। আর একজন ভক্ত—'আমি' কেবল 'ইহার' (অহম্—ইদম্) পরিপ্রেক্ষিতে থাকে, তাই না?

ম—এখন 'আমি ও 'ইহা' এক সঙ্গে উদয় হয়। কিন্তু 'ইহা'টা 'আমি'র অন্তর্গত (ব্যপ্তম্)—তারা পৃথক নয়। 'ইহা'টা

'আমি'তে মিশে লীন হয়ে যাওয়া চাই। তারপর যে 'আমি'টা অবশিষ্ট থাকে সেটাই প্রকৃত 'আমি'।

৬২৭। ভ—গুরু সান্নিধ্যে থাকা কি?

ম—এর অর্থ শাস্ত্র অধ্যয়ন।

ভ—কিন্তু গুরু সন্নিধানের বিশেষ মহত্ব আছে।

ম—হাঁ। তাতে মন শুদ্ধ হয়।

ভ—সেটা ফল বা পরিণাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম শিষ্য কিভাবে আচরণ করবে।

ম—এটা শিষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী—শিক্ষার্থী, গৃহস্থ, তার মনের গূঢ় সংস্কার আর নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

ভ—তা যদি হয় তবে শেষে কি সব ঠিক হয়ে যায়?

ম—হাঁ, প্রাচীনকালে ঋষিরা তাঁদের ছেলেদের অন্যের কাছে শিক্ষার্থে পাঠাতেন।

ভ—কেন?

ম—কারণ মমতা বাধা হত।

ভ—জ্ঞানীর পক্ষে সেটা হওয়া উচিত নয়, সেটা কি শিষ্যের পক্ষ থেকে হয়?

ম—হাঁ।

ভ—তা যদি হয় অন্য বাধার সঙ্গে এটাও কি গুরু কৃপায় অপসারিত হবে না?

ম—সময় নেবে। শিষ্যের শ্রদ্ধার অভাবে কৃপা কার্যকরী হতে অনেক দেরী হয়।

বলা হয় যে অজ্ঞান থেকে জেগে ওঠা ঠিক যেন একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা। এটা এরূপ। মনের দু'টি মলিনতা, আবরণ ও বিক্ষেপ। এ দু'টির মধ্যে প্রথমটি মন্দ; শেষেরটি তত নয়। যতক্ষণ নিদ্রার আবরণকারী প্রভাব রয়েছে ততক্ষণ দুঃস্বপ্নও

রয়েছে ; জেগে উঠলে আবরণ চলে যায় আর ভয়ও থাকে না। বিক্ষেপটা আনন্দের বাধা নয়। জাগতিক বিক্ষেপ ত্যাগ করার জন্য একজন গুরু সন্নিধানে শাস্ত্র অধ্যয়ন, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনারূপ বিক্ষেপ (ক্রিয়া) খোঁজে আর তার ফলে জাগরণ লাভ করে।

অবশেষে কি হয়? কর্ণ সর্বদাই কুন্তীর পুত্র ছিল। দশম ব্যক্তি সর্বদা এখানেই ছিল। রাম সর্বদাই বিষ্ণু। জ্ঞানও সেরূপ। 'যা' সর্বদা রয়েছে তার সম্বন্ধে কেবল সচেতন হওয়া।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬২৮। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর শ্রীডি. কয়েক মিনিটের জন্য শ্রীভগবানের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার করলে। সে বললে যে তার পূর্বের সাক্ষাৎকারে কিছু লাভ হলেও যতটা আশা করেছিল ততটা হয় নি। সে কাজে মন সংযোগ করতে পারে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে একাগ্রতা কি অপরিহার্য নয়? কর্ম তাকে আকর্ষণ করে কারণ এতে একাগ্রতা হয়।

শ্রীভগবান—কর্তা ছাড়া কোন কর্ম নেই। এই কর্তাকে খুঁজলে সে পালিয়ে যায়। তবে কর্ম আর কোথায়?

শ্রীডি. ব্যবহারিক উপদেশ চাইলে।

ম—কর্তাকে খোঁজো। এটাই সাধনা।

শ্রীমতী ডি. বললে যে তার অনুভূতিতে মাঝে মাঝে ছেদ হয় আর সেটা (অনুভূতিটা) কিরূপে নিরবচ্ছিন্ন হয় জানতে চাইলে।

ম—ছেদগুলো চিন্তার জন্য হয়। তুমি না ভাবলে ছেদ সম্বন্ধে জানতে পারো না। এটা কেবল একটা চিন্তা। পুরাতন অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি কর "চিন্তাটা কার উঠছে?" যতক্ষণ না ধারাবাহিক হয় ততক্ষণ এই অভ্যাস করে যাও। অভ্যাসের দ্বারাই বোধ অবিরাম হবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬২৯। আজ শিবরাত্রি। শ্রীভগবান আজ সন্ধ্যায় করুণাঘন-মূর্তি হয়ে রয়েছেন। একজন সাধক এই প্রশ্নগুলো করলে—

আত্মানুসন্ধান মনে হয় একজনকে সূক্ষ্মশরীরে (আতিবাহিক শরীর বা পুরীঅষ্টকম্ বা জীবাত্মায়) নিয়ে যায়। ঠিক বলেছি ?

ম—সেগুলো একই অবস্থার বিভিন্ন নাম কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের জন্য তাদের ব্যবহার হয়। পরে 'পুরীঅষ্টক' (অষ্টপুরাত্মক সূক্ষ্ম শরীর) অদৃশ্য হয় আর কেবল 'একই' থাকে।

কেবল বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞান দূর করতে পারে। পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের বিরোধ নেই।

বৃত্তি দু'প্রকার, (১) বিশ্ববৃত্তি ও (২) আত্মবৃত্তি। প্রথমটি লোপ হয়ে দ্বিতীয়টির উদয় হতে হবে। অভ্যাসের এই লক্ষ্য। প্রথমে তাকে 'পুরীঅষ্টক' তারপর 'এক' আত্মায় নিয়ে যায়।

৬৩০। কথাবার্তায় প্রসঙ্গবশে একজন ভক্ত বললে—

শিবপ্রকাশ পিল্লাই এত ভাললোক, এমন আন্তরিক ভক্ত আর কতদিনের পুরাতন শিষ্য ; সেও একটা কবিতায় লিখেছে যে শ্রীভগবানের নির্দেশ অভ্যাস করা তার দ্বারাও ঠিকমত হয় না। তবে আর অন্যদের ভাগ্যে কি হবে ?

ম—আচার্যও যখন কোন দেবতার স্তব লিখেছেন তখন এরূপ লিখেছেন। এছাড়া আর কি ভাবেই বা ঈশ্বরের স্তুতি করা যেতে পারে ?

একথা বলে শ্রীভগবান হাসলেন।

৬৩১। সাধক তার প্রশ্নটা অন্যভাবে বললে—

আত্মানুসন্ধানের পথ আতিবাহিক, পুরীঅষ্টক বা জীবাত্মায় যায়। ঠিক কিনা ?

ম—হাঁ। একে ‘শরীর’ (দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শরীর বা স্থান, পুরী বা জীব) বলে। এরা সব এক।

বৃত্তিজ্ঞান সাধারণতঃ দৃশ্য জগতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এগুলোর লোপ হলে আত্মবৃত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেটাই জ্ঞান। এটা ছাড়া অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। পুরীঅষ্টককে বাইরের কিছুর সঙ্গে যুক্ত দেখা যাবে না আর আত্মা এক ও সমানভাবে প্রকাশিত হবে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬৩২। ভেলোরের মহান্ত স্কুলের শিক্ষক শ্রীসত্য নারায়ণ রাও শ্রীমহর্ষির একজন প্রধান ভক্ত। তার খাদ্যনালীতে ক্যান্‌সার হয়েছে। ডাক্তারেরা রোগ অসাধ্য বলেছে। তাকে আশ্রমে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে আর সর্বাধিকারী তার প্রতি যথেষ্ট কৃপা করছেন। প্রায় দু’মাস হয়ে গেল, রোগী খুবই দুর্বল।

সকাল প্রায় ৯টা, শ্রীভগবান চিঠিপত্র দেখছেন। রোগীর শ্বাস উঠেছে, তার ভাই হলঘরে এসে খুব চিন্তিতভাবে শ্রীভগবানকে রোগীর কথা বললে। সর্বাধিকারীও রোগীর জন্য একবার এলেন। শ্রীভগবান চিঠিপত্র দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে আরও একজন ভক্ত একই উদ্দেশ্যে এল।

শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার ডেকেছ?

ভ—হাঁ, কিন্তু সে হাসপাতালে খুব ব্যস্ত।

ম—আমি কি করতে পারি? (একটু পরে) আমি গেলে এরা খুশি হবে।

অনতিবিলম্বে ভগবান হলঘর ছেড়ে রোগীর কাছে গেলেন। তার শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলালেন। এক হাত বুকে ও অন্য হাত মাথায় রাখলেন। রোগীর জিভ বেরিয়ে পড়েছে, মুখ খোলা, চোখের

দৃষ্টি স্থির, একটু যেন আরাম পেল মনে হল। কুড়ি মিনিট পরে সে ধীরে ধীরে বললে, "হে অসহায়ের শরণ আপনাকে কত কষ্ট দিলাম! এ কৃপার কি প্রতিদান দেবো?" লোকেরা স্বস্তি পেল। শ্রীভগবান হলঘরে ফিরে এলেন। কেউ একজন শ্রীভগবানকে হাত ধোওয়ার জন্য সাবান ও জল দিতে চাইলে। 'তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে হাতটা তাঁর শরীরে মুছে ফেললেন।' যাহোক রোগী কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেল।

একজন সুপরিচিত ভক্ত মন্তব্য করলে—"শ্রীভগবানকে সকল বিষয়ে কিরূপ উদাসীন মনে হয়। তবুও তিনি সব সময়ে কি স্নেহময় ও করুণাময়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

৬৩৩। ডিণ্ডিগুলের একজন দর্শনার্থী বললে—'আমি শরীরে ও মনে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মাবধি কোনদিন সুখী হইনি। শুনতে পাই, গর্ভে ধারণ করে আমার মাও কষ্ট পেয়েছিলেন। আমি এরূপ কষ্ট পাই কেন? আমি এ জীবনে পাপ করি নি। এটা কি আমার পূর্বজন্মের পাপের ফল?

ম—যদি নিরবচ্ছিন্ন কষ্টই থাকবে তবে কে আর আনন্দ খুঁজবে? অর্থাৎ দুঃখটা যদি স্বাভাবিক হবে তবে সুখের ইচ্ছা আদৌ কি করে জাগতে পারে? যা হোক ইচ্ছাটা হয়। সুতরাং আনন্দময়তাই স্বরূপ আর সবই অস্বাভাবিক। দুঃখ কেউ চায় না কারণ সেটা কেবল আসে আর যায়।

প্রশ্নকারী আবার তার অভিযোগ বললে।

ম—তুমি বলছ শরীর ও মন কষ্ট পায়। কিন্তু তারা কি প্রশ্ন করে? 'জিজ্ঞাসুটা কে?' এটা কি শরীর ও মনের অতীত কিছু একটা নয়?

তুমি বলছ 'এই' জীবনে শরীর কষ্ট পায়; তার কারণ পূর্বজন্ম; তার কারণ তারও পূর্বজন্ম ইত্যাদি। সুতরাং 'বীজাঙ্কুরের' ন্যায় এই কার্যকারণ শৃঙ্খলের আর অন্ত নেই। সব জীবনের প্রথম কারণ অজ্ঞান, এটাই বলতে হবে। সেই অজ্ঞানটা এইক্ষণেও রয়েছে, সেই প্রশ্ন করাচ্ছে। এই অজ্ঞানটা জ্ঞান দিয়ে দূর করতে হবে।

"দুঃখটা কেন ও কার জন্য এল?" তুমি যদি এরূপ প্রশ্ন কর তুমি দেখবে যে 'আমি' শরীর ও মন থেকে পৃথক আর আত্মাই একমাত্র নিত্য সত্তা আর এটাই শাশ্বত আনন্দ। সেটাই জ্ঞান।

ভ—কিন্তু এখন দুঃখ রয়েছে কেন?

ম—দুঃখ না থাকলে সুখের ইচ্ছা হয় কি করে? আর সে ইচ্ছা না হলে আত্মানুসন্ধানই বা কি করে সফল হয়?

ভ—তবে কি সব দুঃখই ভাল?

ম—ঠিক তাই। সুখ কি? সেটা কি সুন্দর স্বাস্থ্যবান শরীর, সময়মত খাদ্যলাভ আর এইরকম সব? এমনকি স্বাস্থ্যবান হয়ে একজন মহারাজারও দুঃখের শেষ নেই। সুতরাং সব দুঃখের কারণ মিথ্যা 'দেহাত্মবোধ'। এটা ত্যাগ করাই জ্ঞান।

৬৩৪। সরকারী কর্মে অবসরপ্রাপ্ত একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—"আমি অনেক দিন 'ওঁকার উপাসনা' করছি। আমি বাঁ কানে সর্বদা একটা শব্দ শুনি। সেটা নাদস্বরমের (বাঁশীর) মত। এমনকি এখনও শুনতে পাচ্ছি। কখন কখন জ্যোতিও দর্শন হয়। আমি কি করব জানি না।"

ম—এই শব্দ শোনা বা জ্যোতি দেখার জন্য একজন কেউ আছে। সেটাই 'আমি'। 'আমি কে?' জিজ্ঞাসা করে তুমি যদি এটা খোঁজো তবে বিষয়ী ও বিষয় এক হয়ে যাবে। তারপর আর কোন অনুসন্ধান থাকে না। ততদিন চিন্তা উঠবে, বিষয় আসবে ও যাবে; তুমি জিজ্ঞাসা করবে কি হল আর কি হবে। যদি জ্ঞাতাকে

জানা যায়, জ্ঞেয় সেই জ্ঞাতায় মিশে যাবে। যদি একজন এই জ্ঞানটা ছাড়া অন্য বিষয়ে মন দেয় তবে বিষয়গুলোর আসা যাওয়ার জন্য যা আত্মারূপে অবশিষ্ট থাকে তাকে সে নিজের স্বরূপ বলে জানে না। বিষয়ের অভাব হলে ভয় হয়। অর্থাৎ মন বিষয়ে আবদ্ধ বলে যখন বিষয়ের অভাব হয় তখন তার দুঃখ হয়। কিন্তু সেগুলো ক্ষণস্থায়ী আর আত্মা নিত্য। যদি শাশ্বত আত্মাকে জানা যায় তবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মিশে এক হয়ে যায় আর অদ্বিতীয় 'এক'ই প্রকাশ পায়।

ভ—সেখানে কি 'ওঁকারের' লয় হয়?

ম—'ওঁ' চিরন্তন সত্য। বিষয়ের লয় হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই 'ওঁ'। এটা কিছুতে লয় হয় না। এটা সেই অবস্থা, যার সম্বন্ধে—"যেখানে অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, সেই ভূমা" (যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা) বলা হয়। সব উপাসনাই একে লাভ করার জন্য করা হয়। একজন উপাসনাতে মেতে না গিয়ে 'আমি কে?' অনুসন্ধান করবে আর আত্মাকে খুঁজবে।

ভ—আমার সংসারে কোন সুখ নেই। সংসারে আমার করারও কিছু নেই। যা করার ছিল সব হয়ে গেছে। এখন নাতি-নাতনী হয়েছে। আমি বাড়ীতে থাকব না অন্য কোথাও চলে যাবো?

ম—এখন যেখানে আছো সেখানেই থাকো। কিন্তু এখন কোথায় আছ? তুমি বাড়ীতে আছো কিংবা বাড়ী তোমাতে আছে? বাড়ীটা কি তোমায় ছাড়া থাকে? তুমি যদি তোমার 'আপন' স্থানে স্থির হয়ে থাকো তবে দেখবে যে সব কিছু তোমাতে মিশে যাচ্ছে আর এইসব প্রশ্নের কোন কারণ থাকবে না।

ভ—হাঁ, তবে মনে হয় বাড়ীতেই থাকি।

ম—তোমার আপন প্রকৃত অবস্থায় থাকা উচিত।

৬৩৫। হস্‌পেটের একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক কৈলাস, অমরনাথ ইত্যাদি তীর্থ করে ফিরে এসেছে। সে এই তীর্থগুলোর দুর্গমতা ও চমৎকারিতা সম্বন্ধে বলছিল। শেষে স্মৃতিচিহ্নরূপে মহর্ষির কাছে কিছু চাইলে অর্থাৎ কিছু উপদেশ।

ম—তুমি কৈলাস ইত্যাদি গিয়েছ। মুক্তিনাথে কি গিয়েছিলে?

ভ—না। সে পথটা আমার পক্ষে বড়ই দুর্গম। আমি কিন্তু নেপালে গিয়েছিলাম। আপনি কি এসব জায়গায় গিয়েছেন?

ম—না, না। এমনি মুক্তিনাথের কথা বললাম।

তারপর শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন, "কৈলাসে গিয়ে ফিরে আসা পুনর্জন্ম। সেখানে শরীরবোধ চলে যায়।

৬৩৬। শ্রীমতী কেলী হাক্ জিজ্ঞাসা করলে যে জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থাকে আত্মার স্বরূপ থেকে বেড়াতে আসা ভাবা যেতে পারে কি না।

ম—প্রমোদ-ভ্রমণে গেলে তার একটা স্থান থাকা চাই। আর সেটা নিজের বাইরে হওয়া চাই। আত্মার স্বরূপ অবস্থায় সেটা হওয়া সম্ভব নয়।

ভ—আমি বলতে চাই, এরূপ কল্পনা করা যায় কিনা।

ম—একজন আত্মার স্বরূপ অবস্থাটাই কল্পনা করুক না।

ভ—পর্দার দৃষ্টান্তটি সুন্দর।

ম—সিনেমার পর্দা চেতন নয় সেজন্য একজন দর্শক প্রয়োজন অপরপক্ষে আত্মার পর্দায় দ্রষ্টা ও দৃশ্য দু'ই-ই আছে—বস্তুতঃ এটা বোধময়।

সিনেমার ছবি অন্ধকার ছাড়া দেখা যায় না; কারণ তুমি দিনের আলোয় সিনেমা দেখতে পারো না। অনুরূপভাবে মন যা কিছু ভাবে ও যে কোন বিষয় দেখে সেটাও একটা আধারভূত অবিদ্যার জন্যই হয়। আত্মা শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ বোধ, সেখানে কোন দ্বৈতবোধ

নেই। দ্বৈতবোধই অজ্ঞান। আত্মার জ্ঞান আপেক্ষিক জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত, আত্মার জ্যোতি সাধারণ আলো ও অন্ধকারের অতীত। একমাত্র আত্মাই আছে।

৬৩৭। উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল।

শ্রীভগবান বললেন যে উন্নতি মনের, আত্মার নয়। আত্মা সর্বদাই পূর্ণ।

২রা মার্চ, ১৯৩৯

৬৩৮। কয়েকদিন যাবৎ একটা নিয়ম হয়েছে যে মধ্যাহ্ন বারোটা থেকে আড়াইটা অবধি দর্শনার্থীদের হলঘরে প্রবেশ নিষেধ। আজ এই বিরতির সময়ে কয়েকজন মুসলমান দর্শনার্থী আশ্রমে এল। সেবক তৎক্ষণাৎ তাদের বললে যে তারা যেন শ্রীভগবানের বিশ্রামের বিঘ্ন না করে। শ্রীভগবান নীরবে সোফা থেকে নেমে হলের বাইরে এলেন; তিনি দেওয়ালের পাশে পাথরের চত্বরে বসলেন আর দর্শনার্থীদেরও বসতে বললেন। তিনি খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন ও একটু পরে শুয়েও পড়লেন। শেষে তাঁকে ভিতরে আসতে অনুরোধ করা হল।

৬৩৯। পডুকোটার শ্রীকে. এল. শর্মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বললেন, "যা অন্তরঙ্গ ও প্রত্যক্ষ তাকে ছেড়ে লোকে অন্য বস্তু খুঁজবে কেন? শাস্ত্র বলে, 'তুমিই সেই' (তত্ত্বমসি)। এই বাক্যে 'তুমি'টা (ত্বম্) প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কিন্তু তাকে ছেড়ে ওরা 'সেই'টা (তৎ) খুঁজতে যায়!

ভ—'সেই' ও 'তুমি'র একত্ব খুঁজতে যায়।

ম—'সেই'টা অন্তরাত্মা ও সর্বব্যাপী; তাকে খোঁজার জন্য

নিজেকে ছেড়ে জগতকে জ্ঞেয়রূপে দেখে। জগতটা কি? কি এতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে? সেটা 'সেই'। নিজের আত্মাকে ভুললেই এই সব বিচার ওঠে। আমি কখন এই সব বিচার নিয়ে মাথা ঘামাই নি। অনেক পরে মনে হল লোকে এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করেছে।

৩রা মার্চ, ১৯৩৯

৬৪০। প্রায় বিকাল চারটা, শ্রীভগবান মনোযোগ সহকারে কিছু লিখছিলেন, ধীরে ধীরে উত্তরের জানালার দিকে চাইলেন; কলমটার ঢাকা বন্ধ করে বাক্সে রাখলেন; ছোট খাতাটি বন্ধ ক'রে একপাশে সরিয়ে দিলেন; চশমা খুললেন, মুড়ে বাক্সে বন্ধ করে পাশে সরালেন। একটু হেলে, ওপরের দিকে দেখলেন, মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিকে চাইলেন। হাতটি মুখের ওপর বুলালেন আর তাঁকে চিন্তিত মনে হল। তারপর হলের একজনের দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বললেন—

"চড়ুই দম্পতি এইমাত্র এসেছিল আর আমার কাছে অভিযোগ করলে যে ওদের বাসা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ওপরে চেয়ে দেখি বাসাটা নেই।" তারপর তিনি তাঁর সেবক মাধবস্বামীকে ডাকলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন—"মাধব, কেউ কি চড়ুই পাখীর বাসা ভেঙ্গে দিয়েছে?"

সেবক ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল আর নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, "তারা যতবার তৈরী করে আমি ততবার ভেঙ্গে দি। শেষবার আজ দুপুরে ভেঙ্গে দিয়েছি।"

ম—তাই। সেজন্যই চড়ুইরা নালিশ করলে। আহা বেচারী! কত কষ্ট ক'রে ছোট ঠোঁটে ক'রে খড়কুটো এনে বাসা করে!

সেবক—কিন্তু তারা কেন এখানে আমাদের মাথার ওপর বাসা তৈরী করবে?

ম—বেশ—বেশ। দেখা যাক, শেষ অবধি কে জেতে।

(একটু পরে শ্রীভগবান বাইরে চলে গেলেন।)

৬৪১। 'সদ্‌বিদ্যার' প্রথম পদটি ব্যাখ্যা করে শ্রীভগবান বললেন—জগৎ সবার কাছে প্রত্যক্ষ। সবাই নিশ্চয় জানে, "আমি ও এই জগৎ আছে।" "এরা কি সর্বদা আছে?" আর "যদি এরা প্রকৃত সত্য হয় তবে এদের দেশ, কাল ও ভেদ নিরপেক্ষ হয়ে থাকা উচিত; এরা কি তাই?" অনুসন্ধান করলে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে কেবল জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় এদের দেখা যায় কিন্তু সুষুপ্তিতে দেখা যায় না। অতএব 'আমি' ও জগৎ কখন উদয় হয় আবার কখন লয়ও হয়। তাদের সৃষ্টি হয়, তারা থাকে আর পরে অদৃশ্য হয়। কোথা থেকে তারা ওঠে? কোথায় তারা থাকে? চোখের অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হয়? এরূপ ব্যাপারকে কি সত্য বলে স্বীকার করা যায়?

অধিকন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশশীল আমি ও জগৎ জাগ্রত ও স্বপ্নে দেখা যায়, সুষুপ্তিতে নয়। তবে অন্য দু'টি অবস্থা থেকে সুষুপ্তি কিভাবে পৃথক? সুষুপ্তিতে চিন্তা নেই অপরপক্ষে অন্য দু'টি অবস্থায় আছে। অতএব চিন্তাই 'আমি' ও জগতের মূল।

এখন চিন্তাগুলো কি? এগুলো স্বরূপ হতে পারে না অন্যথা তারা এক সময়ে থাকে অন্য সময়ে থাকে না তা হতে পারে না। তারা কোথা থেকে ওঠে? তাদের উৎসকে নিত্যবর্তমান ও অপরিবর্তনীয় স্বীকার করতে হবে। উপদেশ মন্ত্রে যেরূপ বলা হয়েছে—এটা নিত্য অবস্থা—যা থেকে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়; যাতে সমস্ত বিষয় থাকে আর যেখানে সবই লয় পায়।

এই পদটি স্তুতি বা বন্দনা নয়, কেবল সত্যের প্রভাষণ।

৬৪২। শ্রীকে. এল. শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন—"স্ব-স্বরূপানুসন্ধানম্ ভক্তিরিত্যভিধীয়তে" আবার "স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানম্ ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ"। এ দু'টির মধ্যে কি পার্থক্য?

ম—প্রথমটি বিচার—আমি কে? (কোঽহম্?) এটা জ্ঞানের নির্ণায়ক।

পরেরটি ধ্যান—আমি কোথা থেকে এলাম? (কুতোঽহম্?) এখানে যে পরমাত্মাকে খোঁজে সেই জীবাত্মাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে।

৬৪৩। একজন বয়স্ক বিদ্বান আন্ধ্র ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে—

"কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ কি স্বতন্ত্র ও পৃথক? কিংবা কর্ম একটা প্রারম্ভিক ভূমিকা যার সফল-অভ্যাসের পর চরম সিদ্ধির জন্য জ্ঞানমার্গের আশ্রয় নিতে হবে? কর্মমার্গে কর্মে অনাসক্তি আর তা সত্ত্বেও পূর্ণ কর্মময় জীবন যাপন করতে বলে, অপরপক্ষে জ্ঞানমার্গের আশয় সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ কি? কাম, ক্রোধ ইত্যাদি দমন সকল পথেই সমানরূপে আবশ্যক আর যে কোন পথেরই প্রাথমিক আবশ্যিক কর্তব্য। প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভই কি সন্ন্যাস নয়? কিংবা সন্ন্যাস একটা অন্য কিছু যথা কর্মময় জীবন পরিহার? এই প্রশ্নগুলো আমায় ভাবিত করছে, আমি সংশয় নিরসনের জন্য প্রার্থনা করছি।"

ভগবান হাসলেন ও বললেন—"তুমি সবই বলেছ। তোমার প্রশ্নেই উত্তর রয়েছে। প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি মুখ্য আবশ্যকতা। এটা হলেই সব কিছু হয়ে যায়।"

ভ—শ্রীশঙ্কর জ্ঞানমার্গ ও তার পূর্বে সন্ন্যাসের ওপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু গীতায় এ দু'টিকে স্পষ্ট পৃথক, 'দ্বিবিধ' বলা হয়েছে। তারা কর্ম ও জ্ঞান (লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা···গী. ৩।৩)।

ম—শ্রীআচার্য গীতার ভাষ্য করেছেন আর এটারও ভাষ্য করেছেন।

ভ—গীতা মনে হয় কর্মের ওপর জোর দেয়। কারণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেও মহাপরাক্রমযুক্ত কর্মময় জীবনের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

ম—গীতার আরম্ভ হয় 'তুমি দেহ নও, অতএব তুমি কর্তা নও' দিয়ে।

ভ—এর তাৎপর্য কি?

ম—যে, একজন নিজেকে কর্তা না ভেবে কর্ম করবে। একজন অহংকারশূন্য হলেও কর্ম হয়ে যাবে। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য একজন এসেছে। সে নিজেকে কর্তা ভাবুক বা না ভাবুক সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েই যাবে।

ভ—কর্মযোগ কি? এতে কি কর্ম কিংবা তার ফলে অনাসক্তি বোঝায়?

ম—কর্মযোগ সেই যোগ যেখানে লোকে কর্তা হওয়ার অহংকার করে না। কর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যায়।

ভ—এটা কি কর্মফলে অনাসক্তি নয়?

ম—কর্তা থাকলেই এ প্রশ্নটা ওঠে। বার বার বলা হচ্ছে যে তুমি নিজেকে কর্তা মনে করবে না।

ভ—সুতরাং কর্মযোগ 'কর্তৃত্ব-বুদ্ধিরহিত কর্ম'—কর্তৃত্ববোধ ছাড়া কাজ।

ম—হাঁ, ঠিক তাই।

ভ—গীতা আদ্যোপান্ত কর্মময় জীবনের উপদেশ দেয়।

ম—হাঁ,—কর্তারহিত কর্ম।

ভ—তবে কি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস জীবন যাপনের আবশ্যকতা আছে?

ম—গৃহ তোমাতে? না তুমি গৃহে?

ভ—এটা আমার মনে।

ম—তবে স্থূল পরিবেশ ত্যাগ করলে তোমার কি হবে?

ভ—এখন বুঝেছি। কর্তৃত্ববোধ ছাড়া কর্ম সন্ন্যাস। জীবনমুক্তের কি কর্ম নেই ?

ম—কে প্রশ্ন করছে ? সে কি জীবনমুক্ত কিংবা অন্য কেউ ?

ভ—জীবনমুক্ত নয়।

ম—জীবনমুক্তি লাভ হওয়ার পর যদি প্রয়োজন হয় তখন এ প্রশ্নটা তোলা যাবে। মুক্তির অর্থ মানস ক্রিয়ারও নিবৃত্তি। মুক্ত কি কর্মের কথা ভাবতে পারে ?

ভ—সে কর্ম ত্যাগ করলেও কর্ম তাকে ত্যাগ করে না। তাই না ?

ম—এই প্রশ্নটা করার জন্য তাকে কোন্ রূপে নির্ধারণ করা যাবে ?

ভ—হাঁ, এবার বুঝেছি। আমার সংশয় দূর হয়েছে।

৬৪৪। একজন মুসলমান জেলা অধিকারী—পুনর্জন্মের আবশ্যকতা কি ?

ম—পুনর্জন্ম বিচার করার পূর্বে জন্ম হয়েছে কিনা দেখা যাক।

ভ—কিরূপে ?

ম—তোমার কি এখন জন্ম হয়েছে যে পুনর্জন্মের কথা বলছ ?

ভ—হাঁ, নিশ্চয়। একটা অ্যামিবা (এককোষযুক্ত জীব) ক্রমে ক্রমে উচ্চতর প্রাণী হয়ে মানুষ হয়েছে। এটাই বিবর্তনের পূর্ণতা। তবে আর পুনর্জন্মের কি প্রয়োজন ?

ম—কে এই ক্রমবিকাশবাদের সীমা নির্দেশ করবে ?

ভ—শরীরের দিক থেকে এটা চরম উৎকর্ষ। কিন্তু জীবাত্মার জন্য হয়ত আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে, সেটা মানুষের মৃত্যুর পর হতে পারে।

ম—মানুষ কে ? সে কি শরীর কিংবা আত্মা ?

ভ—দু'টি মিলিয়ে।

ম—শরীরের অভাবে কি তুমি থাকো না ?

ভ—কি করে ? এটা অসম্ভব।

ম—তোমার সুষুপ্তির অবস্থা কি ?

ভ—সুষুপ্তি সাময়িক মৃত্যু। আমি অচেতন ছিলাম অতএব সে অবস্থা কি বলতে পারি না।

ম—তথাপি তুমি সুষুপ্তিতে ছিলে। ছিলে না ?

ভ—সুষুপ্তিতে আত্মা শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও যায়। আবার জেগে ওঠার আগে ফিরে আসে। অতএব এটা সাময়িক মৃত্যু।

ম—একজন মারা গেলে সে কখন ফিরে এসে বলে না যে সে মারা গিয়েছিল। অন্যপক্ষে যে ঘুমিয়েছিল সে বলে যে সে ঘুমিয়েছিল।

ভ—কারণ এটা সাময়িক মৃত্যু।

ম—যদি মৃত্যুটা সাময়িক হয় তবে জন্মটাও সাময়িক, তবে সত্যটা কি ?

ভ—এ প্রশ্নের অর্থ কি ?

ম—যদি জীবন ও মৃত্যু ক্ষণস্থায়ী হয় তবে একটা কিছু তো থাকবে যা ক্ষণস্থায়ী নয়। সেটাই সত্য যা ক্ষণস্থায়ী নয়।

ভ—কিছুই সত্য নয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। সবই মায়া।

ম—মায়াটা কার ওপর দেখা যাচ্ছে ?

ভ—এখন আমি আপনাকে দেখছি, এ সব মায়া।

ম—সবই যদি মায়া হয় তবে আর প্রশ্ন ওঠে কি করে ?

ভ—পুনর্জন্ম থাকবে কেন ?

ম—কার জন্য ?

ভ—একজন পূর্ণ মানুষের জন্য।

ম—তুমি যদি পূর্ণই হবে তবে পুনর্জন্মের জন্য ভয় পাবে কেন ? এটা অপূর্ণতার ইঙ্গিত করছে।

ভ—আমি ভয় পাই, তা নয়। কিন্তু আপনি বলছেন যে আমার পুনর্জন্ম হবে।

ম—কে বলছে? তুমিই এই প্রশ্ন করছ।

ভ—আমি এই বলতে চাই। আপনি একজন পূর্ণ মানব; আমি একজন পাপী। আপনি বলছেন যে পাপী হওয়ার জন্য আমায় পূর্ণতা লাভ করতে পুনর্জন্ম নিতে হবে।

ম—না, আমি এরূপ বলি না। পক্ষান্তরে আমি বলি যে তোমার জন্ম নেই অতএব মৃত্যুও নেই।

ভ—আপনি কি বলতে চান যে আমার জন্ম হয়নি?

ম—হ্যাঁ, তুমি এখন নিজেকে শরীর ভাবছ আর সেজন্য জন্ম ও মৃত্যুর ভ্রমে পড়েছ। কিন্তু তুমি শরীর নও আর তোমার জন্ম ও মৃত্যু নেই।

ভ—আপনি কি পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেন না?

ম—না, অন্যপক্ষে তোমার পুনর্জন্মরূপ ভুল ধারণা দূর করতে চাই। তুমিই ভাবছ যে তোমার পুনর্জন্ম হবে।

দেখ প্রশ্নটা কার উঠছে। প্রশ্নকর্তাকে না ধরতে পারলে প্রশ্নগুলোর কখন মীমাংসা হতে পারে না।

ভ—এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।

ম—পক্ষান্তরে এই উত্তরই বর্তমান আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য সংশয়েরও ব্যাখ্যা।

ভ—এতে সকলে সন্তুষ্ট হবে না।

ম—অন্যের কথা থাক। তুমি যদি তোমার ব্যবস্থা করতে পারো অন্যেরা তাদের ব্যবস্থা করবে।

নীরবতা বিরাজ করল। সে স্পষ্টই আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়ে চলে গেল।

শ্রীভগবান কয়েক মিনিট পরে বললেন—এতেই তার কাজ হবে। এ আলোচনায় ফল হবে।

সে কোন সত্য স্বীকার করে না। বেশ—কে এমন আছে

যে সব কিছু অসৎ বলে সিদ্ধান্ত করতে পারে ? পক্ষান্তরে সিদ্ধান্তটাও অসৎ হয়ে যায়।

এই অবস্থায় লোকটি বিবর্তনবাদের বিস্তার করছিল। এটা তার মনে ছাড়া আর কোথায় রয়েছে ?

মৃত্যুর পর তার পূর্ণতা হবে বললে জীবাত্মা আছে স্বীকার করতে হয়। তবে শরীরটা ব্যক্তি নয়। এটা জীবাত্মা।

বিবর্তন ব্যাখ্যা করে শ্রীভগবান বলে চললেন—

একজন স্বপ্নে একটা সৌধ দেখলে। এটা হঠাৎ দেখা গেল। তখন সে ভাবতে আরম্ভ করলে যে এটা এক একটা ইট দিয়ে না জানি কত কারিগরের দ্বারা কতদিনে তৈরী হয়েছে। তথাপি সে কোন রাজ-মিস্ত্রীকে কাজ করতে দেখলে না। বিবর্তনবাদের পক্ষেও সেরূপ। যেহেতু সে নিজেকে মানুষ দেখে, সে ভাবে যে, সে নিশ্চয় আদিম এককোষী অ্যামিবা অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে এই অবস্থায় এসেছে।

আর একজন ভক্ত—এটা সেই কথনের দৃষ্টান্ত যেখানে বলা হয়েছে, "বিশ্বম্ পশ্যতি কার্যকারণতয়া" (একজন জগতকে কার্য কারণময় দেখে)।

ম—হাঁ। মানুষ সর্বদাই একটা কাজের জন্য একটা কারণ খোঁজে, সেই কারণেরও একটা কারণ থাকবে, এরূপে তর্কের আর শেষ নেই। কার্যকারণ সম্বন্ধে ভাবলেই মানুষকে চিন্তা করায়। অবশেষে সে নিজেকে বিচার করতে বাধ্য হয়। যখন সে নিজেকে জানে তখনই পূর্ণ শান্তি। এই চরম সার্থকতার জন্যই মানুষের সৃষ্টি।

পরে সন্ধ্যাবেলায় আর একজন ভক্ত শ্রীভগবানকে বললে যে সেই মুসলমান অধিকারী পৌরসংস্থার অধ্যক্ষকে এই বিষয়ে বলেছিল। তখন শ্রীভগবান বললেন—

সে বলে শরীর আর আত্মা মিলে মানুষ হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি সুষুপ্তিতে মানুষের কি অবস্থা। শরীর সম্বন্ধে চেতনা নেই অন্যপক্ষে মানুষটা ঠিকই আছে।

ভ—কিন্তু সে বলে যে ঘুমটা সাময়িক মৃত্যু।

ম—হাঁ, সে এরূপ বলে। কিন্তু সে মৃত্যু শব্দের সঙ্গে 'সাময়িক' বিশেষণ যোগ করে যাতে মানুষ আবার শরীরে প্রবেশ করে। সে শরীরটাকে খুঁজে পায় কি করে? উপরন্তু সে ফিরে আসা সম্বন্ধে নিশ্চিত। তার অর্থ শরীরে ফিরে আসা বা শরীরটাকে নিজের বলে দাবী করার জন্য সে নিশ্চয় আছে।

যা হোক, শাস্ত্র বলে সুষুপ্তির সময়ে প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে। কারণ শরীরটা যখন মাটিতে পড়ে থাকে একটা নেকড়ে কিংবা একটা বাঘ এটা খেয়ে ফেলতে পারে। জন্তুটা এটা শুঁকে দেখে যে এতে প্রাণ আছে সুতরাং মৃতদেহ মনে করে খেয়ে ফেলে না। এতেই প্রমাণ হয় যে সুষুপ্তিতে শরীর রক্ষা করার জন্য এতে একটা কেউ থাকে।

শ্রীভগবানের সাধারণ মন্তব্য—

মানুষকে আত্মোপলব্ধি করাবার জন্যই সমস্ত বিদ্যা। শাস্ত্র বা ধর্ম এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয়েছে। এদের কি অভিপ্রায়? তারা ভূত বা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যা বলে সে কথা বাদ দাও সেগুলো কেবল অনুমান মাত্র। কিন্তু বর্তমান অস্তিত্ব প্রত্যেকেরই অনুভূতির বিষয়। শুদ্ধ চেতনাকে জানো। তবেই সব আলোচনা ও তর্কের শেষ হবে।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সহজে এই পথে যায় না। বিরল কোন ক্ষেত্রে মানুষ অন্তর্মুখীন হয়। বুদ্ধি অতীত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান করতে ভালবাসে কিন্তু বর্তমানকে দেখতে চায় না।

ভ—কারণ আত্মানুসন্ধানে ডুবে গেলে সে নিজেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু অন্য অনুসন্ধান যে কেবল তাকে নবীন জীবন প্রদান করে তা নয় উপরন্তু তার বুদ্ধিকেও সাহায্য করে।

ম—হাঁ, ঠিক তাই। বুদ্ধির উন্নতির প্রয়োজন কিসের জন্য? এর একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা আত্মানুসন্ধানের পথ দেখানো। এটাকে সেই কাজে লাগানো চাই।

১২ই মার্চ, ১৯৩৯

৬৪৫। প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স্ক একজন সুশ্রী ভদ্রলোক কয়েকজন সঙ্গীসহ হলঘরে এল। লোকটি কোন ভূমিকা না ক'রে হঠাৎ বলতে শুরু করলে—'আমি'—'আমি' বলা কাউকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে না। 'আমি'কে কি করে দেখানো যাবে ?

ম—একে অন্তরে খুঁজতে হবে। এটা কোন স্থূল পদার্থ নয় যে কেউ অন্যকে দেখিয়ে দেবে।

ভ—যখন 'আমি'কে খোঁজার উপদেশ দেওয়া হয় তখন এটা কি তা বলে দিয়ে উপদেশ সম্পূর্ণ করা উচিত।

ম—উপদেশ এখানে কেবল নির্দেশ। এটা সাধকের সেটা উপযোগ করার ওপর নির্ভর করে।

ভ—সাধক অজ্ঞান আর সে নির্দেশ চায়।

ম—সেজন্য তাকে সত্যানুসন্ধানের পথ নির্দেশ করা হয়।

ভ—কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। 'আমি'টা কি তা স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত।

লোকটির ভঙ্গী উগ্র আর সে কিছুই শুনতে প্রস্তুত নয়। শ্রীভগবান বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে তাঁকে কথা বলতে দিলে না।

শ্রীভগবান অবশেষে বললেন—

এ ভঙ্গী সাধকের নয়। কেউ যদি তাকে নম্রতা শিক্ষা দেয় তবেই সে পথে অগ্রসর হতে পারে নতুবা নয়।

বেদপারায়ণ শুরু হল।

প্রসঙ্গক্রমে আর একজন ভক্ত এই কথাবার্তা আবার উত্থাপন করলে।

শ্রীভগবান আবার বললেন—সাধককে শুনতে হবে আর বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অপরপক্ষে সে যদি আমায় পরীক্ষা করতে চায় করুক। আমি তর্ক করছি না।

সেই লোকটি আবার শুরু করলে—

"আমার দৃষ্টিভঙ্গী ঠিকমত বোঝা হয়নি। 'আমি'টাকে আমি জানতে চাই। এটা আমাকে দেখানো দরকার।"

কিন্তু তার ব্যবহার যথেষ্ট ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল। অন্যেরা সেটা পছন্দ করলে না সুতরাং তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে। তার ব্যবহারের আরও অবনতি হল। শ্রীভগবান শেষে বললেন—"যে পথে এসেছ, সে পথে যাও। অন্তরে বা বাইরে যা তোমার সুবিধা তাই কর।"

লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল, অন্যেরাও সমান উত্তেজিত হল। শেষে তাকে হলঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ও বিদায় দেওয়া হল।

পরে জানা গেল যে সে একজন যোগপন্থী আর অন্য সব পথকে নিন্দা করে বেড়ায়। সে জ্ঞানকে ও জ্ঞানীদের কুৎসা করে।

রাত্রে ভোজনের পর শ্রীভগবান একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মালেয়ালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোবিন্দ যোগীর কথা বললেন, সে যোগের খুব প্রশংসা করত আর অন্য মার্গের নিন্দা করত। সে নিজমত সমর্থনের জন্য সর্বদা গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি উদ্ধৃত করত। অন্যেরা যেমন শ্রীনারায়ণ গুরু তাকে সেইসব উদ্ধৃতি দিয়েই খণ্ডন করত।

পরে শ্রীভগবান অমৃতনাথের সৌহার্দ্রের প্রশংসা করলেন। সে একজন মহাতপস্বী, অনেক জপ করেছে। সে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা করাতো। সহজেই বড় বড় লোক যেমন স্যার পি. রামনাথম্, পণ্ডিত মালব্য আর অনেকের স্নেহভাজন হয়েছিল।

১৩ই মার্চ, ১৯৩৯

৬৪৬। শ্রীভগবান গত ১১ই তারিখের 'হরিজনে' প্রকাশিত গান্ধীজীর লেখাটি উল্লেখ করলেন—

"ঈশ্বরের লীলা কি রহস্যময়! রাজকোট যাত্রা আমার নিজের কাছেও একটা বিস্ময়। কেন যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি? কিসের জন্য যাচ্ছি? আমি এসব বিষয়ে কিছুই ভাবি নি। ঈশ্বর যদি পথ প্রদর্শন করেন. আমি আর কি চিন্তা করব, কেনই বা করব? তাঁর নির্দেশনার নিকট চিন্তাটাও একটা বাধা।

"বস্তুতঃ চিন্তা রোধ করতে কোন প্রয়াস লাগে না। চিন্তা আসেই 'না'। এটা শূন্যতা নয়—বলার অর্থ এই যে উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।"

শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন যে কথাগুলো বাস্তবিক যথার্থ আর উদ্ধৃতাংশের প্রত্যেক বাক্যের ওপর জোর দিলেন। তারপর তিনি চিন্তাশূন্য অবস্থা সম্বন্ধে 'তায়ুমানাবর' উদ্ধৃত ক'রে বললেন—

"যদিও আমি সকল শাস্ত্রের ঘোষণা শুনেছি যে শান্ত অবস্থাই পরমানন্দ, পূর্ণানন্দ—তথাপি আমি অজ্ঞানে রয়েছি। আবার আমি প্রভুর নির্দেশ পালন করিনি—মৌন গুরু—আমারই দোষ। আমি মায়া কাননে ভ্রমণ করছি—হায়, আমার এই ভাগ্য।

"যদি একজন শান্ত হয়, পরমানন্দ নিজেই প্রকাশিত হবে। তবে আর এই ভ্রমাত্মক যোগ অভ্যাস করা কেন? বুদ্ধিকে কোন একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত করলে কি একে (পরমানন্দকে) উদ্ভাসিত করা যায়? হে যোগ-অভ্যাসী, একথা বলো না, এ যে বালকের কথা।

"শাশ্বত সত্তা সেই অবস্থা যেখানে তুমি লুপ্ত হয়ে গেছ। তুমি কি তারই অন্তর্গত নও? তুমি যে তার কথা বলতে পারো না, তাতে বিমূঢ় হয়ো না। যদিও তোমার প্রকাশ নেই তবুও তুমি হারিয়ে

যাওনি। কারণ তুমি শান্ত ও শাশ্বত হয়েছ। দুঃখ করো না। এই পরমানন্দ—এগিয়ে চল।”

১৫ই মার্চ, ১৯৩৯

৬৪৭। ভ—গান্ধীজী যে অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে চিন্তা কি একটা বিজাতীয় বস্তু নয়?

ম—হ্যাঁ। কেবল ‘আমি’-চিন্তা ওঠার পর অন্য চিন্তা ওঠে। ‘আমি আছি’ অনুভবের পরই জগৎ দর্শন হয়। ‘আমি’-চিন্তা আর অন্য চিন্তা তাঁর কাছে অদৃশ্য হয়েছে।

ভ—তবে সে অবস্থায় দেহজ্ঞানও থাকবে না।

ম—দেহজ্ঞানও একটা চিন্তা, অপরপক্ষে তিনি এমন একটা অবস্থার বর্ণনা করেছেন যেখানে “চিন্তার উদয় হয় না।”

ভ—তিনি আরও বলেছেন, “চিন্তা রোধ করতে প্রয়াস লাগে না।”

ম—নিশ্চয়ই, চিন্তা রোধ করতে প্রয়াস লাগে না, পরন্তু চিন্তা করতেই চেষ্টার প্রয়োজন হয়।

ভ—আমরা চিন্তা রোধ করার চেষ্টা করছি। গান্ধীজী আরও বলেছেন যে ঈশ্বরের নির্দেশনার কাছে চিন্তা একটা বাধা। তবে এটা স্বরূপ অবস্থা। স্বরূপ হলেও অনুভব করা কি কঠিন। ওঁরা বলেন সাধনার প্রয়োজন, আবার এও বলেন যে সেগুলো বাধা। আমাদের সব গোলমাল হয়ে যায়।

ম—যতক্ষণ উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ সাধনা। সেগুলো বাধা দূর করার জন্য। শেষে একটা অবস্থা আসে যখন সাধনা করা সত্ত্বেও একজন অসহায় বোধ করে, সে তার চিরবাঞ্ছিত সাধনাও করতে পারে না। তখনই ঈশ্বরের শক্তি অনুভূত হয়। আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে।

ভ—এটা যদি স্বরূপ হয় তবে যেটা স্বাভাবিক নয় তাকে অভিভূত ক'রে নিজেকে প্রকাশ করে না কেন?

ম—সেটা ছাড়া আর কি কিছু আছে? কেউ কি আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখে? প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ আত্মা সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং 'সে' সর্বদাই 'তাই'।

ভ—বলা হয়, যেহেতু এর প্রকাশ হয় সুতরাং এটা প্রত্যক্ষ হয়। আমি এ থেকে বুঝি যে 'প্রদীপ্ত' (প্রকাশিত) হলেই 'প্রত্যক্ষ' হয়। যেহেতু আমাদের উপলব্ধি হয়নি সেজন্য মনে করছি যে এটা প্রদীপ্ত নয়। কিংবা এটা কেবলমাত্র প্রদীপ্ত সেজন্য তার প্রকাশের বাধা আছে ও বাধার দ্বারা এটা অবরুদ্ধ হয়। আত্মা যদি 'প্রকর্ষেণ দীপ্ত' (অত্যন্ত প্রকাশিত) হয় তবেই সবকিছুর ওপর প্রভাসিত হবে। অতএব মনে হয় একে আরও দীপ্তিশালী করা উচিত।

ম—তা কি করে হয়? আত্মা এক সময়ে দীপ্তিহীন অন্য সময়ে প্রদীপ্ত হতে পারে না। এটা অপরিবর্তনীয় ও একরূপ।

ভ—কিন্তু চূড়ালা শিখিধ্বজকে বলেছে যে সে কেবলমাত্র পলিতাটিকে ভাল করে কেটে দিয়েছে।

ম—সেটা নিদিধ্যাসনকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয়েছে।

শ্রবণের দ্বারা জ্ঞান হয়। সেটাই দীপশিখা।

মননের দ্বারা সেই জ্ঞানকে নির্বাপিত হতে দেওয়া হয় না। যেমন একটা আলোকে চিমনির দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়, সেরূপ সম্যক জ্ঞানকে অন্য চিন্তা দ্বারা অভিভূত হতে দেওয়া হয় না।

নিদিধ্যাসনের দ্বারা সেই জ্ঞানের পলিতাকে পরিপাটি করে কেটে আরও উজ্জ্বল করা হয়। যখনই অন্য চিন্তা জাগে, মনকে সত্যজ্ঞানের আলোর দিকে অন্তর্মুখীন করা হয়।

যখন সেটা স্বাভাবিক হয়, তখন সমাধি।

'আমি কে?' অনুসন্ধান, শ্রবণ।

'আমি'র অর্থ নিশ্চয় করা, মনন।

প্রত্যেক অবস্থায় এর বাস্তব উপযোগ করা, নিদিধ্যাসন।

'আমি'রূপে থাকা, সমাধি।

ভ—যদিও আমরা বার বার এবং অবিরত শুনছি তবুও আমরা এই উপদেশ বাস্তবে পরিণত করতে পারি না। এটা নিশ্চয় মনের দুর্বলতার জন্য হয়। একজনের বয়স কি এর পক্ষে বাধা হতে পারে ?

ম—প্রবল বেগে চিন্তা করতে পারলেই সাধারণতঃ মনকে শক্তিমান বলা হয়। কিন্তু এখানে মন যদি চিন্তাশূন্য হয় তবেই সেটা শক্তিমান বলা হয়। যোগীরা বলে যে আত্মজ্ঞান কেবল তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে হওয়া সম্ভব ; কিন্তু জ্ঞানীরা তা বলে না। কারণ বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের লোপ হয় না।

এ কথা সত্য যে 'যোগবাশিষ্ঠে'র বৈরাগ্য প্রকরণে বশিষ্ঠ রামকে বলেছেন, "তোমার যৌবনে এরূপ বৈরাগ্য হয়েছে, এটা প্রশংসনীয়।" কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞান হয় না। বৃদ্ধ বয়সে এটা হতে কোন বাধা নেই।

সাধক কেবল আত্মারূপে থাকবে। যদি সে তা না করতে পারে তবে 'আমি'র প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করবে। আর অন্য চিন্তার উদয় হলে নিরন্তর সেই 'আমি'তেই ফিরে আসবে। এটাই সাধনা।

অনেকে বলে যে একজনের 'তৎ'কে জানতে হবে কারণ জগৎ ব্যাপার সর্বদাই মনকে পথভ্রষ্ট করছে। যদি প্রথমেই এর পিছনের সত্যকে নিরূপণ করা যায় তবে তাকে ব্রহ্ম বলে জানা যায়। এরপর 'ত্বম্'কে জানা হয়। এটা জীব। অবশেষে জীব ব্রহ্মৈক্য হয়।

কিন্তু এসবের কি দরকার ? জগতটা কি আত্মা ছাড়া আছে ? 'আমি' সর্বদাই ব্রহ্ম। এর পরিচয় তর্ক বা সাধনার দ্বারা নির্ণয় করার কোন প্রয়োজন নেই। একজনের আত্মাকে জানলেই যথেষ্ট হবে। এটা সর্বদাই ব্রহ্ম।

অন্য মতানুসারে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' চিন্তাই নিদিধ্যাসন। অর্থাৎ

চিন্তাকে ব্রহ্মমুখীন করা। বস্তুতঃ কোন মুখীনই করা উচিত নয়। আত্মাকে জানো আর সব সিদ্ধ হয়ে যাবে।

আত্মাকে জানার জন্য কোন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। এটা কি অন্য কেউ দেখিয়ে দেবে? সবাই কি জানে না যে সে আছে? এমনকি গভীর অন্ধকারে যখন নিজের হাতও দেখা যায় না তখনও ডাকলে সে 'আমি এখানে রয়েছি' সাড়া দেয়।

ভ—কিন্তু সে 'আমি'টা অহংকার বা 'আমি'-চিন্তা। যেটা সাড়া দেয় সেটা পরমতত্ত্ব নয়। তা যদি হত তবে সে নিজের সম্বন্ধে (সত্তার) বোধ রাখতে পারত।

ম—আলো বা দৃষ্টির অভাবে অহংকারও তার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। আত্মার শুদ্ধ প্রকাশ তো আরই হবে।

আমি বলি আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। একজনের আত্মাকে জানার জন্য তত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কেউ বলে তত্ত্ব চব্বিশটি, কেউ বলে আরও বেশী ইত্যাদি। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার আগে কি আমাদের তত্ত্ব জানতে হবে? এরা আত্মাকে স্পর্শ করে না, কেবল এইটি বলার জন্যই শাস্ত্র এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে। কিন্তু সাধক তত্ত্ব সম্বন্ধে না পড়েও সরাসরি আত্মাকে স্বীকার ক'রে 'তাই' হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ভ—গান্ধীজী অনেকদিন সত্য পালন ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন।

ম—আত্মা ছাড়া সত্য আর কি? সৎ থেকেই সত্য হয়। আবার আত্মা ছাড়া সৎ আর কিছু নয়। সুতরাং গান্ধীজীর সত্য কেবলমাত্র আত্মাই।

প্রত্যেকেই আত্মাকে জানে, তবু অজ্ঞান। মহাবাক্য শোনার পর একজন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অতএব উপনিষদের বাণীই শাশ্বত সত্য, যারা উপলব্ধি করেছে তারা তাদের অনুভূতির জন্য এর কাছে ঋণী। আত্মাই ব্রহ্ম একথা শোনার পর একজন এর প্রকৃত

তাৎপর্য বুঝতে পারে আর প্রত্যেকবার এ থেকে বিচ্যুত হলে তাতেই ফিরে যায়। এটাই আত্মোপলব্ধির পূর্ণ প্রক্রিয়া।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৯

৬৪৮। শ্রীভগবান বললেন তত্ত্বরায়ারই প্রথম ব্যক্তি যে তামিল ভাষায় অদ্বৈতবাদ প্রচার করে।

সে বলেছিল যে ভূমিই তার শয্যা, হস্তই তার ভোজনপাত্র, কৌপীন তার আচ্ছাদন, তাই তার কোন অভাব নেই।

'মহারাজা তুরাভু'তে (মহারাজার সন্ন্যাসে) সে বলেছে—সে নগ্নভূমিতে বসেছিল, ভূমি তার সিংহাসন, বায়ু চামর, আকাশ ছত্র আর ত্যাগই পট্টমহিষী।

তারপর শ্রীভগবান বলে চললেন—

প্রথম অবস্থায় আমি কোন কিছু না পেতেই বসতাম। আমি মাটিতেই বসতাম আর সেখানেই শুয়ে পড়তাম। এই মুক্তি। সোফাটা বন্ধন। এটা আমার জেলখানা। আমার যখন যেখানে খুশি বসার স্বাধীনতা নেই। এটা কি একটা বন্ধন নয়? একজনের যা ইচ্ছা হয় করার স্বাধীনতা থাকবে আর অন্যের সেবা নেবে না।

'অভাবের অভাবই' সর্বোত্তম আনন্দ। এটা কেবল অনুভূতির দ্বারাই বোঝা যায়। একজন নিষ্কাম ব্যক্তির সঙ্গে একজন মহারাজার তুলনা হয় না। মহারাজার আজ্ঞাধীনে অনেক সেবক থাকে। কিন্তু অন্য ব্যক্তি আত্মা ছাড়া আর কিছুর সম্বন্ধেই সচেতন নয়। এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

১৮ই মার্চ, ১৯৩৯

৬৭৯। শ্রীটমসন একজন শান্ত স্বভাব যুবক, অনেকদিন ভারতে বাস করে আন্তরিক শিক্ষার্থীর মত হিন্দুদর্শন পড়ছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলে, "আমি ব্রহ্মের অধিষ্ঠান"। আর একস্থানে বলে, "আমিই প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত।" এরূপে পরম সত্তার বিভিন্ন বিভাব দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয় বিভাব তিনটি, (১) অব্যক্ত, (২) অন্তর্যামী ও (৩) ব্যক্তরূপ (বিশ্ব)। উপলব্ধি কি এর যে কোন একটা কিংবা একসঙ্গে সবগুলো? ব্যক্তরূপ থেকে অব্যক্তে যেতে বেদান্ত নাম ও রূপকে মায়া বলে ত্যাগ করে। কিন্তু আমি এটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না কারণ একটা গাছ বলতে তার গুঁড়ি, ডালপালা ইত্যাদি সব বোঝায়। পাতাগুলো মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার বেদান্ত বলে যে সমস্তই ব্রহ্ম, যা স্বর্ণ ও অলঙ্কারের দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে। আমরা কিভাবে সত্যকে বুঝবো?

ম—গীতা বলে "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।" যদি এই অহম্‌কে জানা যায় তবে সবই জানা হয়।

ভ—এটা কেবল অন্তর্যামী বিভাব।

ম—তুমি এখন ভাবছ যে তুমি একজন ব্যক্তি, বিশ্ব-জগৎ রয়েছে আর ঈশ্বর এই বিশ্বের অতীত। সেজন্য একটা পার্থক্যের বোধ রয়েছে। এ ধারণাটা যেতে হবে। কারণ ঈশ্বর তোমার বা বিশ্ব থেকে পৃথক নন। গীতা আরও বলে—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ গী ১০।২০

সুতরাং ঈশ্বর কেবল সকলের অন্তরে রয়েছেন তা নয় তিনি তাদের আধারও বটেন। তিনিই সবার আদি, মধ্য ও অন্ত।

তাঁতেই সবার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। অতএব তিনি পৃথক নন।

ভ—গীতার এই অংশটার কি অর্থ যেখানে—

"এই বিশ্বজগৎ আমার একটা অংশ" বলা হয়েছে।

ম—এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরের একটা খণ্ডিত অংশে জগৎ হয়েছে। তাঁর শক্তি ক্রিয়া করছে; সেই ক্রিয়ার পরিণামরূপে জগৎ প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে পুরুষসূক্তের 'সকল ভূত তাঁর এক পাদ' (পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি)-এর অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মের চারটি ভাগ আছে।

ভ—আমি বুঝেছি। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই বিভাজিত হন না।

ম—সুতরাং তথ্যটা এই যে ব্রহ্মই সব আর তিনি অবিভাজ্য থাকেন। তিনি নিত্য অনুভূত। মানুষ কিন্তু সেটা জানে না। তাকে এটা জানতে হবে। জ্ঞানের অর্থ আত্মাই ব্রহ্ম এই শাশ্বত সত্য প্রকাশের যে বাধা আছে তাদের দূর করা। বাধাগুলো কেবলমাত্র তোমার পৃথক ব্যক্তিসত্তার ধারণার দ্বারাই গঠিত হয়। সুতরাং বর্তমান চেষ্টার ফলে আত্মা যে ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয় এই সত্যই প্রকাশ পাবে।

২২শে মার্চ, ১৯৩৯

৬৫০। একজন মধ্যবয়স্ক আন্ধ্র ভদ্রলোক শ্রীভগবানকে জপ কি করে করবে জিজ্ঞাসা করলে।

ম—জপে 'নমঃ' শব্দ আছে। এর অর্থ একটা অবস্থা যেখানে মন আত্মা থেকে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় না। যখন সেই অবস্থাটা লাভ হয় তখনই জপের সমাপ্তি হয়। কারণ কর্তা অদৃশ্য হয় আর সেইসঙ্গে ক্রিয়াও। নিত্যসত্তাই কেবল থাকে। যতক্ষণ না সেই অবস্থা লাভ হয় ততক্ষণ জপ করতে হবে। আত্মা থেকে অব্যাহতি

নেই। কর্তা স্বতঃই এর প্রতি আকর্ষিত হয়। যখন একবার এটা হয় তখন মানুষ আত্মাতে ডুবে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

ভ—ভক্তি কি মুক্তির পথে নিয়ে যায়?

ম—ভক্তি মুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। স্বরূপে থাকাই ভক্তি। একজন সর্বদাই তাই। সে যে প্রণালী অবলম্বন করে তার দ্বারাই সেটা অনুভব করে। ভক্তি কি? ঈশ্বর চিন্তা। তার অর্থ—সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে কেবল একটা চিন্তা ধরে থাকা। তখন সেটা কেবল ঈশ্বর যিনি আত্মা বা যে আত্মা ঈশ্বরে সমর্পিত তার চিন্তা। যখন তিনি তোমায় গ্রহণ করেন কিছুই তোমায় বিচলিত করে না। চিন্তার অভাবই ভক্তি। এটাই মুক্তি।

জ্ঞানমার্গকে বিচার পথ বলা হয়। এটা 'পরাভক্তি' ছাড়া আর কিছু নয়। পার্থক্যটা কেবল শব্দের।

ব্রহ্মের ধ্যান করাকে তুমি ভক্তি মনে কর। যতক্ষণ বিভক্তি (পার্থক্য বোধ) আছে ততক্ষণ ভক্তি (মিলন) খোঁজা হয়। এই প্রণালীতে লক্ষ্যে পৌঁছায় যা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে॥ গী. ৭।১৬-১৭

যে কোন প্রকার ধ্যানই ভাল। কিন্তু যদি ভেদভাব চলে যায়, কিছুই জানার না থাকে আর কেবল ধ্যানের বস্তু কিংবা যে ধ্যান করছে সেই থাকে, তাকেই জ্ঞান বলে। জ্ঞানকে 'একভক্তি' (একাগ্র মনে ভক্তি) বলা হয়। জ্ঞানীই পরাকাষ্ঠা কারণ সে আত্মা হয়েছে, তার আর করারও কিছু নেই। সে পূর্ণ হওয়ার জন্য অভীও বটে, দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ম্ ভবতি—দ্বিতীয়ের অস্তিত্বের জন্য ভয় হয়। এই মুক্তি। এটাই ভক্তি।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৯

৬৫১। এ. ডবলিউ চাডউইক তামিল 'কৈবল্য নবনীত'-এর ইংরাজী অনুবাদের প্রতিলিপি করছিল। সে কতগুলো শাস্ত্রীয় পরিভাষা পেয়ে বুঝতে অসুবিধা বোধ করায় শ্রীভগবানকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে। শ্রীভগবান বললেন, "এই অংশে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয় লেখা হয়েছে। এটার বিশেষ গুরুত্ব নেই কারণ শ্রুতি এই পরিকল্পনাগুলো প্রতিপাদন করতে চায়না। তারা এগুলো প্রসঙ্গবশে উল্লেখ করে, সাধকের ইচ্ছা হলে সেগুলো নিতে পারে। সত্যটা হল জগৎ একটা আলোর সম্মুখে সঞ্চরমান ছায়া। একটা ছায়া দেখতেও আলোর প্রয়োজন হয়। ছায়াটার বিশেষ গুরুত্ব নেই, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণেও কোন ফল নেই। বইটা (কৈবল্য নবনীত) আত্মার সম্বন্ধে লেখা, সেটাই ওর উদ্দেশ্য। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা উপস্থিতমত ত্যাগ করা যায়।"

পরে শ্রীভগবান বললেন—"বেদান্ত বলে যে জগৎ দ্রষ্টার সঙ্গে যুগপৎ সৃষ্ট হয়। সেখানে কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই। একে যুগপৎ-সৃষ্টি বলে। এটা প্রায় স্বপ্নের সৃষ্টির অনুরূপ, সেখানে অনুভাবক ও অনুভূত বস্তুর একই সঙ্গে উদয় হয়। যখন এটা বলা হয় অনেকে সন্তুষ্ট হয় না কারণ তাদের বস্তুতান্ত্রিক বোধ অত্যন্ত সুদৃঢ়। তারা সহসা-সৃষ্টির কারণ খুঁজে পেতে চায়। তারা তর্ক করে যে একটা কার্য থাকলে তার একটা কারণও থাকতে হবে। সংক্ষেপে তারা চারিপাশে যা দেখে সেই জগতের একটা ব্যাখ্যা চায়। তখন শ্রুতি তাদের এই সব পরিকল্পনা ব'লে কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করে। এই ভাবে সৃষ্টি ব্যাখ্যা করাকে ক্রমসৃষ্টি বলে। কিন্তু প্রকৃত সাধক যুগপৎ-সৃষ্টি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে।

২৪শে মার্চ, ১৯৩৯

৬৫২। জনৈক ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রশস্তিসূচক একটি স্তোত্র রচনা করে। তাতে 'আবর্তপুরী' শব্দটা আছে। শ্রীভগবান বললেন যে এটা শ্রীভগবানের জন্মস্থান তিরুচুড়ী বোঝাচ্ছে, সে স্থানের অনেক নাম। আবর্ত=চুড়ী=ঘূর্ণি। সেখানে অনেকবার জলপ্লাবন হয়েছে। ভগবান শিব তিনবার একে রক্ষা করেন। একবার যখন সমস্ত স্থলভাগ জলমগ্ন হয় তখন শিব তাঁর ত্রিশূল এখানে প্রোথিত করেন। যে সমস্ত জল সবকিছু ভাসিয়ে দিতে পারত তা সেই গর্ত দিয়ে চলে যায়। সেখানে একটা ঘূর্ণি হয়। সেজন্য এই নাম হয়। আর একবার প্রলয়ের সময়ে তিনি ত্রিশূলের অগ্রভাগে ধারণ ক'রে একে রক্ষা করেন। সেজন্য 'শূলপুরী' নাম হয়।

ধরিত্রীজননীকে হিরণ্যাক্ষ জলের তলায় নিয়ে যায়। বিষ্ণু তাকে রক্ষা করেন, ধরিত্রী মনে করেন যে রাক্ষসের দ্বারা তাঁর পাপস্পর্শ হয়েছে। সেই অশুদ্ধ স্পর্শের পাপ ক্ষালনের জন্য তিনি এখানে শিবের উপাসনা করেন। সেজন্য এর 'ভূমিনাথেশ্বর ক্ষেত্র' নাম হয়।

অরুণাচল ও তিরুচুড়ী উভয় স্থানই গৌতমের জন্য বিখ্যাত। শিব এই মহাত্মাকে তাঁর নটরাজ মূর্তি ও গৌরীশঙ্করের বিবাহলীলার পুনরভিনয় দেখান।

কৌণ্ডিণ্য আর একজন ঋষি যার জন্য পবিত্র নদীটি এখানে প্রবাহিত হয়েছে। ঋষির নামে নদীর নামকরণ হয়, কৌণ্ডিণ্য নদী তামিলে অপভ্রংশ হয়ে কুণ্ডারু হয়েছে। একে পাপহারীও বলে। এর পিছনে একটা গল্প আছে। এক রাজার কন্যা ভূতাবিষ্ট হয়। তাকে অনেক পুণ্যক্ষেত্রে ও তীর্থে নিয়ে যাওয়া হয়। একবার যাত্রীদল একটি নদীতে স্নানের সময়ে সঙ্কল্প মন্ত্রে পাপহারী নামটা শোনে। তারা সেই তীর্থের খোঁজ করে আর তিরুচুড়ীতে যায়। মেয়েটিকে সেখানে স্নান করালে সে ভাল হয়ে যায়।

পাণ্ড্য রাজাও এখানে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হন। যে পাণ্ড্য রাজ্য মাদুরা, রামনাদ ও তিরুনেলভেলী তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল, তিরুচুড়ী তার কেন্দ্র।

গ্রামের মন্দিরের সামনে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে, সেখানেই শিবের ত্রিশূল দিয়ে ঘূর্ণি হয়। এখনও তামিল মাস মাসির পূর্ণিমার (মাঘ শুক্লাপৌর্ণমী) দশ দিন আগে থেকে প্রতিদিন এক ফুট করে এর জল বাড়ে আর পরের দশ দিনে সেটা কমে যায়। এই ব্যাপারটা প্রতি বছর হতে দেখা যায়। গ্রামের ছোট ছেলেরা এই ঘটনা আশ্চর্য হয়ে দেখে। এই উপলক্ষ্যে যাত্রীরা এখানে স্নানের জন্য আসে। এই জল গন্ধক মিশ্রিত কারণ স্নান করলে যাত্রীদের রূপার গহনা কালো হয়ে যায়। শ্রীভগবান বললেন যে তিনি ছোট বেলায় এটা দেখেছেন।

গ্রামের একদিকে নদী আর অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড বড় বিল আছে। বিলের পাড়টা মাটির আর সর্বসমেত তিন মাইল লম্বা। আশ্চর্যের বিষয় যে বিলটা গ্রাম থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে অবস্থিত। তা সত্ত্বে সেটা ছাপিয়ে গেলেও জলটা গ্রামের ক্ষতি না করে অন্যদিকে চলে যায়।

১লা এপ্রিল, ১৯৩৯

৬৫৩। সহরে শিক্ষক সঙ্ঘের সভার কয়েকজন শিক্ষক দর্শনার্থে হলঘরে এল। একজন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে—"আমার মনে হয় আমি যেন একটা বনে ঘুরছি কারণ কোন পথ দেখতে পাই না।"

ম—বনে আছি এ ধারণাটা যাওয়া উচিত। এরকম ধারণাগুলোই যত নষ্টের মূল।

ভ—কিন্তু আমি পথ দেখতে পাই না।

ম—তারা যদি তোমাতে না হয় তবে বনই বা কোথায় আর পথই বা কোথায় ? তুমি যা আছ তাই আছ তবু তুমি বন ও পথের কথা বলছ।

ভ—কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে একটা সমাজে বাস করতে হয়।

ম—সমাজটাও বনের মত একটা ধারণা।

ভ—আমি বাড়ী ছেড়ে বার হই ও সমাজে মেলামেশা করি।

ম—কে যায় ?

ভ—শরীর যায় আর এইসব করে।

ম—ঠিক তাই। যেহেতু তুমি নিজেকে শরীর বলে মনে কর সেজন্য এই কষ্ট অনুভব কর। কষ্টটা তোমার মনে। তুমি মনে কর শরীরটা তুমি কিংবা মনটা তুমি। কিন্তু এমন সময় আছে যখন তুমি এ দু'টি হতে মুক্ত। উদাহরণসরূপ ঘুমে তুমি তোমার স্বপ্নে একটা শরীর ও জগৎ সৃষ্টি কর। সেটা তোমার মনের ক্রিয়ার ফল। তোমার জাগ্রত অবস্থায় তুমি মনে কর তুমি একটা শরীর আর তারপর বন ও বাকী সবের উদয় হয়।

এখন অবস্থাটা বিবেচনা কর। তুমি একটা অপরিবর্তনীয় ও নিরবচ্ছিন্ন সত্তা যে এই সকল নিত্য পরিবর্তনশীল তথা ক্ষণস্থায়ী অবস্থার মধ্যে থাকে। তুমি কিন্তু সর্বদাই সেখানে আছো। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুগুলো কেবল একটা ব্যাপার যা তোমার সত্তার ওপর হয়ে যায় ঠিক যেমন সিনেমার পর্দার ওপর ছবিগুলো চলে যায়। ছবি চলে গেলেও পর্দাটা চলে না। অনুরূপভাবে শরীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমাজে মেলামেশা করলেও তুমি যেখানে আছো সেখান থেকে চলে যাও না।

তোমার শরীর, সমাজ, বন ও পথ সবই তোমাতে, তুমি তাদের মধ্যে নও। তুমি শরীর কিন্তু কেবল এই শরীরটাই নও। তুমি যদি তোমার শুদ্ধ আত্মায় থাকো তবে শরীর ও তার ক্রিয়া তোমায় প্রভাবিত করবে না।

ভ—এটা কেবল গুরুকৃপায় অনুভূত হতে পারে। আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়ছিলাম, তাতে বলে যে গুরুর চরণধূলির দ্বারাই পরমানন্দ লাভ হয়। আমি কৃপা প্রার্থনা করছি।

ম—তোমার সত্তা ছাড়া কৃপা আর কি? সত্তা যা পরমানন্দেরই নামান্তর তুমি তার থেকে পৃথক নও। তুমি এখন ভাবছ যে তুমি একটা মন বা শরীর, এগুলো পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তুমি অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। এটাই তোমাকে জানতে হবে।

ভ—এটা দুর্বোধ্য আর আমি অজ্ঞানী।

ম—এই অজ্ঞানটাকে যেতে হবে। আবার কে বলে 'আমি অজ্ঞানী?' সে নিশ্চয় অজ্ঞানের সাক্ষী। সেটাই তুমি স্বয়ং। সক্রেটিস্ বলেছিল, "আমি জানি যে আমি জানি না।" এটা কি অজ্ঞান? এটা জ্ঞান।

ভ—তবে আমি ভেলোরে থাকলে অসুখী হই আর আপনার সান্নিধ্যে শান্তি পাই কেন?

ম—এই স্থানের এই অনুভূতি কি পরমানন্দ হতে পারে? এই স্থান ত্যাগ করলে তুমি বলছ অসুখী হও। তবে যে শান্তিটা অন্যস্থানে অনুভূত হয় সেটা স্থায়ী নয় কিংবা দুঃখ মিশ্রিত। অতএব তুমি বিশেষ স্থানে কিংবা বিশেষ সময়ে পরমানন্দ পেতে পারো না। এটা কার্যকরী হতে হলে স্থায়ী হওয়া চাই। সেই স্থায়ী সত্তাটা তুমি নিজেই। আত্মবান হও আর সেটাই পরমানন্দ। তুমি সর্বদাই 'তাই'।

তুমি বলছ তুমি ভেলোর ছেড়ে ট্রেনে এসে, তিরুভন্নমালাই পৌঁছে, এই ঘরে ঢুকেছ আর শান্তি পেয়েছ। যখন ফিরে যাও তখন ভেলোরে শান্তি পাও না। এখন, তুমি কি সত্যই স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়েছ? যদি নিজেকে শরীর বলেও মনে কর, শরীরটা বাড়ীর দরজায় একটা যানে বসেছে, গাড়ীটা স্টেশানে এসেছে। তারপর সেটা ট্রেনে বসেছে, ট্রেনটাই ভেলোর থেকে তিরুভন্নমালাই ছুটে

এসেছে। তারপর সেটা আর একটা গাড়ীতে বসেছে, সেটা শরীরটাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তবু জিজ্ঞাসা করলে তুমি বল যে তুমিই ভেলোর থেকে এসেছ। তোমার শরীরটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে আর সব স্থানগুলো তাকে পার হয়ে গেছে।

এই ধারণাগুলো কেবল ভুল নির্ধারণের জন্যই হয় যেটা অত্যন্ত দৃঢ়মূল।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে—আমরা কি জগতকে অনিত্য মনে করবো?

ম—তা কেন? যেহেতু তুমি এখন একে নিত্য ভাবছ সেজন্য শাস্ত্র তোমার এই ভুল ধারণা ছাড়ানোর জন্য একে অনিত্য বলে। নিজেকে নিত্য বলে জেনেই এটা করতে হবে, জগতকে অনিত্য বলে প্রচার করে নয়।

ভ—আমাদের উদাসীনতা অভ্যাস করতে বলা হয়, সেটা জগৎ যদি অনিত্য হয় তবেই সম্ভব।

ম—হাঁ। "ঔদাসীন্য অভীপ্সিতম্।" ঔদাসীন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা কি? এর অর্থ অনুরাগ ও দ্বেষের অভাব। যখন তুমি যার ওপর এই সব ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে সেই আত্মাকে উপলব্ধি করবে তখন কি তুমি এদের ভালবাসবে, না ঘৃণা করবে? উদাসীনতার অর্থ এই।

ভ—তার ফলে আমাদের কর্মে রুচির অভাব হবে। আমরা কি আমাদের কর্তব্য করবো না বা করবো?

ম—হাঁ, নিশ্চয়ই। এমনকি যদি তুমি মনে কর যে তুমি তোমার কর্তব্য করবে না তা সত্ত্বেও তোমাকে জোর করে বাধ্য হয়ে করতে হবে। শরীরটা যে কাজের জন্য এসেছে তাকে সেটা করতে দাও।

শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলেছেন, অর্জুন পছন্দ করুক বা না করুক তাকে যুদ্ধ করতেই হবে। যখন তোমার কাজ রয়েছে তুমি তাকে

দূরে রাখতে পারো না ; কিংবা যখন তোমায় সেটা আর করতে হবে না অর্থাৎ যখন তোমার নির্দিষ্ট করণীয় কর্ম হয়ে গেছে তখন তুমি সেটা চালিয়ে যেতেও পারবে না। সংক্ষেপে কাজটা হয়েই যাবে আর তোমার অংশেরটা—যে অংশটুকু তোমায় দেওয়া হয়েছে—তোমায় নিতে হবে।

ভ—এটা কি করে করা যাবে ?

ম—যেমন একজন অভিনেতা নাটকে অভিনয় করে—অনুরাগ ও বিরাগশূন্য হয়ে।

ওঁ তৎ সৎ

॥ ওঁ শ্রীরমণ অর্পণমস্তু ॥

নির্ঘণ্ট

খ

গ

চ

ফ

য

র

ল

ব